ইংরেজ ডিটেকটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা

আর রীড

অনুবাদ

পরিমল গোস্বামী

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২ ॥

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ
সুবোধ দাশগুপ্ত

ব্লক
নিউ হাফটোন প্রাঃ লিঃ

বাঁধাই
ইউনিয়ন বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

শ্রীবিনয় ঘোষ
প্রীতিভাজনেষু

ভূমিকা

মূল বইয়ের নাম EVERY MAN HIS OWN DETECTIVE, এবং লেখক R. Reid—তখনকার দিনে ডিটেকটিভ রূপে খ্যাত ছিলেন। সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে যখন কলকাতায় অবস্থান করেন (১৮৭৫-৭৬) তখন রীড সাহেব তাঁর দেহরক্ষী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

মূল বই (১৮৮১) পর্যবেক্ষণ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে লেখা এবং কাহিনী-গুলি দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত। সেজন্য ঐ বইতে বক্তৃতা অংশ অনেক বেশি ছিল। বাংলা বইতে তার প্রায় সবই বাদ দিয়ে শুধু কাহিনীগুলি রাখা হয়েছে। এবং নামের মধ্যে বইয়ের পরিচয় প্রকাশের উদ্দেশ্যেই নামও বদল করা হয়েছে।

বইতে একশ বছর আগের কলকাতা জীবনের একটা দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। সমাজচিত্র হিসাবে এর যদি কোনো মূল্য থাকে তবে তা সমাজ-বিজ্ঞানীরা নিরূপণ করবেন।

সব প্রুফ নিজে দেখা সম্ভব হয় নি, সেজন্য বানানের এক চেহারা সর্বত্র বজায় থাকে নি, সেজন্য দুঃখিত।

—অনুবাদক

মুখের ভাবে চরিত্র পাঠ

মুখের ভাবের সাহায্যে লোকচরিত্র পাঠের বিদ্যা যে নির্ভুল, এটি এখন স্বীকৃত সত্য। মানুষের মনে কী আছে, চোখেমুখে তার অনেকখানিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটি একটি প্রয়োজনীয় বিদ্যা। এ বিদ্যাকে যিনি মানেন না, তিনি এর ব্যবহার বিষয়ে অজ্ঞ। উল্লাস, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, অপরাধবোধ, অথবা সরলতা—যে-কোন বুদ্ধিমান মানুষই মুখের ভাব থেকে ধরে ফেলতে পারেন। আর গোয়েন্দাদের শিক্ষিত দৃষ্টি তো নির্ভুলভাবেই এসব বুঝতে পারে। কোন্ ভাবটা অপরাধবোধ প্রকাশ করছে, কোন্ ভাবটা সরলতা প্রকাশ করছে, তা তাঁদের চোখে ঠিক ধরা পড়ে যায়।

এ কথা সত্য যে এই বিদ্যা, অর্থাৎ ফিজিওগনমি বিদ্যা, বিজ্ঞানের বিচারে জাতিচ্যুত হয়েছে, কিন্তু সে শুধু মুখের গঠন বিচারের দিক দিয়ে। মুখে ভাবের প্রকাশকে বাদ দিয়ে শুধু মুখাবয়ব থেকে নির্ভুল তথ্য পাওয়া কঠিন। আমি নিজে অনেক মানুষকে দেখেছি যাদের মুখ অত্যন্ত কুৎসিত, কিন্তু তারা সদাশয় এবং মধুর স্বভাববিশিষ্ট। কিন্তু এমন একটি লোককেও দেখি নি যে প্রফুল্লচিত্ত, মনখোলা, সৎ, অথচ ভিতরে ভিতরে অসৎ—তা সে চেহারা যাই হোক।

দরকার শুধু ভাল করে দেখার শিক্ষা। মনের ভিতরে কী চলছে, তা বাইরের ভাবভঙ্গিতে বুঝতে পারা বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ। শিশুরা এ বিদ্যা জানে, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই ক্ষমতাটি হারাতে থাকে।

প্রথম প্রথম পরিচিত পাপাসক্তদের মুখের ভাব অনুশীলন করলে ভাল হয়। এক এক জাতীয় পাপাচার এক এক জাতীয় মুখের ভাব গঠন করে। জেলখানায় এটি চর্চা করার একটি ভাল জায়গা। কলকাতার জুয়াড়িদের আড্ডা, কিংবা আফিংখোরদের আড্ডা এর পক্ষে উপযুক্ত স্থান। অনেকেরই মুখে হীন ধূর্ততা, লোভ আর নিষ্ঠুরতার মিশ্রণ। অতি বীভৎস সে-সব মুখ। সব জাতীয় অপরাধ-প্রকাশক। মুখেরই দেখা মিলবে এইসব জায়গায়। আমি নিজে যেভাবে মুখের ভঙ্গি দেখে অপরাধীদের ধরেছি, তার গোটাকতক দৃষ্টান্ত প্রথমে বলছি।

একটি সভ্যভব্য ঠগের কাহিনী

কয়েক বছর আগে চার্লস্ নেভ্যু অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠান পর পর কয়েকটি অতি চাতুর্যপূর্ণ প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের শো-কেসে রক্ষিত মূল্যবান রত্নখচিত সব আংটি একের পর এক রহস্যজনকভাবে উধাও হচ্ছিল। তার জায়গায় পাওয়া যাচ্ছিল নকল রত্নের সব সস্তা আংটি। কেস্‌টি তদন্তের ভার আমার হাতে আসে। আমি দু-তিন দিন নানাভাবে সন্ধান চালিয়ে বুঝতে পারলাম এ-কাজ বাইরের লোকের, ভিতরের কারো নয়। প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং আমার উর্ধ্বতন অফিসিয়ালগণ এতে অবশ্য বড়ই হতাশ হলেন। কারণ তাঁরা সবাই ভেবেছিলেন, এ-কাজ ভিতরের লোক ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। যাই হোক, আমি আমার নিজের বিশ্বাস মত একটা অনুমান খাড়া করে সেই মত চোর ধরার কাজে লেগে গেলাম।

নকল আংটিগুলি তদন্তের সময় আমার নির্দেশ মত কেস থেকে বার করে আনা হয়েছিল। আমার নির্দেশ মতই আবার সেগুলিকে কেসের মধ্যেই রাখা হল, ট্রে'র উপর যেমন সাজানো ছিল তেমনি। কারণ আমার ধারণা, চোর যদি বাইরে থেকে এসে থাকে, তবে সে আবার ফিরে আসবে। এবং এসে যদি দেখে তার রাখা আংটিগুলি সেখানে নেই, তাহলে বুঝতে পারবে চুরি ধরা পড়েছে। তাহলে দ্বিতীয়বার আর সে চুরি করতে সাহস পাবে না। পক্ষান্তরে যদি সে দেখে তার রাখা ঐ আংটিগুলি যথাস্থানেই আছে, তাহলে সে মনে করবে চুরি ধরা পড়ে নি। অতএব সে আবার চুরি করতে আসবে।

এবারে আমি সাদা পোশাকে এমনভাবে দোকানের একটি ডেস্কের পিছনে এসে বসলাম যেখান থেকে ক্রেতাদের আসা-যাওয়া বেশ ভালভাবে লক্ষ করা যায়। প্রথম দিন কাটল, কিন্তু তেমন সন্দেহজনক কিছু ঘটল না। সন্ধ্যায় দোকান বন্ধের পরে আংটিগুলি পরীক্ষা করে দেখলাম। কোথাও হস্তক্ষেপের কোনো চিহ্ন নেই, যেমন ছিল সব তেমনি আছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দোকান খোলার ঘণ্টাখানেক পরেই, ক্রেতাদের বেশ ভিড় জমে গেল। আমি লক্ষ করলাম, হাইকোর্টের উকিলের পোশাক পরা, চশমা শোভিত এক প্রৌঢ়ের চেহারার বাবু এসে প্রবেশ করলেন অন্যান্য ক্রেতার সঙ্গে। তাঁর বুকে সোনার মোটা অ্যালবার্ট চেন। তিনি প্রথমেই এগিয়ে এলেন সেই

নকল আংটি রাখা শো-কেসটির দিকে এবং সেদিকে কয়েক মুহূর্ত বেশ মনোযোগের সঙ্গে চেয়ে রইলেন, তারপর মাথা তুলে চারিদিকে একবার তাকালেন। কিন্তু তাকালেন চশমার ভিতর দিয়ে নয়, ফ্রেমের উপর দিয়ে। আমি মনে মনে বললাম, 'বাছাধন, তোমার ঐ চশমা আর-কোনো মতলবে পরা, ভাল দেখার মতলবে নয়। তোমার চালচলন ভাল মনে হচ্ছে না।'

আমি এবারে তাঁকে ভাল করে লক্ষ করতে লাগলাম। চশমাধারী ভদ্রলোক শো-কেস দেখে খুশি হলেন। ভাবলেন, তিনি এখন নির্ভাবনায় পরবর্তী চাল চালতে পারবেন। এবারে তিনি চশমার আড়ালে চোখ দুটি ফিরিয়ে অন্য আর একটা শো-কেসের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে কিছুক্ষণ শো-কেসের ভেতরের জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে দোকানের একটি লোককে ডেকে ভিতরের আংটির ট্রে-টি বার করতে বললেন। বার করার পর সেটির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন, যেন কোন্‌টা নেবেন পছন্দ করছেন। ইতিমধ্যে বিক্রেতা অন্য কাউন্টারে অন্য এক ক্রেতার কাছে সরে যেতেই ট্রে থেকে একটা আংটি তুলে নিয়ে একটু দূরে সরে আলোয় ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমি তাঁকে লক্ষ করতে লাগলাম। দেখলাম, আংটিটি পরীক্ষা করা একটা ছুতা মাত্র। তিনি আসলে দৃষ্টি চশমার উপরে চালান করে বিক্রেতার দিকে নজর রাখছেন। কয়েক সেকেণ্ড এভাবে কাটার পর একটা শুভ সুযোগ (ঐ বাবুর মতে) আসতেই হাতের আংটি ট্রেতে রেখে দিলেন। আমি দেখছিলাম, উক্ত কার্যটি করার সময় বাবুর চোখ দুটি বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল, গোঁফের কোণটা একটু কেঁপে উঠল। মনের ভয়টা বাইরে ক্ষণস্থায়ী হয়েই মিলিয়ে গেল। বাবুটি আর কাল বিলম্ব না করে ট্রে থেকে কম দামে সাধারণ একটি সোনার আংটি চট করে তুলে নিয়ে তার দাম দিয়ে সেটিকে পকেটে পুরলেন। ভাল করে দেখলেনও না আংটিটি কী রকম।

তিনি দাম দিলেন কারেন্সি নোটে। তারপর হিসাব মত ভাঙানি পেয়ে তাড়াতাড়ি পেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে ইচ্ছে করেই দেরি করিয়ে দেবার জন্য বলা হল, আপনি যে নোটগুলি দিয়েছেন সেগুলির উপর আপনার নামসই দরকার। ইতিমধ্যে আমি দোকানের পিছনে অবস্থিত অফিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দোকানের ভিতরে ডেকে এনে যে ট্রে থেকে বাবুটি আংটিটি কিনেছেন সেই ট্রে-টি পরীক্ষা করে

দেখতে বললাম। দেখা গেল ৫০০ টাকা দামের একটি হীরের আংটি তুলে নিয়ে তিনি সেখানে একটি নকল হীরের সস্তা আংটি রেখে দিয়েছেন।

দোকানের মধ্যে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি না করে বাবুটিকে ম্যানেজারের অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমে তো তিনি চুরির অপবাদের ঘোর প্রতিবাদ জানালেন। রেগে গরম হলেন এবং বললেন, আমি এ কাজ.করি নি। কিন্তু তাঁকে সার্চ করা হবে বলাতে শেষ পর্যন্ত চুরি স্বীকার্ করলেন এবং চোরাই আংটি পকেট থেকে বার করে দিলেন।

এই জাতীয় হীরক বিষয়ক প্রতারণার বহু ফন্দি আছে। হীরা তৈরি একটা উচ্চস্তরের শিল্প। অথচ সাধারণের ধারণা, হীরকজাতীয় রত্নাদিতে নকলকারীর বিদ্যা খাটবে না। ঝলমল করা হীরে, এর কি কখনও নকল হয়? কারণ হীরা চেনার নানা উপায় আছে। সে সব সহজ পরীক্ষা। তারপর অণুবীক্ষণ আছে। শিক্ষিত চোখে চট করে ফাঁকি ধরা পড়ে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে আরও সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু তবু এতে এমন একটা ফাঁক আছে যা জহুরীকেও বিভ্রান্ত করতে পারে। দুটি খাঁটি হীরা ওজনে বা আকারে এক হলেও দুয়ের দামে অনেক তফাৎ হয়ে থাকে। হলুদ রঙের আফ্রিকার হীরককে যদি অল্প সময়ের জন্যও তার সমান ওজনের ইস্পাত-নীল হীরকের মত চেহারা দেওয়া যায় তাহলে তার দাম অনেক গুণ বেড়ে যাবে। চেহারা বদলের বৈজ্ঞানিক কৌশল আছে। হলুদের পরিপুরক রং হচ্ছে বেগুনি। দৃষ্টিবিজ্ঞানের এক পরিচিত নিয়মে দুটি পরিপুরক রঙের মিশ্রণে শাদার উৎপত্তি হয়। যদি কোনো প্রতারক তার কম দামের হলুদ পাথর অ্যানিলাইন ভায়োলেট নামক রাসায়নিকে কয়েক মিনিট ডুবিয়ে রাখে, তাহলে সেই সস্তা পাথর সঙ্গে সঙ্গে 'মূল্যবান' পাথরে পরিণত হবে। অবশ্য সাবান জলে এ-প্রতারণা ধুয়ে ফেলা যায় সহজেই।

ব্যাঙ্ক প্রতারকের কথা

একটি জালিয়াতি কেসের তদন্ত উপলক্ষে কয়েক বছর আগে আমাকে একবার কোনও ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার দরকার হয়।

ব্যাঙ্কের লেনদেনের সময়ের মধ্যেই ম্যানেজারের ঘরে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। আমাদের আলাপ চলছে, এমন সময় একটি পিওন কতকগুলি দরকারী কাগজপত্র এনে ম্যানেজারের টেবিলে রাখল, এবং জানাল, যে-ভদ্রলোকর কাছ থেকে সে এগুলো এনেছে, তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন। ম্যানেজার কাগজগুলির উপর চোখ বুলিয়ে তাকে বললেন, ভদ্রলোককে গিয়ে বল, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। তিনি যেন একটুক্ষণ অপেক্ষা করেন।

আমার কাজ শেষ হওয়ামাত্র আমি উঠে পড়লাম। অফিসের দরজা ঠেলে বাইরে আসতেই সেই অপেক্ষমাণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোকটি কিন্তু আমাকে দেখামাত্র হঠাৎ চমকে উঠলেন, এবং মুখ ঘুরিয়ে চাদরের প্রান্ত ঠিকভাবে গায়ে জড়ানো কাজে ব্যস্ত হলেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম, তিনি একটুখানি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কেননা চাদরের প্রান্ত ধরবার সময় তাঁর হাতের মুঠোটি অস্বাভাবিক রকমের শক্ত হয়ে উঠেছিল। চাদর ঠিক করা যে একটা ছুতামাত্র, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তাই আমি তাঁর অপরাধ-চেতনার আরও কিছু লক্ষণ প্রকাশের অপেক্ষা না করে ম্যানেজারের ঘরেই আবার ফিরে এলাম। আমাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে ম্যানেজার আমার দিকে স্বভাবতই জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'যে বাবুটি দেখা করতে চান, তিনি কে?'

ম্যানেজার বললেন, 'তিনি একটি ঋণ সম্পর্কে কথা বলতে এসেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই।'

তখন আমি তাঁকে, ঐ ভদ্রলোক আমাকে দেখে কীভাবে চমকে উঠে-ছিলেন, সে কথা জানিয়ে বললাম, 'আমার মনে হয়, তাঁর সঙ্গে কারবার করার আগে তাঁর সম্পর্কে ভালভাবে সন্ধান নেওয়া কর্তব্য।'

ম্যানেজার আমার কথায় একটুখানি হেসে আমার হাতে একখানা দলিল তুলে দিয়ে বললেন, 'দেখুন।'

দেখলাম সেখানা একখানা রসিদ। শুল্ক বিভাগের গুদামঘরে ১৪০টি মলমল ও মস্‌লিন জাতীয় কাপড়ের কেস্‌ জমা আছে। টাকা দিয়ে সেগুলো ছাড়িয়ে নিতে হবে।

'ব্যবসায়ীর পক্ষে এর চেয়ে নিরাপদ পাকা দলিল আর কী হতে পারে?' —বললেন ম্যানেজার।

আমার আর বলবার কিছু ছিল না। ভাবলাম, সেই ভদ্রলোকটি যে আমাকে দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন তার অন্য কারণ থাকতে পারে। হয়তো তা অপরাধ-চেতনার লক্ষণ নাও হতে পারে। ম্যানেজার অবশ্য আমার সতর্কতার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলেন, আমিও বিদায় নিলাম। দরজা খুলে বাইরে এসে কিন্তু বাবুটিকে আর দেখতে পেলাম না। উপর নিচে সর্বত্র সন্ধান করা হল, কিন্তু বাবুর চিহ্ন নেই। আমি যখন ফিরে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, সেই ফাঁকে বাবু ভেগেছেন।

আমি ম্যানেজারকে বললাম, 'আমার বিশ্বাস ঐ দলিলখানা জাল। এবং ঐ বাবুটি আমাকে আপনার কাছে ফিরে আসতে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন।'

ম্যানেজার আমার অনুমান সত্য বলে মেনে নিলেন। আমি তখন ঐ দলিলের সত্যতা যাচাই করার জন্য তৎক্ষণাৎ গুদামঘরে একজন সহকারীকে পাঠিয়ে দিলাম। সহকারী আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে জানাল, 'রসিদ খাঁটি, ওতে কোনো গোলমাল নেই। ঐ দলিলের বিনিময়ে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

তখন ম্যানেজার বললেন, 'আমাদের আর এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। বাবুটি হয়তো অন্য কোনো জরুরী কাজে আটকা পড়েছেন। সুযোগ পেলেই তিনি এসে পড়েবেন।'

কিন্তু তিনি সমস্ত দিনের মধ্যে আর দেখা দিলেন না। সমস্ত সপ্তাহের মধ্যেও না। তখন ঠিক করলাম, গুদাম ঘরের ঐ মলমলের কেস্‌গুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ওর মধ্যে কিছু জোচ্চুরি আছে কি না।

যথাসময়ে সেখানে কেস্‌গুলো খোলার ব্যবস্থা করা হল। পর পর চারটি কেস্ খুলে দেখা গেল তাতে মলমল ঢাকা চটের বস্তার মধ্যে ভাঙা ইটের গুঁড়ো ভিন্ন আর কিছুই নেই। অন্য কেস্‌গুলোর মধ্যেও তাই। শুধু ভাঙা ইট, পাটের ফেঁসো দিয়ে ঢাকা।

ব্যাঙ্ক খুব বাঁচাটা বেঁচে গেল।

ঘরোয়া চুরি

একদিন সকালে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল বার্ন আমার থানায় এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, তাঁর ১৩ নম্বর লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে রাত্রে চোর ঢুকে তাঁর স্ত্রীর পোশাকঘরের আলমারি থেকে অনেক টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। তিনি আরও জানালেন, টাকাটা ইউরোপীয়ান অরফ্যানেজ অ্যাসাইলাম স্কুলের। তাঁর স্ত্রী এই স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটারি। এই টাকাটা আগের দিনই ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে গচ্ছিত রাখবার কথা ছিল, কিন্তু হয় নি। এখন সে ভুল সংশোধনের আর তো উপায় নেই।

আমি কর্নেলের সঙ্গে তাঁর ১৩নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে যে ঘরে চোর ঢুকেছে সন্দেহ করা হচ্ছিল, সেই ঘরটা পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, ঘরের প্রত্যেকটি বাক্স এবং আলমারি খোলা পড়ে আছে। ভিতরের সব জিনিসপত্র মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। যে আলমারি থেকে চুরি গেছে, তার ড্রয়ার দেখে মনে হল, তা বড় একটা টোস্ট করবার চিমটের সাহায্যে বলপ্রয়োগে খোলা হয়েছে। কাঠে চিমটের দাগ পড়েছে। যন্ত্রটিও ঘরেই পাওয়া গেল এবং সেটি এই বাড়িরই জিনিস।

জাতচোরেরা আলমারির ড্রয়ার ভাঙতে এ ধরনের যন্ত্র কখনও ব্যবহার করে না। আমি অনুমান করলাম এ কাজটি ঘরের চাকর ভিন্ন আর কারও নয়। ঐ বাড়িতে দুটি পরিবার বাস করতেন। কর্নেল বার্ন ও তাঁর স্ত্রী, এবং মিস্টার ও মিসেস ফারগুসন। আমি সবার যথাযথ নাম উল্লেখ করছি, কারণ এতে আমার বিবরণ বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে। আরও কারণ, মুখের ভাবে লোকচরিত্র পাঠের বিদ্যা যাদের জানা নেই, তারা এর নাম শুনলেই এই বিদ্যাকে বিদ্রূপ করে। এ জন্য এই কেসটি কিভাবে তদন্ত করা হল, তা এই জাতীয় বিদ্রূপকারীদের জানা উচিত। এই উদ্দেশ্যেই আমি এর বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি।

আমি উপরোক্ত দুটি পরিবারের সকল ভৃত্যকেই ডাকিয়ে একত্র এনে জোটালাম। তারা সবাই উঠানে এসে দাঁড়াল। সংখ্যায় হবে প্রায় ত্রিশজন।

তাদের সবাইকে একসারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রত্যেকের মুখের ভঙ্গি লক্ষ করার উদ্দেশ্যে আমি তাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে একের পর এক অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এইভাবে কর্নেল বার্নের সর্দার-বেয়ারার সামনে এসে পড়লাম। দেখি, সে আমার মুখের দিকে সোজা চাইতে পারছে না। তার দৃষ্টি ক্রমাগত একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে চঞ্চল হয়ে ছুটছে। একবারও সে আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। অথচ লোকটি আমার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে। আমি একটু বাঁয়ে সরে দাঁড়াই, কিন্তু তবু সে আমার দিকে তাকায় না। তারপর ডাইনে সরে দাঁড়াই, তবু না। যাই হোক, আমি শেষ লোকটি পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম এবং সেখান থেকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি, ঐ সর্দার-বেয়ারা আমার গতিবিধি লক্ষ করছে। অন্যেরা যেমন সোজা তাকিয়ে ছিল তেমনি রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি আবার তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। এবারেও সে আমার দিকে চাইতে পারল না, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখল; শেষ পর্যন্ত তাকে বলতে বাধ্য হলাম, সোজা আমার দিকে তাকাও। কিন্তু সে স্থির ভাবে এক মুহূর্তও সোজা চাইতে পারল না। আরও একটা জিনিস এই সময় আমি লক্ষ করলাম—সে বারবার জিভ দিয়ে তার শুকনো ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে নিচ্ছে। কাজটা কিন্তু সে তার অজ্ঞাতসারেই করছিল। আরও দেখলাম, তার গলার মধ্যে কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠেছে। সে ঢোক গিলে ক্রমাগত সেটাকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। যতক্ষণ আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে, ততক্ষণই এই ব্যাপার ঘটছিল। আমার দেখা শেষ হলে আমি তার ঘাড়ে হাত দিয়ে তাকে সারি থেকে বার করে এনে কর্নেলকে বললাম, 'কর্নেল, এই লোকটিই আপনার চোর।'

আমার কথা শেষ হবামাত্র বেয়ারা কোন ভূমিকা না করে তৎক্ষণাৎ তার মনিবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে অপরাধ স্বীকার করল। বলল, 'আমি আপনার অনেক বিশ্বাসী চাকর, আমাকে মাপ করুন।'

দয়াভিক্ষার সে কী করুণ আবেদন!

কিন্তু এমন অপরাধ তো ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা করা চলে না। তাই তাকে পুলিসের হাতে দিতেই হল। লোকটি যখন নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করছিল, সেই সময়েই সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কর্নেলকে সে সব টাকা ফিরিয়ে দেবে। টাকা কোথায় রেখেছে তাও বলল, অবশ্য ক্ষমা পাবার

প্রত্যাশা করেই। বলল, ছু'মাইল দূরের একটি জায়গায় এক ঘরের মধ্যে টাকা আছে।

একজন দেশী অফিসারসহ তাকে সেইখানে পাঠানো হল, টাকা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মাঝপথে সে বেঁকে দাঁড়াল। সে ইতিমধ্যেই ভেবে দেখেছে, ঝোঁকের মাথায় অপরাধ স্বীকার করা তার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। সে তাই সঙ্গের অফিসারকে বলল, সে কর্নেল বার্ন এবং ফারগুসনের কাছে যে স্বীকারোক্তি করেছে তা ডাহা মিথ্যা। সে সময় সে আফিঙের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, তাই নেশার ভরে কি বলেছে তা তার খেয়াল নেই। এখন তাদের টাকা উদ্ধারের জন্য যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। টাকা তো সে চুরি করে নি, কোথাও রাখেও নি—মিছিমিছি মরীচিকার পিছনে ধাওয়া করা হচ্ছে। সে টাকার বিষয়ে কিছুই জানে না। একথা শোনার পর অফিসার আর না এগিয়ে তাকে থানায় নিয়ে এসে আমাকে সব বললেন। আমি কিন্তু তার কথায় মোটেই বিশ্বাস করলাম না। লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে আগে যেখানে টাকা আছে বলেছিল, সেইখানে রওনা হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে দেশী অফিসারটিও ছিলেন। আমরা যখন সেই বাড়ির কাছাকাছি পৌছেছি তখন অফিসারটিকে বললাম, 'একে একটু দূরেই রাখুন, আমি একা যাচ্ছি ঐ বাড়িতে।'

আমি গিয়ে বাড়ির লোকদের ডাকতে বেয়ারার ভাই বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কর্নেল বার্নের বেয়ারা কাল রাত্রে কখন তোমার কাছে এসেছিল?'

লোকটি একটুখানি ইতস্তত করে দূরে দাঁড়ানো তার ভাইয়ের দিকে এমনভাবে চাইল যেন তার কী করা উচিত সে বিষয়ে যদি কোনো ইশারা বা ইঙ্গিত তার কাছ থেকে পাওয়া যায়।

আমি বললাম, 'নাও নাও, আর দেরি করো না, এখন যা জান সব সত্যি করে বল। তোমার ভাই যা বলেছে, তা থেকে যদি তোমার জবানবন্দি কোনোরকম তফাৎ হয় তা হলে তোমাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।'

একথা শোনার পর সে বলল, 'রাত প্রায় এগারোটায় এসেছিল।'

'যে বাণ্ডিলটা তোমাকে রাখতে দিয়েছিল, সেটা কোথায়?'

'সেটা আমার বাক্সে আছে।'

এই জবাবটি দিতে সে আর দেরি করল না। সে এতক্ষণে অনুমান করে নিয়েছে যে আমি সবই জানি, আমার কাছে লুকিয়ে তার আর কোনো লাভ হবে না। তাই আমি সেই বাণ্ডিলটা চাওয়ামাত্র সে সেটি নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিল। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার টাকা ছিল এবং আরও মজার কথা এই যে, কর্নেল বার্নের সিল্কের রুমাল দিয়েই বাঁধা ছিল টাকাগুলো।

ফিরে যেতে যেতে আমাদের বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কোন্ জবানবন্দিটা সত্যি—আগেরটা না পরেরটা?'

সে এর উত্তরে বলল, 'হায় সায়েব। আপনি আমার মুখ দেখে প্রথমেই আমাকে চোর বলে সন্দেহ করেছিলেন, আমার গলার আওয়াজ শুনে আমি যে মিথ্যা বলছি তা বুঝতে পেরেছিলেন। আপনাকে আর কী বলি? এই আমার কিসমৎ, এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আর কী করব এখন?'

এই কেসটির বিচার হয় হাইকোর্টে এবং লোকটির তিন বছরের জেল হয়।

প্রশ্রয়দাতা মনিব ও অসাধু ভৃত্য

১৮৭০ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে চীফ জাস্টিস সার বার্নেস পীকক হঠাৎ দেখলেন, তাঁর পাঠাগার থেকে বিদেশী প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রার সংগ্রহ উধাও হয়েছে। অনেক বছর ধরে তিনি এই মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। ওজনদরের চেয়েও এর অন্য দাম অনেক বেশি ছিল। এবং ওজনদরও খুব কম ছিল না।

এই সময় তিনি ইংল্যাণ্ডে যাবার জন্য সব গোছগাছ করছিলেন। এজন্য কয়েকজন চীনা মিস্ত্রী এবং বাইরের আরও কয়েকজন সাহায্যকারী লোক নিযুক্ত হয়েছিল। সবাই তাঁর বাড়িতেই কাজ করছিল। বাড়ির মধ্যে এত বাইরের লোক কাজ করছিল যে, তাঁর মূল্যবান মুদ্রাগুলি যে আর উদ্ধারের আশা নেই, একথা তিনি প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন। তবু যে তিনি থানায় আমার কাছে ঘটনাটি রিপোর্ট করতে এসেছিলেন সে কেবল থানায় জানানো কর্তব্য মনে করে।

আমি তখন পার্ক স্ট্রীট থানায়, আর স্যার বার্নেস থাকেন গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে, আমার এলাকার মধ্যেই। আমি তাঁর মুখ থেকে সব শোনার

পরেই ক্রুদ্ধ তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে তাঁর পড়ার ঘরে বসে চুরি সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে তাঁর সর্দার-বেয়ারাকে ডাকিয়ে আনালাম। তাকে বললাম, আমাকে সমস্ত বাড়িটা দেখাও, কোথায় কোন্ ঘর আছে তাও দেখতে চাই। আমি যে তাকে সন্দেহ করছি সে বিষয়ে বেয়ারাটার সন্দেহ ছিল না। কেননা তাকেই আমি প্রথম ডাকিয়ে এনেছি। তাই তার মুখে চোখে অপরাধের ভাবটা পুরোপুরি ফুটে উঠতে দেখলাম। তখন আমি ইচ্ছে করেই সার বার্নেসের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। যাতে সেই অবসরে বেয়ারার মুখের ভাব আরও ভালভাবে লক্ষ করতে পারি। ফল পেলাম আশাতীত। একটু দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছিলাম তার ঘাড়ের দুপাশের শিরা ফুলে উঠেছে। হাতের আঙুলের মধ্যেও মনের ভিতরের অস্থিরতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। সে তার অজানতেই হাতের ঝাড়ন থেকে সুতো টেনে টেনে ছিঁড়ছিল।

আমাদের আলোচনা শেষে সার বার্নেস তাঁর বেয়ারাকে আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখাতে ও যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাবে সব খুলে বলতে আদেশ দিলেন। আমি হেসে বললাম, 'সার বার্নেস, আপনি তো খোদ চোরকেই এসব আদেশ দিচ্ছেন।'

সার বার্নেস চমকে উঠে বললেন, 'বলেন কী! আপনি নিশ্চয় আমার বেয়ারাকে সন্দেহ করছেন না? এ লোকটি বহুদিনের বিশ্বাসী চাকর। ষোল বছর আমার কাজ করছে, মানে যখন থেকে আমি ভারতবর্ষে এসেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার সততায় আমি কখনও সন্দেহ করার অবসর পাই নি।'

আমি বললাম, 'সার বার্নেস, হতে পারে আপনার কথা সত্যি। তবু আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে-লোকটি এখন আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কাছেই আপনার চুরি যাওয়া মুদ্রাগুলো পাবেন। শুধু তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানোর অপেক্ষামাত্র।'

সার বার্নেস বললেন, 'মিস্টার রীড, আপনার যদি এ রকম ধারণা হয়ে থাকে, তা হলে আমার মুদ্রাগুলো উদ্ধারের জন্য আপনার যা ভাল মনে হয় করুন।'

প্রধান বিচারপতি অনুমতি পেয়ে যথাকর্তব্য শুরু করলাম। বেয়ারাকে জানালাম, 'চোরাই মুদ্রাগুলোর জন্য তোমাকে আমি পয়লা নম্বর আসামী খাড়া করছি।'

একথায় লোকটি তার মনিবের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিলাম না। কারণ, আমি দেখলাম, সার বার্নেস তার কাতর মুখ দেখে বিগলিত হয়েছেন এবং মনে হচ্ছে, যেন তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁর প্রিয় ভৃত্যকে এভাবে সন্দেহ করা হোক এটা যেন তাঁর অভিপ্রেত নয়। তাই আমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে লোকটির দেহ তল্লাসী করতে আরম্ভ করে দিলাম। দেখলাম তার কোমরে একটি চাবি বাঁধা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ চাবি কিসের?'

'এটা আমার বাক্সের চাবি, সার।'

'তোমার বাক্স কোথায়?'

'আছে এই বাড়িতেই একটি গুদামের মধ্যে।'—উত্তরটা দিল কিছু দ্বিধার সঙ্গে।

'আমি ঐ বাক্সে কী অছে দেখতে চাই।'

এরপর আর কিছু বলতে হল না। বেয়ারা বুঝতে পারল আর চালাকি চলবে না। তাই সে ফস করে তার মনিবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। স্যার বার্নেস সবই দেখছিলেন।

বেয়ারা চুরি স্বীকার করল এবং অপহৃত মুদ্রাগুলিও ফিরিয়ে দিল। সেগুলো তার বাক্সেই ছিল।

(এই কেস্‌টির বিস্তারিত খবরের জন্য ১৮ই এপ্রিল ১৮৭০-এর 'ইংলিশম্যান' ও 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' দ্রষ্টব্য। সার বার্নেস হাইকোর্টে সে সময়ে ফৌজদারি সেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই ইংল্যাণ্ড অভিমুখে রওনা হবেন, এজন্য পুলিসকোর্টে দুজন ম্যাজিস্ট্রেট এ কেস্‌টির বিচার করেন।)

একটি জেল-পালানোর কাহিনী

কয়েক বছর আগে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে এক কুখ্যাত সিঁদেল চোর দীর্ঘমেয়াদি জেল খাটছিল। একদিন তাকে জেল-গভর্নর ডাক্তার লিঞ্চের বাসস্থান মেরামতের কাজে লাগানো হয়। জেলের প্রধান ফটকের ঠিক ওপরে ছিল তাঁর বাসা। অন্যান্য কয়েদীও তার সঙ্গে কাজ করছিল।

এই কয়েদী-চোরের নাম বৈকুণ্ঠ। কাজ শেষ হলে সবাইকে একত্র ডেকে

তাদের সংখ্যা গোনার সময় দেখা গেল একজন কম পড়েছে। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ নেই।

খোঁজ! খোঁজ! কোথায় গেল বৈকুণ্ঠ? কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। সমস্ত জেলখানা তন্নতন্ন করে খোঁজ হল, কিন্তু সব বৃথা।

আসলে সে যা করেছিল তা এই। সবাই মিলে কাজ করতে করতে সে কোনো এক ফাঁকে ডাক্তার লিঞ্চের বাথরুমে ঢুকে সেখানে বড় একটা টব উল্টো করে তার নিচে লুকিয়ে ছিল। রাত্রে ডাক্তার লিঞ্চ ডিনার খেতে বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত প্রায় বারোটায়। ততক্ষণ সে ঐ টবের নিচে বসে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করেছিল।

ডাক্তার লিঞ্চ ফিরে এসে পোশাক ছেড়েই বিছানায় শুয়ে পড়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হন। বৈকুণ্ঠ এবার টব থেকে বেরিয়ে এসে খুব সাবধানে সাহেবের ছাড়া পোশাক নিজে পরল। হ্যাট, পেটেন্ট চামড়ার বুট, কোনোটাই বাদ গেল না। মোট কথা সে নকল জেল-গভর্নর সাজল। এর পরের ধাপগুলি অত্যন্ত সহজ। অর্থাৎ নিচে নেমে যাওয়া এবং প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া। নিচে নামার আগে সে সাহেবের ড্রেসিং টেবিল থেকে কিছু অলঙ্কারপত্রও পকেটস্থ করেছিল।

এমন চালের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল যে প্রহরীরা তাকে দেখে সন্দেহমাত্র করে নি যে, সে অন্য কোনো লোক হতে পারে। বরং তাকে দেখে প্রহরী যথারীতি কুর্নিশ করেছিল।

পরদিন প্রেসিডেন্সি জেলে মহা হৈ-চৈ! কারণ বৈকুণ্ঠ নেই! জেল-গভর্নরের জুয়েলারি নেই! পোশাক নেই! ডাক্তারের বাথরুমে বার হল কয়েদীর পোশাক আর নম্বর। তারপর প্রহরীর সাক্ষ্যে যা জানা গেল, তাতে আর সন্দেহ রইল না যে, বৈকুণ্ঠই এই চাতুরি খাটিয়ে পালিয়ে গেছে। শহরতলীর সর্বত্র হুলিয়া প্রচার করা হল, পলাতক কয়েদীকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হল। বৈকুণ্ঠ কিন্তু তার বিরুদ্ধে জেল-পালানো এবং জেল-গভর্নরের পোশাক চুরির অভিযোগ নিয়ে গা ঢাকা দিয়েই রইল। কেউ তাকে ধরতে পারল না।

এরপর দশ মাস কেটে গেছে। এতদিন পরে শহরের উত্তর এলাকায় এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে সে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। বৈকুণ্ঠ

এবারে কিন্তু আর বৈকুণ্ঠ নয়। সে এখন অন্য আর এক নামে ফিরে এল জেল খাটতে। সে এখন রামচরণ।

এই বৈকুণ্ঠের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে ইচ্ছে করলে মুখের চোহারা এমন বদলে ফেলতে পারত যে, তার খুব অন্তরঙ্গ লোকও অনেক সময় তাকে চিনতে পারত না। আর এই ক্ষমতার বলে সে নিজেকে চীনা, বর্মী, অসমীয়া, বাঙালী অথবা হিন্দুস্থানীরূপে অনায়াসে পরিচয় দিতে পারত। বিলেতের ডেভিড গ্যারিক নামক বিখ্যাত অভিনেতার এই ক্ষমতা ছিল। তিনি দুইবারে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত চেহারা করতে পারতেন। এমন কি মুখের ভাব বদলের সাহায্যে তিনি জাতীয়ত্বের ভ্রান্তি ঘটাতে পারতেন। আর এইজন্যই অভিনেতারূপে তিনি এত সফল হতে পেরেছিলেন।

এই বৈকুণ্ঠের বেলাতেও ঠিক এই ভ্রান্তি। নতুন নামে সে যখন আর এক চুরির দায়ে জেলে ফিরে এল, তখন জেলের কর্তৃপক্ষের কেউ তাকে বৈকুণ্ঠ বলে চিনতে পারেন নি। এই লোকটাই তাঁদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে দশ মাস আগে জেল থেকে জেল-গভর্নরের পোশাকে প্রহরীর কুর্নিশ নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তা বুঝতে না পারায় অবাক হবার কিছু নেই। লোকটি বৈকুণ্ঠ কি না! তার পক্ষে যে সবই সম্ভব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার এক পুরানো জেলসঙ্গীর কাছে ধরা পড়ে গেল। তাকে মজুর খাটার বিভাগে পাঠানো হয়েছিল। এইখানে তার সঙ্গে দেখা হল তার সেই পুরানো মেটের সঙ্গে। বৈকুণ্ঠ তার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল, সেইখানে তাকে চিনতে পেরে সে চমকে ওঠে। এই সুযোগে জেলকর্তাদের কাছে ভালমানুষ সাজার ইচ্ছাটা তার প্রবল হয়ে উঠল। সে সব ফাঁস করে দিল তাঁদের কাছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠও সহজ পাত্র নয়। সে তো এখন আর বৈকুণ্ঠ নয়, এখন সে রামচরণ। অতএব তার ভয়টা কিসের? সে বলল, ঐ কয়েদী একটি ব্যক্তিগত কারণে তাকে জব্দ করার জন্য মিথ্যা করে তার বিরুদ্ধে এইসব লাগিয়াছে। ব্যক্তিগত কারণটা আর কিছুই নয়, একখণ্ড আফিমের ভাগ নিয়ে মনান্তর। এই আফিম সে নিজের কৌশলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে জেলের মধ্যে এনেছে, অথচ সে এর বড় একটা অংশ দাবি করছে। তার কথা যে কত সত্য তা প্রমাণের জন্য সে সেই আফিম এনে জেলারের হাতে তুলে দিল।

রামচরণকে বৈকুণ্ঠ বলে চিনিয়ে দিতে পারে এমন কেউ তখন আর

জেনে ছিল না। তার কথা যে মিথ্যে, তার প্রমাণ হল না। বৈকুণ্ঠ প্রায় জিতেই যাচ্ছিল। এমন সময় তখনকার জেলার মিস্টার উইলসনের মাথায় এক বুদ্ধির উদয় হল। যে-এলাকায় বৈকুণ্ঠ স্বনামে প্রথম চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল, তিনি সেইখানকার থানার অফিসারকে এইখানে আনিয়ে তাঁকে দিয়ে রামচরণকে সনাক্ত করাতে মনস্থ করলেন। থানার এই অফিসারটি কাউকে একবার দেখলে তার মুখ মানে রাখতে পারেন এই রকম একটি খ্যাতি ছিল তাঁর। তাঁকে এনে বৈকুণ্ঠসহ এগারোজন কয়েদীকে প্রধান ফটকের সামনে এনে দাঁড় করানো হল। একের পিছনে এক এইভাবে এক সারিতে তাদের দাঁড় করানো হল। মিস্টার উইলসনের নিমন্ত্রণে আমিও সেখানে হাজির ছিলাম।

আমাকে বলা হল অপরাধী বাছাই করতে। আমি পর পর সবাইকে দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সারির মাঝামাঝি এসে দেখি একটি লোকের মুখ বেঁকে আছে। ঠোঁট মুখের ডান দিকে টানা। দেখলেই বোঝা যায় সে এক অদ্ভুত বিকৃতি। মুখের একটি পেশীও নড়ছিল না। মনে হচ্ছিল চোখ দুটিও যেন নিষ্পলক। সন্দেহ রইল না যে মুখখানি লোকটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আছে। একটিমাত্র অপরাধ-প্রকাশ চিহ্ন বাইরে ফুটে উঠেছিল, তার চোখের তারায়। অপরাধেরও ঠিক বলা যায় না। বরং সেটি ভয়ের চিহ্ন বলাই যুক্তিসঙ্গত। মুখকে কৃত্রিম উপায়ে বেঁকিয়ে রাখার জন্য তার যে শক্তি ব্যয় হচ্ছিল তাতে তার চোখের তারার সঙ্কোচ আর বিস্তার ঘটছিল অবিরাম। সারির বাকি লোকদের পরীক্ষার জন্য আর না এগিয়ে বৈকুণ্ঠের ঘাড়ে হাত দিয়ে বললাম, 'সারি থেকে বেরিয়ে এস।' মিস্টার উইলসনকেও সেই সঙ্গে বললাম, 'এই আপনার লোক।'

বৈকুণ্ঠ জেলারের পায়ে লুটিয়ে পড়ে সব স্বীকার করল। তারপর যখন সে উঠে দাঁড়াল, তার মুখ স্বাভাবিক হয়েছে। তখন সে মুখ দেখে তাকে বৈকুণ্ঠ বলে সবাই চিনতে পারলেন।

পর্যবেক্ষণ

বন্ধুগণ, যদি কোনো স্ফূর্তিবাজ, ছলনাপটু, ধূর্ত, সাহসী, নিঃস্বার্থ এবং কেতাদুরস্ত মানুষের দেখা পান তবে জানবেন সে আপনাকে ঠকাবে।

যে মশলা থেকে তৃতীয় রিচার্ডের মতন লোক জন্মায়, এর চরিত্রও তা থেকেই সৃষ্টি। এই চরিত্রই ওস্তাদ প্রতারকরূপে দেখা দেয়।'

এমন লোকের সঙ্গে চালাকি খাটাতে যাবেন না। সে সহজেই তা ধরে ফেলবে। তাকে বুঝতে দিন যে আপনিও প্রতারক। এটি প্রথম দেখা হতেই বুঝতে দিন। এই সঙ্গে তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করুন যাতে তার ধারণা হয়, তার কাজে আপনি সাহায্য করতে পারবেন। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তার আদেশ পালন করুন। তা করলে তাতে যে আপনারও স্বার্থসিদ্ধি ঘটবে এমন ধারণা জন্মিয়ে দিন তার মনে। এ-জাতীয় লোক বেশ একটু উদার হয়, তাই সে আপনার ব্যবহার যে খুব যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে তা বুঝে আপনাকে তার সাগরেদ ভেবে অনেক কিছুরই অংশ আপনাকে দেবে। যদি এদিক দিয়ে আপনি কিছু হতাশও হন, তবু এমন ভাব দেখান যে, আপনি তার ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট। তার কোনো ব্যবহারিক ত্রুটিতে তাকে ধরিয়ে দেবার দেবার চেষ্টা না করে, সুযোগ খুঁজুন। তার চরিত্রের উপর নজরদারি না করে, আপনি আপনার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকুন।'

ডিকেন্স যে যুগে বাস করতেন, সে-যুগের মানুষ এবং তাদের আচরণ যেভাবে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এমন আর কেউ করেন নি। ধনী হোক, দরিদ্র হোক, প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর চরিত্র তিনি চিরকালের ক্যানভাসে উজ্জ্বল রঙে এঁকে গেছেন। ডিকেন্স যে নৈপুণ্যের সঙ্গে এসব পর্যবেক্ষণ করেছেন, ডিটেকটিভ হতে হলেও পর্যবেক্ষণে সেই নৈপুণ্য দরকার। এটি একটি শিল্প—এবং বড় শিল্প। অথচ দেখা যায় খুব কম লোকই এই শিল্পচর্চা করেছেন। অনেক ডিটেকটিভেরও এই পযবেক্ষণ শক্তির অভাব আছে। যে-কোনো লোক, যার একটু বুদ্ধি আছে, সে অনুশীলন করলে বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ হতে পারে। অথচ দেখা যায় উদ্ভিদবিদ্যা কম লোকই জানে। নয় শত নিরানব্বুই জন লোক ময়দানের ভিতর দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু সেখানকার গাছগুলির কোনো বৈশিষ্ট্য দেখবেই না, বা তাদের কোনো পরিচয় জানবার চেষ্টা করবে না। হাজারের সেই বাকি একজন প্রতিপদে গাছপালায় আকৃষ্ট হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবে। ঠিক এক নয়শত নিরানব্বুই জন লোক জনতার ভিতর দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু যেসব মানুষকে সে দু'পাশে অতিক্রম

করে চলেছে, তাদের চেহারা, তাদের আচরণ অথবা তাদের চলার ভঙ্গির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যই দেখবে না। অথচ প্রতি পাঁচজনের মধ্যে অন্তত একজন মানুষ লক্ষ করবার মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই দৃষ্টি যাদের আছে তারাই ডিটেকটিভ হবার উপযুক্ত। আমি মনে করি, সামান্য অনুশীলনের সাহায্যে প্রত্যেকটি লোকই ডিটেকটিভ হতে পারে। হয় না কেন তার কোনো কারণ আমি দেখতে পাই না।

বছর দুই আগে রেল-পুলিস-সমিতি একটি সন্ধানের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন শাখায় যেসব পুলিস আছে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং সংগঠন কেমন, তা জানাই ছিল এইসব সন্ধানীদের কাজ। সব জায়গায় নানারকম অনুসন্ধান এবং বিবরণ সংগ্রহ করে জানা গেল ৮০০০ মাইল রেলপথের নানাস্থানে সন্ধানী কাজে নিযুক্ত করা যায় এমন নিপুণ ডিটেকটিভের বড়ই অভাব। মোট কথা কোনো ডিটেকটিভ-পদ্ধতিই কোথাও নেই। এই সমিতি এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন, ভারতীয়দের মধ্যে গোয়েন্দা বুদ্ধির অভাবের জন্যই প্রধানত এটি ঘটেছে! কিন্তু এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ভারতীয়দের মধ্যে গোয়েন্দাগিরির ক্ষমতার অভাব থাকার দরুন যে এটি হয়েছে মোটেই তা নয়। হয়েছে উচ্চপদস্থ অফিসারদের বাছাই করার ক্ষমতার অভাবের দরুন। ভারতীয় পুলিসদের মধ্যে কারো যে এ ক্ষমতা থাকতে পারে এ-বিশ্বাস তাঁদের নেই বলেই তাঁরা উপযুক্ত লোককে দেখেও দেখেন না। আমি দু'একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করি।

রাত্রির ঘটনা: একজন মুসলমান চাকর ঘাড়ে একটি চটের মস্তবড় থলে নিয়ে পার্ক স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিল। প্রহরারত কনেস্টবল তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, থলের মধ্যে কি আছে। লোকটি একটু ভেবে বলল, 'খোদা জানতা, মহারাজ।' এই উত্তরটা দিতে যে সামান্য একটুখানি দেরী হল, এতেই কনেস্টবল-এর মনে সন্দেহ হয়।

লোকটি বলল, 'খোদা জানতা, মহারাজ, আমি এটি পথে কুড়িয়ে পেয়েছি—তাই কাছাকাছি কোনো থানায় জমা দিতে চলেছি। এর দাবিদার কেউ নেই। কিন্তু আপনি যখন সরকারী লোক, তখন আপনাকেই এটা দিয়ে যাই। আপনি কি নেবেন এটা? আমার বড্ড

তাড়া আছে কি না, তাই। আমি যাচ্ছি একটা মরণাপন্ন রুগীর ওষুধ কিনতে—স্কট টমসন্ অ্যাণ্ড কোঃ-এর ওষুধের দোকানে। চলতিপথে এই থলে কুড়িয়ে পেয়ে এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছি।'

এই কৈফিয়ৎ শুনে বেশির ভাগ লোক তা বিশ্বাস করত, এবং ঐ লোকটিকে স্বাধীনভাবে যেতে দিত। কিন্তু পার্ক স্ট্রীটের ঐ ভবী এ-কথায় ভুলল না। সে বলল, 'উহুঁ, ঐ থলে নিয়ে একেবারে থানায় চল তো।' থানায় নিয়ে ব্যাগ খুলে দেখা গেল তার মধ্যে অনেকগুলি পোশাক রয়েছে। বেশ দামী পোশাক, এবং সেগুলি বেঙ্গল ক্লাবের। আরও প্রমাণ হল, যে লোকটা ওটা ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই স্বয়ং চোর।

থানার ইন্সপেক্টর এই কনস্টেবলের নাম 'গুড কনডাক্ট'-এর বইতে তুললেন এবং সুপারিশ করলেন, ভবিষ্যতে প্রোমোশনের সময় এর কথাটা যেন ভুল না হয়। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার ভাবলেন এ লোকটি এমন আর কী করেছে যার জন্য একে প্রোমোশন দিতে হবে।

দেখুন, এইভাবে যে কনেস্টবলটি আপনা থেকেই গোয়েন্দাগিরির বুদ্ধির পরিচয় দিল এবং এমন উল্লেখযোগ্যভাবে দিল। তাকে উৎসাহ দেওয়ার বদলে তার এই সহজাত বুদ্ধির আলোটা আরও কি না ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেওয়া হল!

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই! ১৭নং ক্যামাক স্ট্রীটে এক দেশী দর্জি ঐ বাড়িতে একটি বারান্দায় বসে কাজ করত। সেখানে মহিলাদের ড্রেসিং রুম থেকে পেগে ঝোলানো দামী সিল্কের পোশাকের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে এবং জিনিসটির জন্য তার লোভ হয়। সে ঐটে দেখার পর থেকে কেবলই ভাবতে থাকে ওটা অন্যের অলক্ষ্যে কি ভাবে হাত করা যায়। সে জানত, ও বাড়ি থেকে যে-কোনো পুঁটুলি বাইরে যাবে, সেটাকেই আগে খুলে দেখা হবে তার মধ্যে কী আছে। কাজেই পুঁটুলি বানিয়ে ওটাকে বাইরে নেওয়া যাবে না। অতএব সে যা করল তা এই: বাড়ির সবাই সন্ধ্যায় গাড়িতে করে বেড়াতে যাবার সময় পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তারপর তার নিজের ঢিলে পাজামার শেলাই কেটে ফেলে পাজামাটাকে লুঙ্গিতে পরিণত করল। ঠিক লুঙ্গি নয়, আমাদের ঘাঘরার মত দেখতে হল। এরপর সে মহিলার সিল্কের পোশাকটি পরে ফেলল অন্তর্বাস যেমন পরে তেমনি করে। তারপর সেই কাটা পাজামাটি তার

উপর দিয়ে পেঁচিয়ে দিল। তখন আর ভিতরের সিল্কের পোশাকটি দেখা যাচ্ছিল না, ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তারপর যখন সে গায়ে একটি শাল জড়িয়ে নিল, তখন আর তাকে কে ধরে? সে তখন আয়া। এবং আয়া বেশেই বেরিয়ে গেল, দারোয়ান কিছুই বুঝতে পারল না।

কিন্তু ক্যামাক স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটে পড়তেই সে সেখানকার প্রহরারত এক কনস্টেবলের প্রায় মুখোমুখি এসে পড়ল। তখন সে হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাবতে লাগল, যাব কি যাব না। পুলিসের লোকটি তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি পথ হারিয়েছ?' সে আয়ার বেশেই ছিল, তাই পুলিসম্যানের দোষ নেই। কিন্তু 'আয়া' তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে হঠাৎ নিজেকে ভুলে গিয়ে পুরুষ দর্জির গলায় বলে উঠল 'হাঁ, পথ হারিয়েছি।' সেই কর্কশ গলা শুনে তাকে কোনোমতেই স্ত্রীলোক মনে হল না, গলাতেই সে ধরা পড়ে গেল। তারপর যখন তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল, তখন সে যে স্ত্রীলোক নয় সে কথা তাকে স্বীকার করতেই হল। কাজেই পরেরটাও আর বাকি রইল না। সেই সিল্কের পোশাকের মালিক মহিলাকে কয়েকদিন পরেই টাউনহলে অনুষ্ঠিত বল-নাচে দেখা গিয়েছিল, এবং তার জৌলুষের আকর্ষণে কেউ কেউ তাঁকে ফ্লার্ট করারও সুযোগ দিয়েছিলেন। যাই হোক, সে সব আমার বক্তব্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। এই কনস্টেবল যে ইনপেক্টরের অধীনে কাজ করছিল, আমি তাঁকে এর কিছু পুরস্কার পাওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু পূর্বের ঐ কেস্‌টার মত এটাতেও ডেপুটি কমিশনার কনস্টেবলের কাজে প্রশংসাযোগ্য কিছু দেখতে পেলেন না। অতএব তাকে পুরস্কার দেওয়া হল না।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: আড়াই বছরের একটি শিশুকে পথে কুড়িয়ে পাওয়া গেল। কোনোমতেই তার পরিচয় বা ঠিকানা তার কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তার কোনো একটা ব্যবস্থার জন্য তাকে আমার অফিসে আনা হয়েছিল। তার হাতের মুঠোয় চানাভাজা জাতীয় কিছু ছিল। কোনো মুদি দয়াপরবশ হয়ে হয়তো তাকে দিয়েছে। নতুন পরিবেশে খুব ভয় পেয়ে গেলেও ছেলেটি হাতের ভাজা দানা দু-একটা মুখে পুরছিল। এই রকম খেতে দেখে আমি তার জন্য কিছু মিষ্টি আনিয়ে দিলাম। মিষ্টিগুলো খাওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল সে অনেকক্ষণ কিছু খায় নি। খাওয়া শেষ হলে শিশুটিকে

একটি কনস্টেবলের জিম্মায় দিয়ে দিলাম। শিশুটি বারান্দায় বসে হাতের মুঠো থেকে দানাগুলো নিয়ে প্রেসের টাইপ সাজানোর ভঙ্গিতে সাজাতে লাগল, খুব এলোমেলোভাবে অবশ্য। সবগুলো দানা যখন সাজানো শেষ হল তখন সে আবার সেগুলো ভাঙতে লাগল। এবারেও প্রেসে ছাপার পর যেমনভাবে টাইপ ডিস্ট্রিবিউট করে তেমনি ভঙ্গিতে সেগুলো এক-একটা খোপে রাখার ভঙ্গিতে রাখতে লাগল।

কনস্টেবল তার এই কাণ্ড দেখে আমার কাছে এসে বলল, 'সাহেব, আমার রোঁদের এলাকায় একটা ছাপাখানা আছে। আমি বাইরে থেকে জানালার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে তাদের কাজ দেখেছি। এই ছেলেটি ঠিক তাদের মত টাইপ সাজানো আর ভাঙার কায়দায় হাতের চানাগুলো সাজাচ্ছে আর ভাঙছে। তাই আমার মনে হয় এর বাবা প্রেসের কম্পোজিটার।'

অনুসন্ধান করে দেখা গেল ঠিক তাই।

আমি কর্তৃপক্ষকে বললাম, এই কনস্টেবলকে গোয়েন্দা বিভাগে নেওয়া উচিত। তার বয়স কম এবং পুলিসের কাজে অল্প দিনমাত্র ঢুকেছে। কিন্তু আমার সুপারিশকে তাঁরা উড়িয়ে দিলেন। সম্ভবত তাঁরা ভাবলেন, যে-কোনো নির্বোধ ব্যক্তিও এটা ধরতে পারত। আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম। আমি মনে করি চানা সাজানো দেখে সে যে প্রেসের কম্পোজিটারের কাজ নকল করছে সে অনুমান দশ হাজারের মধ্যে একজনও করতে পারত কি না সন্দেহ।

এইভাবেই এক-একটি লোকের গোয়েন্দাগিরির সহজাত শক্তিকে গোড়াতেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। খবরের কাগজের কলমে আর জন-সাধারণের মুখে সবসময় প্রচার হচ্ছে যে, ভারতীয়দের মধ্যে গোয়েন্দাগিরির ক্ষমতার বড়ই অভাব। উচ্চপদে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিজেদেরই যদি ডিটেকশন বিদ্যার মূল নীতিগুলি অজানা থাকে, তা হলে তাঁরা নিম্নপদস্থদের ভিতর যে গোয়েন্দাগিরির সহজ চেতনা আছে, তাকে উৎসাহ দিয়ে বাড়াবেন কি করে?

বুদ্ধিচাতুর্য, দ্রুতবীক্ষণ ক্ষমতা, এবং চালাকি, এইসব গুণের জন্য বাঙালীরা বিশেষভাবে খ্যাত। ডিটেকটিভ বিভাগের প্রধানদের হাতের এরা বিশেষ প্রশংসনীয় হাতিয়ার। অবশ্য যেখানে মনের বিরুদ্ধে মনের লড়াই, অর্থাৎ

যেখানে রহস্যভেদের জন্য বিশ্লেষণী ক্ষমতার দরকার হয় সেই উচ্চ ক্ষমতার ক্ষেত্রে এরা উঠতে পারে না। তথাপি এদের কাছ থেকে গোয়েন্দাগিরির কাজে যেটুকু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তা তুচ্ছ নয়।

কতকগুলো নিয়মমাফিক সন্ধানরীতির উপরে ওঠার ক্ষমতা থাকাই ডিটেকটিভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাঁকে একান্তে বহুরকম পর্যবেক্ষণ ও তা থেকে বহু অনুমান গড়ে তুলতে হয়। তাঁর প্রতিপক্ষও হয়তো ঐ রকমই করে। কিন্তু অনুমানের যাথার্থ্য থেকে পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্যই আসল সত্যকে চেনবার পক্ষে বেশি উপযোগী।

এখন আমি নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ডিটেকশনের কাজে কত মূল্যবান তার বর্ণনা দিচ্ছি।

পর্যবেক্ষণের রীতি

প্রিন্স অব ওয়েলস [পরে ৭ম এডোয়ার্ড] যখন ভারত পরিদর্শনে আসেন [১৮৭৫-৭৬], তখন সার স্টুয়ার্ট হগ আমাকেই যুবরাজের রক্ষীরূপে নিযুক্ত করেন। যুবরাজ যতদিন কলকাতায় ছিলেন, আমিও ততদিন তাঁর রক্ষীর কাজ করেছি। তৎকালীন [পুলিস কমিশনার এবং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান] স্টুয়ার্ট হগ যুবরাজের ভারত আগমনের ঠিক পূর্বেই নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। এঁর নামেই কলকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটটি সার স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট। যা কলকাতার সাধারণ লোকদের কাছে হগসাহেবের বাজার নামে পরিচিত হয়েছে।

প্রত্যেকটি সাধারণ অনুষ্ঠানে আমাকে যুবরাজের সঙ্গে থাকতে হত। এই সময়ে কোথাও কোনো সন্দেহজনক চরিত্র কাছাকাছি আছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আমার কাজের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। আমার মনে আছে, একদিন যুবরাজ গার্ডেন রীচে কয়েকজন দেশী সামন্ত রাজের কাছে প্রতি-নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গভর্মেণ্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তাঁকে দেখবার জন্য রেড রোডের শোভাযাত্রার দুধারে দারুণ ভিড় জমে যায়। এ পথে সে-সময়ের জন্য অন্য গাড়ি চলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পথটিকে ভিড় মুক্ত রাখার জন্য দুধারে ডবল লাইনে পুলিস কনস্টেবল নিযুক্ত হয়েছিল। যুবরাজের গাড়ি থেকে পঞ্চাশ যাটগজ সামনে

ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে চলেছিলাম আমি। ছুদিকে জনসমুদ্র। সবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে করে চলেছি। যখন লর্ড হারডিঞ্জ-এর মূর্তির কাছাকাছি এসেছি তখন একটি বিশেষ লোকের প্রতি আমার চোখ পড়ল। তার মাথা অন্যান্য সবার মাথা থেকে অনেক উপরে। চোখে পড়ার ~~মতন~~ মতই লম্বা চেহারা লোকটার। জনতার প্রথম সারিতে ছিল সে। কিন্তু আমি তার খুব কাছে এগিয়ে আসতে দেখি সে একটুখানি ঝুঁকে পড়ে আর সবার সমান হবার চেষ্টা করছে। দেখে, আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। আমি তখনই একজন অশ্বারোহী কনস্টেবলকে ডেকে তার হাতে তাকে সমর্পণ করে বলে দিলাম, থানায় নিয়ে তাকে যেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

লোকটি পশ্চিমা। প্রথমে সে নিজের কোনো পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বীকার করল। তার দেহ অনুসন্ধান করা হল। পাওয়া গেল একখানা দরখাস্ত—প্রিন্স অব ওয়েলস-এর নামে। লালবাজারের স্মল কজ কোর্টের আশে-পাশে বহু ব্যবসাদার দরখাস্ত-লিখিয়ে থাকে। এখানাও তাদের একজনকে দিয়ে লেখানো। দেশের একখণ্ড জমি নিয়ে কার সঙ্গে গোলমাল বেধেছে, তারই একটা মীমাংসার জন্য প্রিন্স অব ওয়েলস-এর নামে দরখাস্ত-খানা লিখিয়ে এনেছে। তার ইচ্ছা ছিল, প্রিন্সকে সে নিজহাতে সেখানা পেশ করবে। এর জন্য সে যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল। তাকে আগে থাকতে গ্রেপ্তার না করলে অবশ্যই সে এ কাজটি করত। কিন্তু তার আসল মতলব কি ছিল তা আর জানা গেল না। একখানা বাজে দরখাস্ত যুবরাজকে দেবার জন্য এতটা ঝুঁকি কেউ কি সহজে নেয়?

বিস্ময়ের ব্যাপার—ফেরবার পথেও এমনি এক কাণ্ড ঘটল। গভর্মেণ্ট হাউসের বেসরকারী প্রবেশদ্বারের কাছে পৌছতে আমি লক্ষ করলাম, একটি লোক ভিড় ঠেলেঠুলে কনস্টেবলদের সারিতে আসবার চেষ্টা করছে। কনস্টেবলরা এক গজ দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। দেখা গেল এগিয়ে ঠিক এসেছে। যদিও কনস্টেবলদের সমসারিতে নয়, ছুজনের মাঝামাঝি, কিন্তু একটু পিছনে। আমার ঘোড়া তার কাছাকাছি আসতেই সে একটু পিছনে সরে গিয়ে একটু অন্যদিকে মাথা ফিরিয়ে দাঁড়াল। আমি ঘোড়া থামিয়ে সাদা পোশাকপরা আমার একজন ডিটেকটিভকে ঐ লোকটাকে ধরে আনতে নির্দেশ দিতে গিয়ে দেখি ভিড়ের মধ্যে সে কোথায় মিশে গেছে। তাকে আর

কোনো মতেই বেছে বার করা গেল না। তার মনে যে একটা কোনো অপরাধ-বোধ ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নইলে হাজার হাজার লোকের মধ্যে তাকে ধরা হবে এ ধারণা তার এল কি করে?

অনেক সময়েই আমি রাস্তার মোড় ঘুরে হঠাৎ কোনো এক পলাতক আসামীর মুখোমুখি এসে পড়েছি—অথচ আমি তাকে চিনি না, কোনো দিন দেখিও নি। আমার ইউনিফর্ম পরা থাকলে এ রকম লোক হঠাৎ থেমে গিয়েছে, চমকে উঠেছে। হাতখানা মাথার উপর তুলে অকারণ টুপিটা হয় তো একটু এদিকে বা ওদিকে বেঁকিয়ে নিয়ে মাথা চুলকোতে আরম্ভ করেছে, অথবা মাটির পাইপ মুখে থাকলে তা এমন জোরে কামড়িয়েছে যে, তা ভেঙে গিয়েছে আর নিচের তামাকসুদ্ধ বাটিটা মাটিতে পড়ে গিয়েছে। এ সবই তার মানসিক অস্থিরতার চিহ্ন, হঠাৎ পুলিস দেখে ফুটে ওঠা। পলাতক আসামীর আরও একটা অভ্যাস আমি লক্ষ করেছি। পুলিসের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নাকের পাশ ঘষতে থাকে। ডান হাতে কোনো জিনিস থাকলে বাঁ হাত ব্যবহার করে। দু'হাত মুক্ত থাকলে ডান হাত ব্যবহার করে এই কাজে। অথবা পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে থাকে। এমন কি দুপাশে রবার লাগানো জুতো, যার ফিতে নেই, এমন জুতোতেও ফিতে ঠিক করে নেওয়ার অভিনয় করতে দেখেছি। আরও একটা কৌশল খুব সাধারণ। হাতে লাঠি থাকলে সেখানা মাটিতে 'পড়ে যায়'—এবং সেখানা মাথা নুইয়ে তুলতে থাকে। এতে তাদের সাময়িক অস্বস্তিটা ঢাকা পড়ে বটে, কিন্তু তারা যে মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেছে সে কথাটা আর চাপা থাকে না।

এ রকম ক্ষেত্রে আমি সাধারণত এইভাবে তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিই—'ও হে, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।' লোকটি চমকে উঠে বলে, 'আমাকে, সার?'—বলতে বলতে সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে, এবং বলে 'নিশ্চয় আপনি ভুল করেছেন।' আমি বলি, 'না, ভুল করি নি, এসব ব্যাপারে আমার কখনও ভুল হয় না। আমার কাছে তোমার সম্বন্ধে যে সব বিবরণ আছে তাতে ভুল হবার কথাই নয়। ঐ যে তোমার নাকে একটা খাঁজ চিহ্ন, উপরের ঠোঁটে একটা চিহ্ন, বাঁ গালে আঁচড়ের দাগ, তা ছাড়া গায়ের রং, বয়স, দেহের উচ্চতা—সব যে মিলে যাচ্ছে গো! যদি তোমার নিজের কোনো সন্দেহ থাকে তবে তা মিটিয়ে দেব—আমার সঙ্গে একটিবার

থানায় চল।' এই বলে দেখেছি, দশটা কেসের মধ্যে নটা কেসেই আমি সাফল্য লাভ করি। অথচ তাদের কোনো বিবরণই থানায় নেই, সবটাই ছলনা। তাদের গ্রেফতার করার অন্য কোনো অতিরিক্ত ক্ষমতাও আমার নেই। তাদের কৈফিয়ৎ রচনার সময় ও সুযোগ না দিয়ে এই সব কৌশলের সাহায্যে আমি তাদের মুখ থেকে সত্য কথাটা বার করে নিই।

অপরাধের চেতনা কোনো কোনো মানুষের বেলায় কিভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

একদিন বিকাল বেলা ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই আমি সুন্দর চেহারার একটি যুবকের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। পোশাকটা তার নাবিকের, শুধু চুলগুলি সামরিক রুচির পক্ষে বেমানান রকমের বড়। কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে দেখলে তাকে সেনাবিভাগের লোক বলে চিনতে দেরি হয় না। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই তার মুখ থেকে ক্লে পাইপটি খসে পড়ল রাস্তার উপর। পাইপটি পড়ে ভেঙে গেল। সে তখন সেই ভাঙা পাইপের দিকে করুণভাবে চেয়ে রইল। পুরনো বন্ধু ছেড়ে গেলে মনে যে দুঃখ জাগে তারও তখন সেই অবস্থা। তার এই সাময়িক দুশ্চিন্তার সুযোগ নিয়ে তাকে বললাম, 'কিচ্ছু ভেবো না হে, কিছুকালের জন্য এ পাইপ তোমার আর দরকার হবে না।'

লোকটি হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি বলতে লাগলাম, 'তোমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আপাতত আমিই করে দিচ্ছি, তবে তামাক খেতে দিতে পারব কি না সে প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে পারছি না। হয়তো তোমার নিজের খরচেও তামাক যোগানো সম্ভব হবে না।'

'আমাকে, সার, আমাকে নিশ্চয় হাজতে পাঠাচ্ছেন না?'—লোকটি অত্যন্ত ভীতভাবে বলল। ভয় তার সমস্ত চোখেমুখে।

'আমি বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপাতত আমার উদ্দেশ্য ঠিক সেটাই। তোমার কাছে এটি যতই অপ্রীতিকর, অথবা আমার কাছে বেদনাদায়ক হোক, আমাকে এ কাজ করতেই হবে।

'কিন্তু সার, আপনি কি নিশ্চয় করে জানেন যে আমাকেই আপনি ধরতে চান? আপনার কি ভুল হচ্ছে না?'

আমি বললাম, 'না আমার ভুল হচ্ছে না। আমি যাকে খুঁজছি,

তোমার চেহারা, তোমার আচরণ সব তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তোমার উচ্চতা, তোমার বয়স, তোমার গায়ের রং, মুখের বাঁ-পাশে কাটা দাগ এবং লম্বা হাল্কা বাদামী রঙের চুল—ভুল হবার তো কোনো কারণ নেই।'

'সার, আমার লম্বা চুলের কথা বলছেন, আর রঙের কথা?'—লোকটির প্রশ্নের মধ্যে যেন একটা আশার আলো।

'হ্যাঁ। সেই কথাই তো বলছি।'

'তা হলে আপনি যাকে খুঁজছেন, সে আমি নই।—লোকটি বেশ জোরের সঙ্গে বলল। যেন সেই জিতে গেল। বলবার সময় তার আগের সেই ভীত চেহারাটা আর দেখা গেল না। 'এই দেখুন সার'—বলে সে চট করে মাথার টুপিটা খুলে মাথাটি আমার সামনে উন্মুক্ত করে ধরল। আমি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি, মোটেই তার লম্বা চুল নয়। সব চুল অত্যন্ত খাটো করে ছাঁটা। এত ছোট যে দেখে মনে হল সে কোনো সামরিক জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছে। যে চুল টুপিসুদ্ধ দেখা গিয়েছিল তা টুপির সঙ্গে শেলাই করা, তা তার ছদ্মবেশের একটা অঙ্গ। কিছুক্ষণের জন্য আমার মুখে কোনো কথা সরল না। কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক। আমি বললাম, 'হতে পারে তোমাকে প্রথম যে লোক বলে ভেবেছিলাম তুমি সে লোক নও, কিন্তু তোমার এই ছদ্মবেশ ধারণের জন্যই তোমাকে ধরা হচ্ছে।'

তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা গেল সত্যিই তাকে পুলিসে খুঁজছে। সে একটি সামরিক জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছে কলকাতায়। এখান থেকে নাবিক বেশে জাহাজে পালাবে এই তার উদ্দেশ্য।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমি হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে ডাউন মেল ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

গাড়ি এসে থামবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ মোটাসোটা এক বাবু একটি কামরা থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে আমার সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লেগে গেল। আমাকে দেখে সে অত্যন্ত ভড়কে গিয়ে তার এই অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা লাগার জন্য মাফ চাইতে গেল। দেখলাম কথা তার মুখে বেধে যাচ্ছে। এতে আমার সন্দেহ হওয়াতে আমি বাবুটিকে

থানায় নিয়ে গেলাম। তার হাতে একটিমাত্র কার্পেট ব্যাগ ছিল। সেটা খুলে দেখা গেল তাতে প্রায় একশ' খানা জাল নোট রয়েছে। প্রত্যেক-খানার মূল্য একশ টাকা। তারপর যথাযোগ্য সন্ধানের পর জানা গেল এই লোকটা তার চেয়েও কোনো বড় প্রতারকের হাতে ঠকেছে। হীরে দিয়ে হীরে কাটার ব্যাপার আর কি। লোকটি বৃত্তিতে স্বর্ণকার, কাশীতে তার দোকান আছে। একজন কুখ্যাত মাদ্রাজী জালিয়াত তার সঙ্গে দেখা করে তার কাছ থেকে দশ হাজার টাকার অলঙ্কার কেনে। এই জাল নোট দিয়েই সে অলঙ্কারের দাম পরিশোধ করেছে। তার পরেই সে কাশী থেকে সরে পড়েছে।

এই কেনা ব্যাপারটা ঘটেছে এক রবিবারে। পরদিন একখানি নোট যখন সে ব্যাঙ্কে পাঠায় তখন ধরা পড়ে যে সেখানা জাল নোট। ব্যাঙ্ক সেখানা বাজেয়াপ্ত করে। তাই সে নাকি নোটগুলো নিয়ে পরের ট্রেনে কলকাতা আসছিল কোনোমতে সেগুলো ভাঙানো যায় কিনা দেখতে। কিন্তু তাকে সময়মত গ্রেপ্তার করাতে তার এই উদ্দেশ্য আর সফল হতে পারল না। নোটগুলো নকল জেনেও সে, তা ভাঙাতে চেয়েছিল, তাই তাকে শাস্তি পেতে হল।

কিছুদিন পরে নোটজালকারী নিজেও ধরা পড়েছিল, কিন্তু কৌশল করে পুলিসের খপ্পর থেকে পালিয়ে গিয়ে একটি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

রহস্য ভেদ

ডিটেকটিভের শিক্ষিত দৃষ্টি বহু উপায়ে অপরাধ-চেতনাকে আবিষ্কার করতে পারে। সে জন্য কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো মানুষের অত্যন্ত তুচ্ছ চালচলন বা আচরণের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। 'এসব তুচ্ছ ঘটনা—অতএব যেটুকু লক্ষ করছি তাই যথেষ্ট।'—এ রকম মনোভাব ডিটেকটিভের যোগ্য নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অত্যন্ত তুচ্ছ কারণ থেকে সাংঘাতিক সব কাণ্ড ঘটে থাকে।

কলকাতা শহরের জোড়াবাগান এলাকায় এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল। সে কয়েক বছর আগের কথা। টাকশালের [চার্চ লেন] কাছাকাছি

ধর্মতলা স্ট্রীটে এক কাপড়ের ব্যবসায়ী কারবার চালাত। তার বাসস্থানও ছিল সেটি। তার এই ব্যবসায়ের এক অংশীদার ছিল। একদিন লভ্যাংশের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে তার সঙ্গে বচসা হওয়াতে সে তাকে খুন করে। তারপর সে তার মৃতদেহটি তার রান্নাঘরের মেঝের নিচে পুঁতে রাখে। পরদিন হত্যাকারি সোজা থানায় গিয়ে জানায়, তার কারবারের অংশীদার অনেক টাকা নিয়ে রাতারাতি কোথায় সরে পড়েছে। টাকাটা তার নিজের নয়, কারবারের টাকা। তা ছাড়া অলঙ্কারপত্রও অনেক চুরি করেছে সে। তার একটিও তার নিজের সম্পত্তি নয়।

থানায় এজাহার লিখিয়ে তাতে সই করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে গ্রেফতার পরোয়ানার ব্যবস্থা করিয়ে সে মোটা রকমের একটি পুরস্কার ঘোষণা করল। যিনি সেই পলাতক অংশীদারকে ধরে দেবেন, তাঁকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হবে। মিস্টার গ্রেভস নামক এক ইনসপেক্টরের উপর ভার ছিল এই কেসটা তদন্ত করার। আমি তখন ছিলাম রিভার পুলিসের ইনসপেক্টার। জোড়াবাগান সেকশনের উত্তর বিভাগ ছিল আমার এলাকা। কাজেই রোঁদে বেরুলে আমাদের প্রায়ই দেখা হত। মাঝে মাঝে তাঁর থানাতে গিয়ে সন্ধ্যা কাটানোও ছিল আমার অভ্যাস। স্বভাবতই এরকম ক্ষেত্রে তাঁর অনেক কথা আমি জানতে পারতাম। একদিন জোড়াবাগান থানা থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি সেই কাপড়ের ব্যবসায়ীটি আমার বাড়িতে এসে বসে আছে। আমি তখন নদীর উপরে বাস করতাম। সে আমাকে কিছু বলতে চায়। অর্থাৎ আমার সঙ্গে সে তার কেস নিয়ে আলাপ করতে চায়।—'সার, আপনি গ্রেভস সাহেবের বন্ধু, তাই আপনার কাছে জানতে এলাম আমার সেই জোচ্চোর অংশীদারের কোনো পাত্তা মিলল কি না। তা ছাড়া এ বিষয়ে গ্রেভস সাহেবের মত কী? তিনি কি তাকে খোঁজার কাজে কিছুদূর এগিয়েছেন?'

তখন এসব কথা শুনে আমি কল্পনাও করি নি যে এই লোকটি আমার কাছ থেকে কৌশলে খবর সংগ্রহ করতে এসেছে। যখন বুঝতে পারলাম বিষয়টা আমার কাছে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই আমি তার কথার জবাবে বললাম, 'মিস্টার গ্রেভস তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞ অফিসার, তোমার কোনো চিন্তা নেই। তিনি তাকে জীবিত হোক, মৃত হোক ঠিক খুঁজে বার করবেন। আর তা করতে খুব বেশিদিন লাগবে না।'

মনে হল যেন আমার একথায় লোকটা একটুখানি চমকে উঠল। 'জীবিত বা মৃত', কথাটা মনে রাখলাম। এরপর আরও দু-চারটে বাজে কথার পর লোকটা বিদায় নিল।

পরদিন সন্ধ্যায় জোড়াবাগান থানায় গিয়ে শুনলাম ঐ লোকটি সকাল বেলা মিস্টার গ্রেভস-এর কাছে এসেছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল তার উদ্দেশ্য মিস্টার গ্রেভস-এর উপর একটা উপর-চাল মেরে তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু খবর সংগ্রহ করা। শুনলাম, সে তার সঙ্গে এক থলে-ভরতি টাকা এনেছিল। সে টাকা মিস্টার গ্রেভস-এর হাতে দিয়ে বলেছিল, 'আমার সেই আংশীদারকে ধরতে পারলে এটাকা পুলিসকে দেবেন।' কিন্তু মিস্টার গ্রেভস তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'পুরস্কার দেওয়ার সময় যথেষ্ট পাওয়া যাবে, এখনও তোমার লোককে গ্রেফতার করা হয়নি।' ব্যবসায়ীটি বলল, 'কিন্তু আমি শুনলাম তাকে কাশীধামে গ্রেফতার করা হয়েছে, এবং কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। তাই শুনেই তো আমি এই পুরস্কারের টাকাটা নিয়ে এলাম।'

মিস্টার গ্রেভস বললেন, 'ও গুজব সত্যি নয়, টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

আমি যখন এই ঘটনা শুনলাম, তখনই আমার সঙ্গে ঐ লোকটার সাক্ষাৎকারের ঘটনার কথা মনে পড়ল। দুটিকে একত্রে মিলিযে দেখে আমার খুব সন্দেহ জাগল। বেশ বোঝা গেল কেসটি মোটেই সোজা নয়। ইনসপেক্টার গ্রেভসকে আমার সন্দেহের কথা খুলে বললাম। তারপর তাঁর দিকের কথার সঙ্গে আমার দিকের কথা সব তুলনা করে বিশ্লেষণ করে দেখালাম। ইনসক্টের গ্রেভস আমার সঙ্গে একমত হলেন।

আমাদের প্রথম কাজ হল ঐ বস্ত্রবণিককে ডাকিয়ে এনে তাকে জিজ্ঞাসা করা সে কাশীতে তার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে এখবর কোথায় শুনেছে। তাকে হাজির করা হল থানায়। সে এ প্রশ্ন শুনে তার উত্তরে বলল, সকালবেলা অক্ষয়বাবু নামে এক ভদ্রলোক তার দোকানে এসে বলেছেন, কাশীতে পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ কথা সত্যি কি না? তিনি একথা শুনেছেন প্রেমচাঁদবাবুর কাছ থেকে।

তখন প্রেমচাঁদকে হাজির করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল। সে বলল, সে কথাটা অভয়চরণের কাছ থেকে শুনেছে। অভয়চরণকে জেরা করে

জানা গেল সে শুনেছে এই বস্ত্রবণিকের কাছ থেকেই। আসলে এই গুজবটি রটানোর মূলে এই লোকটিই—যে লোকটি তার অংশীদারকে ধরার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার উদ্দেশ্য, সবাইকে ধোঁকা দেওয়া। থানায় আসবার আগেই সে নিজে এই গুজব রটিয়ে এসেছে। থানায় এসেছে জানতে যে এ খবরটা পৌঁছেছে কি না। পৌঁছলে—এবং সে গুজব সত্য হোক মিথ্যা হোক, সে নিজে যে খবরের জন্য কত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ইনসপেক্টরের মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া।

নিরুদ্দিষ্ট লোকটিকে তার কর্মস্থলের আশেপাশের লোক শেষ কখন দেখেছে, এই সূত্র ধরে তদন্ত আরম্ভ করা হল। জানা গেল, দুই অংশীদার পূর্বদিন সন্ধ্যায় খুব ঝগড়া করেছে। নিরুদ্দিষ্ট লোকটিও ঐ বাড়িতেই থাকত। এ সব শুনে, এবং বস্ত্রবণিকের অস্বাভাবিক ব্যবহারের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মনে দারুণ এক সন্দেহের ছায়াপাত হয়। মিস্টার গ্রেভস-এরও মনেও ঐ একই সন্দেহ জাগে যে ঐ লোকটি সত্য এজাহার দেয় নি, তার অংশীদার পালিয়েও যায় নি, তার ভাগ্যে অন্য কিছু জুটেছে। এর পরের কাজ হল ঐ বণিকের বাড়ি সার্চ করা। কিন্তু এ ব্যাপারে একটু অসুবিধা দেখা দিল। গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপিত করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে সার্চ ওয়ারাণ্ট বার করতে হলে আইনসঙ্গত প্রমাণ কিছু দেখাতে হয়। কিন্তু এই লোকটি সম্পর্কে সে প্রমাণ কোথায়?

আমরা এই অসুবিধার কথা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় মিস্টার গ্রেভস-এর একটা কথা মনে পড়ল। এর কয়েক সপ্তাহ আগে এই লোকটার বিরুদ্ধে একটি লোক এই মর্মে থানায় অভিযোগ করেছিল যে, এরা দুই অংশীদারে মিলে বেআইনিভাবে আফিঙের ব্যবসা চালায়। এই ব্যাপারে তাদের বাড়ি সার্চ করবার জন্য যে দিনটি ধার্য করা হয়েছিল, সে দিন ঐ অভিযোগকারী লোকটি আর আসে নি, তাই কাজটি স্থগিত আছে। কাজেই আমাদের এখনকার কাজ হল ঐ অভিযোগকারীকে খুঁজে বার করা, যাতে আমরা এক ঢিলে দুটি পাখি মারতে পারি। গ্রেভস তো খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ঘণ্টাদুই পরে একজন ভারতীয় অফিসার সেই ইনফরমারকে খুঁজে বার করে আনলেন। আমরা ঐ বণিকের বাড়িতে গিয়ে বললাম, আমরা এখানে চোরাই আফিঙ-এর সন্ধানে এসেছি। ভিতরে গিয়ে মিস্টার গ্রেভস তাঁর হাতের একটি ধারালো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ঠুকে

ঠুকে মেঝে পরীক্ষা করতে লাগলেন। উঠোনের উপরেও তেমনি ঠুকতে লাগলেন। তিনি সবসময়েই বাড়ির মালিককে এই কথা বোঝাচ্ছিলেন যে আমরা শুধু লুকিয়ে রাখা আফিঙের সন্ধান করছি। এর পর রান্নাঘরে ঢোকা হল। সেখানে ঐ ধারালো ডাণ্ডা দিয়ে মেঝেতে চাপ দিতেই অনায়াসে সেটি প্রায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত ভিতরে ঢুকে গেল। গ্রেভস উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আ! এখানে যে আফিঙ ছাড়া অন্য আর একটা কিছুর গন্ধ পাচ্ছি!'—

ডাণ্ডাটি তোলামাত্র সেখাম থেকে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে ঘর ভরে উঠল। সবাই সেখান থেকে সরে গেল সেই দুর্গন্ধে।

সবাই তখন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার উত্তেজনায় চঞ্চল। এই ফাঁকে বস্ত্রবণিক হঠাৎ সরে পড়বার চেষ্টা করতেই একটি কনস্টেবল তাকে ধরে ফেলল। তারপর এক কাণ্ড! লোকটি নিচে সটান শুয়ে পড়ে উঠোনের উপর ক্রমাগত মাথা ঠুকতে লাগল। তাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে দুজন লোকের দরকার হল। তারপর একটি কোদাল জোগাড় করে হতভাগ্য লোকটির মৃতদেহ বাইরে টেনে তোলা হল। আর এই মৃতব্যক্তির বিরুদ্ধেই কিনা মিথ্যা ওয়ারেন্ট বার করা হয়েছিল!

দেহটির তখন পচন আরম্ভ হয়ে গেছে। দেখে চেনা যায় না। চেনবার একমাত্র চিহ্ন তার কাপড়চোপড়, হাতের আংটি ও রূপার কোমরচেন। দেহটিকে মাটিতে পোঁতার আগে এসব আর খুলে নেবার অবসর ঘটে নি হত্যাকারীর।

সে এর পর আর হত্যা অস্বীকার করতে পারল না। হাইকোর্টে তার বিচার হয়েছিল, হত্যার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল, এবং এর জন্য যথাযোগ্য যে শাস্তি, অর্থাৎ চরম দণ্ড, তা সে পেয়েছিল।

মাশুল এড়িয়ে নুনের কারবার

কলকাতা বন্দরের মধ্যবিভাগের ভার সবে পেয়েছি, এমনি সময়ে এক দিন রোঁদে বেরিয়ে কয়েকটি ঘটনা নজরে পড়ল করলাম। দেখলাম, একখানা নুন বোঝাই দেশী বড় নৌকা আরমেনিয়ান ঘাট ও টাকশালের মাঝামাঝি একটি নির্জন খালে প্রবেশ করল। সেইখানে একটা নৌকা, মনে

হল, এই নৌকাখানার জন্মই অপেক্ষা করছিল। দুখানা নৌকা কাছাকাছি আসতেই নৌকা দুখানার মাঝিমাল্লাদের পরস্পর বদল ঘটল। এ নৌকার লোকেরা ও নৌকায় গেল, ও নৌকার লোকেরা এ নৌকায় এল। নুন বোঝাই নৌকাখানা ঘাট ছেড়ে চলে গেল উত্তর দিকে, আর খালি নৌকাখানা খাল থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে হাওড়ার দিকে চলল।

আমার সন্দেহ হল ভাবতে লাগলাম, "ব্যাপারটা কী? নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে।"

আমার 'ভাউলে' (বাসের উপযোগী নৌকা) খানা ছেড়ে দিয়ে একখানা ছোট নৌকা নিয়ে ঐ খালি নৌকাখানা অনুসরণ করলাম, আর আমার জমাদারকে আর একখানা ছোট ডিঙ্গি-নৌকায় নুনের নৌকাখানার পিছু ধাওয়া করতে নির্দেশ দিলাম।

খালি নৌকাখানা নদীর ওপারে গিয়ে ভিড়ল। নৌকার লোকেরা ভিতর থেকে কিছু বাসনপত্র আর কাপড়চোপড় বার করে ডাঙায় এনে তুলল। একটি লোক একখানা লম্বা বাঁশের সাহায্যে জলের গভীরতা মেপে দেখল। তারপর সে ভিতরে গিয়ে নৌকার তলায় যে ফুটোটি বন্ধ করা ছিল, সেটি খুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। নৌকাখানা আস্তে আস্তে জলের নিচে তলিয়ে গেল। তার আগে অবশ্য মাঝিমাল্লারা ডাঙায় উঠে পড়েছিল। জলের উপরে নৌকার মাস্তুল ভিন্ন তখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তখন জোয়ারের সময়। নৌকা থেকে যে কটা জিনিস বাইরের লোককে ধাপ্পা দেবার জন্য ডাঙায় আনা হয়েছিল, মাঝিমাল্লারা তার পাশে বসে রইল। তারপর এক চাপরাশী (আসলে চারণদার, যার ঐ নুনের নৌকার পারমিট নিয়ে যাবার কথা) একখানি নৌকা ভাড়া করে চাঁদপাল ঘাটের দিকে রওনা হল। আধ ঘণ্টা পরে লোকটি নুনের চৌকি-দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল সেখানে। দারোগা ডুবে-যাওয়া নৌকার বিষয়ে ওদের জবানবন্দি লিখে নিতে লাগল। এইবার ওদের কাছে গিয়ে সব ব্যাপারটা দেখবার সময় এসে গেছে আমার, আর দেরী নয়। গিয়ে দেখি, নৌকার মাঝিরা দারোগার কাছে সজল চোখে বিলাপ করতে করতে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা বলে যাচ্ছে। তাদের কতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল, তা যেন বলবার ভাষা নেই তাদের। একজনের অনেক টাকা দামের গয়নাসুদ্ধ একটা বাক্স ছিল নৌকায়। আর একজনের কাপড়জামা আর টাকা ছিল, কিছুই উদ্ধার

করতে পারে নি। সব নৌকার সঙ্গে অতলে তলিয়ে গেছে। কেউ কেউ এই দুর্ঘটনায় একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছে।

আমি দারোগাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দুর্ঘটনাটা ঘটল কি ভাবে?'

দারোগা বলল, চারণদার বলছে, ঐ নৌকায় ২০০০ মন লিভারপুলের নুন ছিল। এই নুন ইংরেজদের 'এবলানা' নামক জাহাজ থেকে নামানো হয়েছে। জাহাজখানা ফোর্ট উইলিয়ামের কাছাকাছি নোঙর করা আছে। তারপর উজান পথে আসতে, আজ দুপুরের জোয়ারের জলোচ্ছাস। সে কি ভীষণ জলোচ্ছাস, সহজে এমন দেখা যায় না! আর তার ফলে নৌকাখানা সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল। নুন ছিল হাটখোলার এক বড মহাজনের। এ ক্ষতি তাঁর হয় তো সহ্য হবে, তাছাড়া তিনি এর দরুন যে মাশুল দেওয়া হয়েছে তাও ফেরত পাবেন। তাই তাঁর লোকসান এমন কি-ই বা। আবার জোয়ার চলে গেলে নৌকাখানাও উদ্ধার করা যাবে, কিন্তু এই গরিব লোকগুলোর যে সবই গেল।'

আমি দারোগার সঙ্গে সুব মিলিয়ে বললাম, 'সত্যিই তো, লোকগুলোর বডই ক্ষতি হল।' কিন্তু আমার মনের কথা আর প্রকাশ করলাম না। এর পর কী ঘটে দেখবার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। দারোগার জবানবন্দি লেখা হল। ঐ তথাকথিত দুর্ঘটনার জায়গাতে বসেই তার তদন্তের কাজ শেষ হয়ে গেল। সে ঐ চারণদার আর মাঝিদের নিয়ে 'এবলানা' জাহাজের দিকে এবারে রওনা হয়ে যাবে। তার উদ্দেশ্য, শুল্কবিভাগের অফিসারদের দিয়ে এদের সনাক্তকরণ। তা ছাড়া ওরা যা যা বলছে তা সত্য কিনা যাচাই করা। ওদের জবানবন্দিতে আছে, বেলা ১১টার সময় ওরা ঐ জাহাজ থেকে ২০০০ মন নুন নৌকায় তুলেছে। আর এর জন্য তাদের পারমিট আছে।

আমি প্রস্তাব করলাম, সবাই আমার সঙ্গে চলুক। দারোগা এ প্রস্তাবে খুশিই হল, কারণ আমার নৌকাখানার বহনব্যবস্থা ছিল ভাল। যাবার পথে দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার নাম এ ঘটনার সাক্ষী হিসাবে খাতায় লেখা হলে কি আমার আপত্তি হবে?

আমি বললাম, 'কেন হবে? আমি যা দেখেছি তা নিশ্চয় বলব।'

দারোগা বলল, 'এইটুকুই আমার প্রার্থনা ছিল।'—কথাটা সে সরলভাবেই বলল। এই দুর্ঘটনার পিছনে যে চাতুরি আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহেরই উদয় হয় নি। তাই দারোগা বলতে লাগল, 'যখন কোনো ইউরোপীয় ভদ্রলোক

এ রকম দুর্ঘটনার ব্যাপারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাক্ষী হতে চান, তখন নুনের মালিকের পক্ষে লোকসানের পরিমাণ হিসাবে শুল্ক ফেরত পেতে আর কোনো বেগ পেতে হয় না। তবে একটা কথা—বোর্ড অব রেভনিউ কিন্তু নুনের নৌকা যে আজকাল প্রায়ই ডুবে যাচ্ছে—এ ব্যাপারটাকে এখন একটু সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন।'

আমি মন্তব্য করলাম, 'সত্যিই যদি নৌকাডুবিতে মহাজনের ক্ষতি হয় তা হলে তাঁর শুল্ক নিশ্চয়ই ফেরত পাওয়া উচিত। বোর্ড অব রেভনিউ-এর কোনো দ্বিধা করাই উচিত নয়। নুনের মহাজনের প্রতি অবশ্যই এটি সুবিচার। কোনো ছলনা বা প্রতারণা বিষয়ে সতর্ক থাকলে, সত্য দুর্ঘটনার দরুন মাশুল ফেরত দিলেও এ থেকে কোনো ক্ষতির কারণ ঘটে না।'

দারোগা বলল, "এই দুর্ঘটনার কেসটিতে যে কোনো প্রতারণা ঘটে নি, এ কথা আপনিও স্বীকার করবেন, তাই না? আর যদি 'এবলানা'র শুল্ক-বিভাগের অফিসাররা চারণদার আর মাঝিদের সনাক্ত করেন, তা হলে মহাজনের দাবী অবশ্যই পূরণ করা হবে। কারণ তখন আর তো সন্দেহের অবকাশ রইল না।'

দারোগার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত হলাম। 'এবলানা' জাহাজে পৌছনোর আগে পর্যন্ত আর আমাদের এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হল না। সেখানে পৌছনোর পর যখন নিমজ্জিত নৌকার চারণদার ও মাঝি-মাল্লাদের 'এবলানা'র ডেকের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল, তখন জাহাজের প্রত্যেকটি অফিসার তাদের সনাক্ত করলেন। জাহাজের খালাসিরাও সনাক্ত করল যে, যে-নৌকা 'এবলানা' থেকে বেলা ১১টার সময় ২০০১ মন নুন নিয়ে জাহাজের পাশ থেকে রওনা হয়েছে, এরা সেই নৌকারই লোক।

তদন্ত এইখানেই শেষ হয়ে গেল। দারোগা আর অন্যান্য লোকেরা ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমি যখন আমার থানায় ফিরলাম তখন দেখি—সেই যে লোকটিকে নুনবোঝাই নৌকার পিছনে পাঠিয়েছিলাম সে ফিরে এসেছে। সে যা বলল তা এই—সে ঐ নৌকাটাকে অনুসরণ করে হাট-খোলা পর্যন্ত যায়। সেইখানে নুনের গোলার বিপরীত দিকে গিয়ে ভেড়ে। এই নুনের গোলার মালিকের নামও সে আমাকে জানাল। নৌকাখানা

তীরে লাগানোমাত্র নৌকা থেকে মুনের বস্তা ঐ মহাজনের গুদামে তোলা হতে লাগল। বহু কুলি নিযুক্ত হল এ কাজে।

এই সংবাদটার অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি। আমি মনে মনে যেভাবে কেসটি সাজিয়েছি, এই সংবাদে তার অতিরিক্ত সমর্থন পাওয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার রিপোর্ট তৈরি করে আমার উপরের অফিসারকে দিলাম।

যথাসময়ে এই রিপোর্ট বোর্ড অব রেভনিউএর হাতে গেল। এই ঘটনার এক মাসের কম সময়ের মধ্যেই লবণ চৌকি প্রথা রহিত হয়ে তার বদলে বর্তমানের রিভার পুলিস প্রথার প্রচলন হল।

ডিটেকটিভের বিদ্যা যারা শিখতে চায় তারা এই কেসটা থেকে অনেকগুলি নির্দেশ পেতে পারে। পর্যবেক্ষণ, সন্দেহভাজন ব্যক্তি কী করে তার যথাযথ হিসাব রাখা, তাদের সমস্ত আচরণ এবং চালচলন লক্ষ করা দরকার। আরও একটা জিনিস লক্ষ করবার এই যে, কত সহজে ভুল অনুমান খাড়া করা যায়। তখন মনে হয় এটাই একমাত্র সত্য অনুমান। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যতই তদন্তে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই সেই মিথ্যা অনুমান সমর্থিত হয়ে থাকে। এই কেসটিতে দারোগা ঠিক এই ভাবেই আরম্ভ থেকেই ভুল অনুমান করেছিল।

ডাকঘর সংক্রান্ত প্রতারণা

হাওড়াবাসী এক ইহুদী ট্রাঙ্ক তৈরি করত। আমার এক বান্ধবী বিলেতে ফিরে যাবে। তার একটি পোর্টম্যাণ্টো দরকার ছিল, সেই জন্য সেখানে গিয়েছিলাম।

দোকানে ঢুকে দেখতে পেলাম বৃদ্ধ ইহুদী খুব নিবিষ্টমনে একটি টিনের লাইনিং দেওয়া প্যাকিং বাক্স খুলছে। আমার সাড়া পেয়ে সে হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল। চেয়ারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা কোটটি আধখোলা কেসটির উপর ফেলে দিল। সে আমাকে ঐ বাক্সে কি আছে তা দেখাতে চায় না। আমিও এমন ভান করলাম যেন ব্যাপারটি আমার নজরেই আসে নি। আমি তাড়াতাড়ি পোর্টম্যাণ্টো বাছাইয়ের দিকে মন দিলাম। ইহুদীটিও নিজেকে কিছু পরিমাণ সামলে নিতে সময় পেল। একটি বাক্স বাছাই করে তার দাম জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধ মৃদু হেসে অতি

বিনীত সুরে বলল, 'মিস্টার রীড—হেঁ হেঁ—আপনি নেবেন যখন তখন আর বেশি কি চাইব, আমাকে আপনি ষোল টাকা দেবেন।' আমি মনে মনে হাসলাম। দেখলাম বাজার দর থেকে অনেক কমিয়ে বলেছে দাম। আমি ষোল টাকা দিয়ে বাক্সটি কিনলাম, কোনো মন্তব্যই করলাম না।

একটি লোক ডেকে বাক্সটি আমার গাড়ির উপর চাপিয়ে চলে এলাম সেখান থেকে। সমস্ত ব্যাপারটা গাড়িতে বসেই আমার নোটবুকে যা যা ঘটেছে সব লিখে রাখলাম। এর পর আর এ সম্পর্কে কিছু চিন্তা করি নি এরপর মাস দুই কেটে গেছে এমন সময় আমার হাতে এক অদ্ভুত রহস্যময় কেস তদন্তের ভার এল। আমাকে সব তদন্ত করে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই—ডাক-বিভাগের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে বর্তমান ত্রৈমাসিক স্ট্যাম্প বিক্রি আগের বছরের ত্রৈমাসিক বিক্রির তুলনায় খুব বেশি-পরিমাণে কমে গেছে। অথচ দেখা যায় চিঠিপত্র, পার্সেল ইত্যাদির সংখ্যা আগের তুলনায় কিছুই কমে নি। এর কারণ অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়েছে আমার উপর।

আমার তখন প্রথম কাজ হল কলেকটর মিঃ ম্যাকেনজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছ থেকে প্রধান প্রধান স্ট্যাম্প ভেণ্ডরদের তালিকা নেওয়া। এ তালিকা কলকাতা ও শহরতলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলাম। জানলাম, বিশেষ করে দু'জন স্ট্যাম্প ভেণ্ডর প্রতি বছর দৈনিক তিন শত টাকার স্ট্যাম্প বিক্রি করত, তারা হঠাৎ স্ট্যাম্প কেনা খুব কমিয়ে দিয়েছে। তারা দুজনেই দৈনিক এখন মাত্র পঞ্চাশ টাকা পরিমাণ কিনছে। আমি এদের দুজনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করলাম। এই সময়ে আমার অধীন একজন বেশ চটপটে ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ইউরোপীয় কনস্টেবল ছিল। তার ভার ছিল গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেল পাহারা দেওয়া। সৌভাগ্যবশত ঐ দু'জন স্ট্যাম্প ভেণ্ডরের একজনের দোকান ছিল আবার ঠিক ঐ হোটেলের উল্টো দিকেই। কাজেই তার চলাফেরার উপর নজর রাখার কাজটা সহজ হল। সে সন্দেহও করবে না যে তাকে কেউ নজরে রাখছে।

কনস্টেবলকে কি কি করতে হবে সে বিষয়ে যথাযোগ্য নির্দেশাদি দিয়ে আমি কাজে বেরিয়ে গেলাম। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা আমার কাছে এসে সেদিনের নজরদারির রিপোর্ট আমার কাছে সে পেশ

করল: সকাল ১০টায় ঐ স্ট্যাম্প ভেণ্ডার দোকান খোলে এবং ৫-৩০ সময় দোকান বন্ধ করে। কিন্তু বন্ধ করবার আগে সে খুচরো সমস্ত পয়সা একটি ব্যাগে বন্ধ করে সোজা লালবাজারে অবস্থিত এক পোদ্দারের কাছে নিয়ে কারেন্সি নোটে পরিণত করে। তারপর একখানা ঠিকাগাড়িতে করে হাওড়ার দিকে যায়। কনস্টেবল তাকে অনুসরণ করে আর-একখানা ঠিকা গাড়িতে। স্ট্যাম্প ভেণ্ডরের গাড়ি আমার সেই পরিচিত ইহুদীর দোকানের সামনে গিয়ে থামে। ইহুদি বেরিয়ে এসে তাকে দুচারটি কথা বলে, এবং দুজনেই দোকানে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পরে ভেণ্ডরটি বেরিয়ে এসে পুনরায় সেই গাড়িটিতে উঠে চলে আসে তার চিৎপুর রোডের বাড়িতে। কনস্টেবল এবারেও তাকে অনুসরণ করে। তারপর যখন সে বুঝতে পারে ভেণ্ডরটি এবারে সকল কাজের শেষে এখন বাড়িতেই বিশ্রাম নেবে, তখন সে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এসেছে।

এই সব খবর শুনে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সব বিষয়টা চিন্তা করতে লাগলাম। একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে কোনো একটা কিছু খাড়া করা যায় কি না সেটাই এখন হল আমার উদ্দেশ্য। তখন হঠাৎ মনে পড়ল, ঐ একই ইহুদীর কাছে তো আমিও গিয়েছিলাম। মনে পড়তেই আমার নোটবইখানা খুলে দেখতে লাগলাম কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না। একবার দুবার তিনবার—এইভাবে অন্তত ছ'বার পড়লাম আমার সেদিনের নোটকরা কথাগুলো। এও কি সম্ভব যে ঐ বুড়ো ইহুদী এই স্ট্যাম্প ভেণ্ডরকে লোভ দেখিয়ে নিজেই তার কাছে স্ট্যাম্প বিক্রি করছে? ঠিক ঠিক, এখন মনে পড়ছে, আমি তার দোকানে যেতে যে আধ-খোলা বাক্সটি সে কোট দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল, সেই বাক্সের সঙ্গে স্ট্যাম্প রহস্যের নিশ্চয় যোগাযোগ আছে। আমার অনুমান সব ঘটনাটির সঙ্গেই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। কোথাও ফাঁক নেই। ঐ রকম বাক্সেই বিলেত থেকে স্ট্যাম্প ও স্ট্যাম্পের কাগজ আসে। তবে ইহুদীর কাছে যে বাক্সটি দেখেছি তাতে জলে ভেজার দাগ ছিল। সেইটুকুই শুধু ব্যতিক্রম। আর সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ বাক্সে যদি স্ট্যাম্পই থাকবে, তবে তা ঐ লোকটার হাতে এল কী করে? তা ছাড়া স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট-এর কাছ থেকে সম্প্রতি বা অতীতে স্ট্যাম্প হারিয়ে যাওয়া অথবা চুরি যাওয়ার কোনো রিপোর্টই তো আমি পাই নি।

আর সুপারিনটেনডেন্ট জে. বি. রবার্টস এমন মানুষই নন যিনি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তা চেপে যাবেন।

আমি বসে বসে এই সব সমস্যার সমাধান খুঁজছি এমন সময় আমাকে অবাক করে আমার কাছে স্বয়ং স্ট্যাম্প ভেণ্ডর এসে হাজির। সে তখন বেশ একটু উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। সেই স্ট্যাম্প ভেণ্ডর—যাকে আমি পুলিসের নজরে রেখেছিলাম।

ওকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হল, লোকটা সব টের পেয়ে আমার কাছে তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় পুলিস বাধা সৃষ্টি করছে এই মর্মে অভিযোগ জানাতে এসেছে। কিন্তু না। সে যা বলতে এসেছে তা শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। অর্থাৎ সে যে পুলিসের সন্দেহভাজন তা সে টের পায় নি। সে এখন এসেছে অন্য অভিযোগ নিয়ে। এক ঠিকাগাড়ির চালক তার হিসাবের খাতা আর অনেকগুলি ডাকঘরের আর দলিলের স্ট্যাম্প নিয়ে পালিয়ে গেছে।

সে ঐ ঠিকাগাড়িতে হাওড়া থেকে তার চিৎপুরের বাড়িতে এসে নেমে বাড়ির ভিতরে গেছে হিসাবের খাতাপত্র আর ঐ সব স্ট্যাম্প গাড়িতে রেখে। বলা হয়েছিল চাকর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে তার জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু চাকর এসে দেখল দুটি বাবু কোত্থেকে ছুটে এসে গাড়ির ভিতর উঠে বসল এবং কোচম্যানকে বলল, ছুটে চল হাওড়া স্টেশনে, ডবল ভাড়া পাবে। গাড়িও তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে গেল। চাকর ভাড়াও দিতে পারল না, গাড়ির ভিতরের জিনিসপত্রও নিতে পারল না। এ কথা শোনামাত্র সে ছুটে এসেছে থানায়।

আমি নানারকম কৌশল খাটিয়ে স্ট্যাম্প ভেণ্ডরের কাছ থেকে, কি করে সে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেছে তা জেনে নিয়ে, ঐ পলাতক কোচম্যানের সন্ধানে লাগব মনস্থ করলাম। কারণ এখন ঐ স্ট্যাম্পের বিষয় তথ্য সংগ্রহে আমার নিজের আগ্রহ ঐ ভেণ্ডরের চেয়েও বেশি। ভেণ্ডরকে সঙ্গে নিয়ে তার চিৎপুর রোড়ের বাড়িতে গেলাম। পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে দেখি কোচম্যানটি সেখানেই ফিরে এসেছে। কিন্তু গাড়ির ভিতর অনুসন্ধান করে শুধু হিসাবের খাতাপত্র পাওয়া গেল, স্ট্যাম্প একটিও নেই।

কোচম্যানকে জেরা করে জানা গেল, সে দুটি বাবুকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে। বাবু দুটি স্টেশনে পৌঁছে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে স্টেশন প্ল্যাট-

ফর্মের দিকে গেছে এইটুকু সে জানে। সে তখুনি গাড়ি নিয়ে ছুটে এসেছে চিৎপুর রোডে ভেণ্ডরবাবুর কাছ থেকে ভাড়া নিতে। স্ট্যাম্প ভেণ্ডর ও আমি তৎক্ষণাৎ ঐ গাড়িতে উঠে হাওড়া স্টেশনের দিকে ছুটে চললাম। কিন্তু সেখানে কোনো বাবুর দেখা পাওয়া গেল না, স্ট্যাম্পেরও সন্ধান মিলল না। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে তদন্ত চলছিল, এমন সময় কে যেন হাওড়ার সেই ইহুদীকে খবর দিয়েছে স্ট্যাম্প ভেণ্ডরকে মিস্টার রীড গ্রেফতার করেছেন। স্ট্যাম্প নিয়ে ভীষণ গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেছে।

এ কথা শুনে ঐ ইহুদী ভীষণ ভয় পেয়ে তার কাছে যত স্ট্যাম্প ছিল সব পুড়িয়ে ফেলল। পরদিন সকালে উকিলের বাড়ি গেল জানতে যে, যদি স্ট্যাম্প ভেণ্ডর যে স্ট্যাম্প বিক্রি করেছে তা তার কাছ থেকে পাওয়া যায় তা হলে এ বিষয়ে তার দায়িত্ব কতখানি। সে এখন গা ঢাকা দেবে, না আত্মপক্ষ সমর্থন করবে।

উকিল আগাগোড়া সব কাহিনী শুনে বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই। ঐ স্ট্যাম্প বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে আইন কিছুই করতে পারবে না। স্ট্যাম্প সংগ্রহ তোমার পক্ষে মোটেই বেআইনি হয় নি। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এই কথা যেমনি শোনা, তেমনি, ইহুদীটি 'হা ভগবান। হা ভগবান।' বলে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি ভয় পেয়ে সব স্ট্যাম্প যে পুড়িয়ে ফেললাম। আমি যত ডাকঘরের আর দলিলের স্ট্যাম্প এডেন বন্দরে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কিনেছি, সব পুড়িয়েছি। এখন আমি কী করব? আমি যে ধনেপ্রাণে গেলাম। হায় হায়। কেন আমি পোড়ানোর আগে আপনার পরামর্শ নিতে আসি নি।'

বৃদ্ধ ইহুদী উন্মাদের মত বিলাপ করতে করতে চলে গেল। এর পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি হাজির হলাম তার দোকানে। গিয়ে তার চোখমুখের যে ভাব দেখলাম তা বর্ণনা করবার ভাষা নেই। সে যখন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে তখন তার মুখে যে বেদনার ছাপ দেখেছিলাম, তা আমি কোনোদিন ভুলব না। আমাকে দেখে সে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর কোনো রকমে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি পোর্টম্যাণ্টো কিনতে এসেছি? আমি উত্তরে বললাম, 'না, আজ আমি অন্য উদ্দেশ্যে এসেছি।'

'মিস্টার রীড, আপনি চতুর লোক। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কেন এসেছেন।'

'শুনে খুশি হলাম মিস্টার সি—, তুমি যে আগেই সব বুঝতে পেরেছ এতে সুবিধে হল।'

'ঠিক কথা, মিস্টার রীড—খুব খাঁটি কথা, আপনি স্ট্যাম্প সম্পর্কে তদন্তে এসেছেন, তাই না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি।

'তা হলে বসুন, মিস্টার রীড'—বলতে বলতে বৃদ্ধ আমাকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল।—'আমি সবই আপনাকে বলব। স্ট্যাম্প আমার হাতে কি করে এল তা সবই খুলে বলছি।'

আমি চেয়ারে বসলাম। বৃদ্ধ তার কাহিনী বলতে শুরু করল।

'আপনার নিশ্চয় মনে আছে মিস্টার রীড, কয়েক বছর আগে 'দেওলালি' নামক জাহাজখানা লোহিত সাগরে ডুবে গিয়েছিল?'

আমি বললাম, 'মনে আছে।'

বৃদ্ধ বলতে লাগল, 'ডোববার সময় সে জাহাজে সাধারণ মালপত্র ছাড়াও অনেক ধনসম্পত্তি আর ডাকঘরের ও দলিলের স্ট্যাম্প-কাগজ ছিল প্রচুর। এ সবই ভারতবর্ষের জন্য আসছিল ইংল্যাণ্ড থেকে। বছরখানেক হল বহুসংখ্যক ডুবুরি পাঠানো হয় জাহাজডুবির জায়গায়—ঐ সব সম্পত্তি উদ্ধার করতে। তারা জাহাজের খোল থেকে ধনসম্পত্তি অনেক কিছুই উদ্ধার করে সেগুলো নৌকায় করে তীরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সমুদ্রের তীরেই সে সব পড়ে ছিল কয়েক মাস ধরে। তারপর সেগুলোকে প্রকাশ্যে নিলাম করা হয়। আমিই তখন সে সব কিনেছিলাম। যে সব মাল সমুদ্রের নিচে তিন বছর পড়ে ছিল, সেই সব মাল বিনা পরীক্ষায় নিলামে কেনার জন্য সে সময় আমার নির্বুদ্ধিতায় অনেকে ঠাট্টা করেছিল। কেনবার কিছুদিন পরে আমি দেখলাম দামী জিনিসই পেয়েছি—অর্থাৎ এই স্ট্যাম্পগুলো। মাশুল বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত স্ট্যাম্পের কেসগুলো বিলেত থেকে 'স্টেশনারি' নামে চালান দেওয়া হয়েছিল। সবগুলো কেসের ভিতরেই টিনের আস্তর দেওয়া ছিল। সেজন্য অধিকাংশ কেসই অক্ষত অবস্থায় পেয়েছিলাম। মাত্র কয়েকটির টিনের আস্তর খারাপ হয়ে গিয়ে তাতে নোনা জল ঢুকে স্ট্যাম্পগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি সেগুলো নিয়ে এডেনের ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে

দেখাই। এবং তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাই। যে কেসগুলো ভাল ছিল সে সবই আমি কলকাতায় নিয়ে আসি তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে পারব আশায়। আমি প্রায় সফল হয়ে এসেছিলাম, এমন সময় কাল সন্ধ্যায় আমি খবর পেলাম আমার এক খদ্দের ভেণ্ডরকে আপনি গ্রেফতার করেছেন। ভয় হল, এর পরই হয় তো আমার পালা আসবে। তাই আমি কাল সমস্ত স্ট্যাম্প নষ্ট করে ফেলেছি। আজ সকালে আমি এক আইনজীবীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমি কোনো বেআইনি কাজ করি নি। আমি প্রকাশ্য নিলামে কিনেছি, অতএব তা আমার সম্পত্তি, আমি তা নিয়ে স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছে তা করতে পারি।'

ইহুদীর কাহিনী শেষ হলে আমি তাকে বললাম, 'তোমার খদ্দের ভেণ্ডরকে আমি গ্রেফতার করেছি এ খবর একেবারে মিথ্যা। আমি বরং তার স্ট্যাম্প যে চুরি করেছে তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি ঐ ভেণ্ডরকেই সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।"

ইহুদী আমার কথা শুনে উন্মাদের মত চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে "হায় ভগবান! হায় ভগবান! আমি একটি গাধা" বলে চিৎকার করে বিলাপ করতে লাগল।

আমি তাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করে বললাম, 'তুমি নির্বোধের কাজ কর নি। কারণ স্ট্যাম্প উদ্ধার করতে পারলে তোমাকে বিনা লাইসেন্সে স্ট্যাম্প বিক্রির দায়ে ধরতাম।'

ইহুদী এ কথা শুনে অনেকখানি সংযত হল। একটুক্ষণ চিন্তা করে আমাকে বলল, 'যে নিলামদার ওগুলো এডেনে নিলাম করেছিল, তার কোনো লাইসেন্স ছিল না।'

"ঠিক কথা মিস্টার সি—কিন্তু সে যে স্ট্যাম্প বিক্রি করছে এটা তার জানা ছিল না। কিন্তু তোমার জানা ছিল। আইনের চোখে ঐখানেই যে অনেকখানি তফাৎ হয়ে গেল দুজনের কাজে। আর এক কথা, আমি হয় তো তোমার ঐ স্ট্যাম্প বাজেয়াপ্ত করতে পারতাম না। কিন্তু বিনা লাইসেন্সে বিক্রির কাজে আমি হয় তো—আর হয় তো কেন, অবশ্যই তোমাকে বাধা দিতাম। এখন সব দিক ভেবে দেখ, তুমি যতটা ভাবছ ততটা ক্ষতি তোমার হয় নি।'

এর পর কী হল তা অনুক্ত রইল। কারণ এর সঙ্গে এত সব আনুসঙ্গিক

আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে যে, তা প্রকাশ করার আমার ইচ্ছা নেই। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির আর্ট যারা শিখতে চায়, তাদের কাছে অবশ্যই 'পর্যবেক্ষণ'-এর মূল্য এতক্ষণে যথেষ্ট উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই এ ঘটনাটা এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করলাম।

সিপাহী বিদ্রোহের পটে একটি ছোট্ট কাহিনী

জেনারেল পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম একটি কাজে। রেজিস্ট্রেশন বিভাগের হেডক্লার্কের সঙ্গে আলাপ করছিলাম সেখানে। এমন সময় এক মহিলা এলেন একখানা চিঠি রেজিস্ট্রির উদ্দেশ্যে। এলেন বটে, কিন্তু বিব্রত হয়ে পড়লেন আমাকে দেখে। তাঁর মুখচোখের ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল আমার উপস্থিতিটা তাঁর পক্ষে খুব প্রীতিকর হয় নি। চিঠিখানা তিনি আমার সামনে বার করবেন কিনা সে বিষয়ে যেন দ্বিধাগ্রস্ত। আমি তাঁকে এই অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতে কিছুক্ষণের জন্য সেখান থেকে সরে গেলাম এবং তাঁর কাজ শেষ হলেই ফিরে এলাম। তাঁর উদ্বেগ আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছিল বলা বাহুল্য। আমি হেডক্লার্কের কাছ থেকে চিঠি-খানা চেয়ে নিয়ে প্রাপকের ঠিকানাটা নোট করে নিলাম আমার বইতে।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে এলাহাবাদের আদালতে এক বন্দীর বিচার হচ্ছিল। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং হত্যা লুণ্ঠনাদি নানা অপরাধের। এ সবই বিদ্রোহ উপলক্ষে। বিচারের সময় আসামীপক্ষের উকিল প্রকাশ্য আদালতে এমন কথা বলেছেন যে, আদালতের কাঠগড়ায় সাক্ষী হিসেবে একজন ইউরোপীয় মহিলাকে হাজির করাবেন। মহিলা এই মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, কানপুরে ব্যাপক হত্যা-কাণ্ডের সময় তাঁর মক্কেল ঐ মহিলাকে একদল বিদ্রোহীর হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখেন। সুযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্র তাঁকে ইংরেজদের ক্যাম্পে রেখে আসেন। তিনি একখানা চিঠি দেখিয়ে আরও বলছেন যে, "এই যে আমার হাতে কলকাতার ডাকঘরের ছাপমারা রেজিস্টার্ড চিঠিখানা দেখছেন, এই চিঠি ঐ মহিলার লেখা। তিনি এই চিঠিতে আসামীর পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাক্ষ্য দেবেন বলে এখানে আসবেন জানিয়েছেন। চিঠিখানা আমি আজ সকালের ডাকে পেয়েছি।"

ঐ মহিলার নাম তিনি প্রকাশ করলেন না, কিন্তু তাঁর এই ঘোষণাতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হল। একথা সত্য হলে সরকারী পক্ষের কেস যে খুবই দুর্বল হয়ে পড়বে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না।

সরকারী উকিল কালবিলম্ব না করে তৎকালীন পুলিস কমিশনার মিস্টার উয়াউচোপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। জানতে চাইলেন ঐ মহিলাটি কে এবং তিনি আসামীর পক্ষে কী ধরনের সাক্ষ্য দেবেন।

মিস্টার উয়াউচোপ বিষয়টির তদন্তের ভার আমার উপরে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি ঐ মহিলাকে খুঁজে বার করে তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারব?

আমি একটুখানি চিন্তা করে বললাম, "মহিলাটিকে খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে না। আমি তাঁকে চিনি। তিনি যে আসামীকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কিছু সত্য চেপে যাবেন, তাও জানি। যেমন ধরুন, তিনি যদি বলেন আসামী তাঁকে বিদ্রোহের ব্যাপক ইউরোপীয়-হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তা হলে তিনি সত্য কথাই বলবেন। কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর আরও বলা উচিত যে, কানপুরে তখন অন্যান্য ইউরোপীয়দের উপর যে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছিল, একজন ইউরোপীয় মহিলার পক্ষে তার চেয়েও জঘন্য ব্যাপারে রাজি হওয়াতেই তাঁকে হত্যা করা হয় নি। তাঁর জীবন রক্ষা করা হয়েছিল। এমন অবস্থায়, ঐ আসামী কানপুরে ও অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের বেপরোয়া হত্যার কাজে যে ভূমিকা নিয়েছিল, তা সত্ত্বেও তাকে বাঁচাবার জন্য ঐ মহিলা যদি তার সপক্ষে সাক্ষ্য দেন, তা হলে বুঝতে হবে তাঁর অন্য মতলব আছে। জীবনরক্ষকের প্রতি শুধুই কৃতজ্ঞতা নয়।"

মিস্টার উয়াউচোপ আমাকে কথার মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তাহলে আপনি বলতে চান ঐ মহিলাটির সাক্ষ্য যদি আসামীর সপক্ষে যায় তা হলে তিনি তার জন্যে যথেষ্ট টাকা পাবেন?"

আমি বললাম, "না, মহিলাটি বর্তমানে বিবাহিতা এবং ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করছেন। লজ্জা এবং শালীনতার খাতিরে তিনি সম্পূর্ণ সত্য এখন প্রকাশ করতে বাধা অনুভব করবেন। অর্থাৎ যেটুকু প্রকাশ করলে আসামীর প্রাণদণ্ড হতে পারে সেটুকু চেপে যাবেন। কারণ আসামী যে চরিত্রের লোক, তাতে তার অধীন বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে কোনো মহিলা যদি দীর্ঘ

দুটি মাস কাটিয়ে থাকেন, তবে তিনি কোন্ মুখে তা প্রকাশ্য আদালতে এসে স্বীকার করবেন? কোনো মহিলার পক্ষেই তা করা সম্ভব নয়। আসামী পক্ষের উকিলের এটি নিশ্চিত জানা উচিত। উক্ত মহিলা একথা জানেন যে এই লোকটি হস্তক্ষেপ না করলে তাঁকেও কানপুরের অন্যান্য ইউরোপীয়দের ভাগ্য বরণ করে নিতে হত, শুধু এই ঘটনা বিষয়েই সোজাসুজি জেরা করা হবে।"

পুলিশ কমিশনার কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, "সমস্ত ব্যাপারটাই আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু মিস্টার রীড, আপনি কী উপায়ে এই মহিলার বর্তমান চালচলন এবং আগের ইতিহাস এমন করে জানতে পারলেন?"

আমি বললাম, "এই মহিলাটিকে আমি দুদিন আগে জেনারেল পোস্ট অফিসে দেখেছি। তাঁর ভাবভঙ্গি আমার কাছে কিছু অস্বাভাবিক মনে হওয়াতে আমার কৌতূহল জাগে। তিনি একখানা চিঠি রেজিস্ট্রি করতে এসেছিলেন। তিনি চলে গেলে চিঠিখানা কার নামে লেখা তা জেনে নিই। আমাকে ওখানে দেখে তিনি খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, এটি লক্ষ করেই আমি এ কাজে ব্রতী হই। কিন্তু তবু আমি তখন ভাবতে পারিনি যে সে চিঠি এলাহাবাদের আদালতের বিচারাধীন আসামীর সম্পর্কিত। তারপর যখন সরকারী উকিলের টেলিগ্রামখানা পড়ি তখনই আমার মনে হয়, তাই তো এই তো সেই মহিলা! আমি, সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই মহিলার জীবনে যেটুকু ঘটেছিল, মাত্র সেইটুকুই জানি। এই তথ্যটা আমি কি ভাবে জানতে পেরেছি, তা বলি ইংল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোক ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস লিখেছেন। তিনি আমাকে এই মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কয়েকটি ছাপা প্রশ্নের উত্তর তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে তাঁর কাছে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মহিলাটি তখন যে সব জবাব দিয়েছিলেন তা থেকেই আমি তাঁর সম্পর্কে যেটুকু খবর জানতে পেরেছি। এখন আমি জি-পি-ওতে তাঁর যে অস্বস্তি দেখেছিলাম, তার কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। সেই সময়ের সিপাহী বিদ্রোহের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে তাঁর জীবনে যে ছোট কলঙ্কময় ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তার কথাই সেদিন জি-পি-ওতে তাঁর মনে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। অর্থাৎ আমি তাঁর জীবনের এই ইতিহাসটুকু জানি

বলেই তিনি আমাকে জি-পি-ওতে দেখে এতটা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। সে ভাব তিনি তখন গোপন করতে পারেন নি। তাঁর মুখচোখে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।"

আমার কথা শেষ হতে দেখি পুলিস কমিশনার তাঁর কলমটি মুখে পুরে চিবোচ্ছেন। তাঁর তখন গভীর মনোযোগ। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁর ড্রয়ার থেকে একখানি টেলিগ্রাফ ফর্ম বার করে বললেন, "আমি কতদূর এগিয়েছি তা এলাহাবাদে জানিয়ে দিই এবং বলি যে চিঠিতে বিস্তারিত লিখছি। ইতিমধ্যে ঐ মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া জরুরি দরকার।"

এই দেখা হওয়ার পর আর ঐ মহিলাকে এলাহাবাদে সাক্ষ্য দিতে যেতে হয় নি।

আমি প্রয়োজন বোধে এই কাহিনীর অনেকখানি অংশবাদ দিয়ে বললাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় আমার পাঠকদের কাছে পর্যবেক্ষণের মূল্য কত তা জানবার পক্ষে যথেষ্ট বলছি। আর ঠিক এই জন্যই এ কাহিনীটি উপস্থিত করলাম।

অপরাধ অনুষ্ঠানে বাধা

কয়েক বছর আগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে এক খেয়ালী বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাস করতেন। নাম তাঁর পেরেরা। সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। বয়স পঞ্চাশ থেকে যাটের মধ্যে, একটু স্থূলকায়, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে বাতে ভুগতেন। এর কারণ সম্ভবত তাঁর আহারের প্রতি লোভ, এবং মাত্রা ঠিক না রাখা। বিয়ে করেন নি, এবং বিয়ের বিরুদ্ধে তাঁর মত অতি স্পষ্ট। এককথায় তিনি ছিলেন বিবাহবিরোধী। নিজের তো বটেই, তাঁর কোনো আত্মীয় বিয়ে করুক এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর অগ্রজ, মিস এইচ—নাম্নী একটি মেয়েকে বিয়ে করেন এবং দুটি সন্তান ও বিধবা পত্নীকে রেখে মারা যান। এই স্ত্রীর বয়স তখন ছাব্বিশ বছর। সন্তান দুটিই মেয়ে। পেরেরা অবিবাহিত থাকায় মেয়ে দুটি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে জেনে তাদের মা পাগলা বুড়োকে যথাসাধ্য খুশি রাখার চেষ্টা করত। এই সময় ঐ বিধবার প্রতি একজন যুবক বিশেষ আকৃষ্ট হয়। বিধবাটি বলে, এখন তাদের বিয়ে না হওয়াই ভাল। বৃদ্ধ

মারা গেলে তারপর বিয়ে হোক, এই তার ইচ্ছা। কারণ আগেই বিয়ে হলে তার মেয়েরা তাদের জেঠার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পরে।

এ রকম আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ পেরেরা ভীষণ বিবাহবিরোধী। বিধবাটি যদি এখন আবার বিয়ে করে, তাহলে তিনি ভীষণ চটে গিয়ে উইল পালটে ফেলবেন। তাঁর সম্পত্তি অন্য কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে দিয়ে দেবেন। অতএব মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির এক নতুন পথ সে অবলম্বন করল। অর্থাৎ পেরেরা যাতে একটু তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তার ব্যবস্থা করল। বিদায় নিয়ে যে জগতে তিনি যাবেন, সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে অন্য কারো সুখের পথে কাঁটা দিতে পারবেন না।

এর পরে যখন পেরেরার বাতের আক্রমণ আরম্ভ হল, ঐ যুবতী তার দুই মেয়ে ও চাকর নিয়ে রোগীর বাড়িতে গিয়ে উঠল। অসুস্থ দেবরকে তার সেবা করা দরকার। কিন্তু এই সময় থেকে বৃদ্ধের অবস্থা কিন্তু আরও খারাপের দিকেই যেতে লাগল। কেন যে এ রকম হল তা বোঝা গেল না। এমন সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল ডাক্তারও যার কারণ খুঁজে পেলেন না। অবশেষে ডাক্তারের মনে সন্দেহ জাগল রোগী কোনো বিষজাত অসুখে ভুগছে। এ সন্দেহ অল্পদিনের মধ্যেই আর সন্দেহ রইল না, একেবারে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হল। কারণ এটি বিষের ক্রিয়া কি না পরীক্ষার জন্য চেষ্টায় তিনি ক্রমাগত বাধা পেতে লাগলেন। পেরেরার ডাক্তার পুলিসকে এসব জানাতে প্রথমত নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন, অথচ দেরি করলেও বিপদ। অতএব তিনি একদিন রোগীর বাড়ি যাবার পথে আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে সাধারণ বেশে রোগীর কাছে যেতে অনুরোধ জানালেন। তাহলে আর তাঁর ভ্রাতৃবধূ সন্দেহ করবে না যে পুলিস এসেছে, কারণ সে জানে আমি আরও একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে চাই। সে আমাকে একজন ডাক্তারই মনে করবে।

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হলাম। ডাক্তারের ব্রুহামে তাঁর কাছ থেকে সবটা ইতিহাস জেনে নিলাম। আমাদের গাড়ি এসে থামল পেরেরার দরজায়। একজন চাকর আমাদের ভিতরে নিয়ে পৌঁছে দিল। পেরেরার ভ্রাতৃবধূকে, অর্থাৎ আপাতত যে রোগীর নার্সের অভিনয়

করছে, দেখতে পেলাম না। সম্ভবত ডাক্তার এখন আসবেন তা তার জানা ছিল না।

ভিতরে পৌঁছে ডাক্তার রোগীর ঘরে প্রবেশ করলেন, আর আমি বসলাম গিয়ে বৈঠকখানায়। সেখানে কথা বলবার কেউ ছিল না। আমি একা ছিলাম, তাই হাতের কাছে একখানা বই পেয়ে তারই পাতা ওল্টাতে লাগলাম। বইখানা বিষ ও মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সম্পর্কিত। সদ্য কেনা, অর্ধেকের বেশি পৃষ্ঠা তখনও কাটা হয় নি। একটি পরিচ্ছেদের নাম দেখলাম 'লেড পয়জনিং' বা সিসের বিষক্রিয়া। আরও দেখলাম, এই অধ্যায়ের একটি অনুচ্ছেদের কয়েকটি লাইন পেন্সিলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একখণ্ড কাগজ বুকমার্ক হিসাবে রাখা আছে। এই অনুচ্ছেদটি পড়া শেষ হলে আমি বই বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে রোগীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ডাক্তার তখন সেখানে বসে প্রেসক্রিপশন লিখছিলেন। আমি তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে আমি যা দেখেছি বললাম। ডাক্তার আপন মনে খুব খাটো গলায় বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন, 'লেড পয়জনিং, লেড পয়জনিং। ঠিক, ঠিক। এইবারে তা হলে বোঝা গেল সব। যদিও এই বিষের ক্রিয়া মুখে ও দাঁতের মাড়িতে এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি। বইখানা নিয়ে আসুন তো।'

আমি বই আনতে গিয়ে দেখি—ইতিমধ্যে বইখানা কে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলেছে। নিশ্চয় ঐ বিধবাটি অন্য ঘর থেকে লুকিয়ে আমার ঐ বই পড়া লক্ষ করছিল।

এই সংবাদ শুনে ডাক্তার কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, 'এখন কী করা উচিত?'

আমি বললাম, 'আমাদের প্রথম কর্তব্য, অপরাধটি অনুষ্ঠিত হতে না দেওয়া। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে না থাকা। অপরাধ অনুষ্ঠিত হল, তারপর অপরাধীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, এমন না হওয়াই ভাল।'

ডাক্তার বললেন, 'আমারও ঠিক সেই মত। কিন্তু রোগীর জীবন রক্ষা করতে হলে তাঁর ভ্রাতৃবধূ এবং এ বাড়ির চাকরদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া দরকার। অর্থাৎ এদের মনে যাতে সন্দেহ না জাগে যে আমরা টের পেয়েছি, সেইভাবে চলতে হবে। কি করে তা করা যাবে সে হল এক সমস্যা।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, রোগীর জীবন রক্ষা যদি সম্ভব হয় তা হলে কেলেঙ্কারিটা চারদিকে না রটে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া।'

আমরা এই বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হল—ডাক্তার বিধবাটিকে বলবেন, "মিস্টার পেরেরার লক্ষণ দেখে মনে হয় এটি সিসের বিষক্রিয়া। নিশ্চয় চাকরদের কেউ ভুল করে এ কাজ করেছে। হয় তো খাবারের সঙ্গে দৈবাৎ সিসে মিশে গেছে। বুঝতে পারে নি, সিসেকে অন্য কিছু মনে করেছে।"—এই কথা বলে পেরেরার ভ্রাতৃবধূর উপর তার কী প্রতিক্রিয়া হয় তা তাঁরা লক্ষ করবেন।

এইটে স্থির হওয়ার পর আমরা রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইং-রুমে বিধবাটির সঙ্গে মিলিত হলাম। সেখানে টেবিলে আমাদের জন্য শেরি ও বিস্কিট রাখা হয়েছিল। ডাক্তার এক গ্লাস শেরি মাত্র পান করলেন এবং পরক্ষণেই কথাটা পাড়লেন।

"মিসেস পেরেরা, আমার বন্ধু ও আমি আজ আপনার দেবরের কেস্ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি, এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে তাঁর বাত যে সহজে সারছে না, তার কারণ তাঁর দেহে সিসে প্রবেশ করেছে। সম্ভবত তাঁর খাবারের সঙ্গে প্রবেশ করেছে।"

এ কথা শোনামাত্র বিধবাটি এমন কাশতে আরম্ভ করল যে মনে হল, সে যেন মাটিতে পড়ে যাবে। সে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, বিস্কিটের গুঁড়ো গলায় আটকে বিষম লেগেছে। আমরা দুজনে অবশ্য অন্য রকম বুঝলাম। এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ রইল না যে, মিস্টার পেরেরার অসুখের আসল কথা হঠাৎ শুনেই এ রকম হয়েছে। তাই মুখে যে অপরাধের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তা ঢাকবার জন্যই এই কাশির ছুতো। ডাক্তার অপেক্ষা করতে লাগলেন, কাশি থামলে বাকিটা বলবেন। কিন্তু মিসেস পেরেরা তা বুঝতে পেরে আরও বেশি বেশি কাশতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে ওখান থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে যেতে বাধ্য হল, ডাক্তারের কথা আর তার শোনা হল না। সে যেটুকু শুনেছে সেটুকুই অবশ্য তার একদিনের পক্ষে যথেষ্ট। ডাক্তার ও আমি ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

বেরিয়ে আসবার পর আমি অন্য পথ ধরলাম, সেদিকে আমার কাজ ছিল। এরপর আর আমাদের এ বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনা করা হল না।

আমাদের চলে আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই বিধবাটি ঐ বাড়ির এক চাকরের কাছ থেকে জানতে পারল যে আমি ডাক্তার নই। আমি ডিটেকটিভ বিভাগের সুপারিনটেনডেণ্ট। সে আমাকে চিনতে পেরেছিল।

যেমনি একথা শোনা, সে তো তখুনি গাড়ি ডাকিয়ে তার বাপের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল। বলল, "বাবা আমাকে মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে বাঁচাও।" তার বাবা ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তোমার বিরুদ্ধে কী করেছে, আমাকে সব খুলে বল।"

সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল "বাবা, বাবা, আমি নাকি পিটারকে বিষ খাইয়েছি, এই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ।"

পিটার পেরেরার খ্রীষ্টিয়ান নাম।

"অভিযোগ এনেছে কে?"—তার পিতা প্রশ্ন করলেন।

"পিটারের ডাক্তার, আর ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেণ্ট।"

বেদনাহত পিতা আর কোনো কথা না শুনে ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি জানতে চান ব্যাপারটা কী। যখন তিনি সেখানে পৌছলেন তখন ডাক্তার বাড়িতে ছিলেন না। তিনি সোজা আমার অফিসে এসে হাজির হলেন। তাঁর মেয়ের কাছ থেকে যেটুকু শুনেছেন তা আমাকে বললেন। আমি বললাম, "ডাক্তার মিস্টার পেরেরার খাদ্যে বিষ মেশানোর জন্য আপনার মেয়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আনেন নি। আপনার মেয়ে নিজেকে দোষী প্রমাণ করেছেন।"

আমি তখন আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে বৃদ্ধ কপাল থেকে ঘাম মুছে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, "মিস্টার রীড, এই বেদনাদায়ক ঘটনাটি আমাদের জীবনে সর্বনাশ ঘটাবে, আমাদের সুনামকে কলঙ্কিত করবে। আমি এ আঘাত সহ্য করতে পারব না।"

"মিস্টার এইচ"—আমি বললাম, "আপনার মেয়ে নিজেই নিজেকে অভিযোগ করেছেন। আর কেউ করে নি। বাড়ি গিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা রাখুন। তাকে মিস্টার পেরেরার বাড়িতে যেতে দেবেন না। তা হলে আর এ ঘটনা বেশিদূর গড়াবে না, এইখানেই এর শেষ হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় তাঁকে বললাম, "মিস্টার এইচ—আপনি সোজা বাড়ি চলে যান।

ডাক্তারের সঙ্গে আমি নিজে দেখা করে তাঁকে সব বুঝিয়ে বলব।"—আমি আমার কথা রেখেছিলাম।

এরপর থেকে মিস্টার পেরেরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। তবে প্রথম দিকে কিছু প্যারালিসিসের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেটা দূর হয়। তিনি সুস্থ মানুষের মতই চলাফেরা করতে সক্ষম হলেন।

ডিটেকটিভের ভুল

আমার কাহিনীগুলি যাঁরা পড়ছেন তাঁরা যেন এমন কথা না ভাবেন যে খুব সতর্ক থাকলেই অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ কখনও ভুল করবে না, অথবা পাকা প্রতারক তাঁকে বোকা বানাবে না। অন্য বৃত্তির লোকদের মত তাঁরাও প্রতারিত হন, অনেক সময়ে খুব সহজেই হন।

১৮৭৯ সালের ১০ই অগস্টের ঘটনা। নীলমাধব রুদ্র নামক এক স্বর্ণকার —এর সঙ্গে আমারও কারবার ছিল—তাঁর চাকরকে আমার কাছে এক সম্ভ্রান্ত চেহারার মুসলমানকে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। ঐ ভদ্রলোক একটি সোনার ঘড়ি বিক্রি করবেন। তিনি জানতে চান, ঘড়িটি তিনি নির্ভাবনায় কিনতে পারেন কি না। আমার অফিসে রক্ষিত চোরাই মালের তালিকাটা ভাল করে দেখে কোনো সোনার ঘড়ির উল্লেখ খুঁজে পেলাম না, তাই আমিই ঘড়িটা কিনতে চাইলাম। তিনি যা চাইলেন, সেই দামই দিলাম। ঘড়িটি নীলমাধব রুদ্র কিনতে চেয়েছিলেন, অথচ কিনলাম আমি। তাঁর সঙ্গে আমার যখন কারবার আছে, তখন তিনি অবশ্যই এতে কিছু মনে করবেন না।

বিক্রেতা গার্ডেন রীচে থাকেন বললেন। তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই তাঁর সঙ্গে একজন দেশী দারোগাকে পাঠালাম গার্ডেন রীচে। উদ্দেশ্য, দারোগা সেখানে গিয়ে এই ব্যক্তির পরিচয় জেনে আসবেন। অর্থাৎ তিনি কে এবং কী করেন। ভদ্রলোক আমার অফিস থেকে বিদায় নেবার আগে জানালেন যে, তিনি বৈবাহিকসূত্রে প্রিন্স ফারুক শা'র আত্মীয়। চেহারা দেখে এ পরিচয় মিথ্যা মনে হল না। বেশ সম্ভ্রম জাগানোর মত চেহারা। তিনি দারোগার সঙ্গে যেতে কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না।

বললেন, সে তো ভালই, এতে তাঁর পরিচয় যাচাই করার স্থবিধা হবে। চেহারাতেও কোনো রকম অপরাধের ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল না। আমি তাঁর সততায় এতই নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে, দেশী দারোগাটি যখন কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে আমাকে জানালেন যে তিনি সত্যিই প্রিন্স ফারুক শা'র শ্যালক, তখন আমি সে কথায় মোটেই বিস্মিত হই নি।

কিন্তু এর পরদিন স্থানীয় থানায় ফারুক শা অভিযোগ উপস্থিত করলেন যে, তাঁর একটি সোনার ঘড়ি চুরি গেছে। আমি যে ঘড়িটি কিনেছি, সে ঘড়িটার বিবরণও হুবহু এক। তিনি থানা থেকে জানতে পারলেন যে আমি একজন দেশী অফিসার পাঠিয়ে ঐ ঘড়ি সম্পর্কেই খবর জানতে চেয়েছিলাম। কারণ ঐ ঘড়ি বাজারে বিক্রির জন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল। প্রিন্স এ খবর শুনে তখুনি তাঁর জুড়ি হাঁকিয়ে চলে এলেন আমার কাছে। দেখলেন, এটি তাঁরই ঘড়ি। তিনি সবটা কাহিনী শুনলেন। আমিও শুনে বিস্মিত হলাম যে তাঁর শ্যালক তাঁর চুঁচুড়ার বাড়িতে এসে ওঠার পর ঘড়িটি পাওয়া যাচ্ছিল না। সুতরাং তাঁকেই সন্দেহ করা হচ্ছিল।

এখানে তর্ক উঠতে পারে যে ফিজিওগনমির বিদ্যা—অর্থাৎ মুখের ভাবে চরিত্র চেনার বিদ্যা এই বিশেষ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অচল হয়েছে। এমন কি অভিজ্ঞ ডিটেকটিভের বেলাতেও একথা সত্য হল। এর উত্তরে আমি বলতে চাই, এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধ চেতনার কোনো ভাব মুখে প্রকাশিত হয় নি এই জন্য যে অপরাধীর মনে নীতিগত অপরাধের কোনো বোধ ছিল না। আত্মীয়ের জিনিস চুরি, আর সে আত্মীয় যদি ভগ্নিপতি হয়, তা হলে সাধারণ চুরির ক্ষেত্রে যেমন অপরাধ বোধ হয়, এ ক্ষেত্রে ঠিক তেমন হবে না এটাই স্বাভাবিক। এই কারণেই এই লোকটির মুখে অপরাধের চিহ্ন প্রকাশ পায় নি।

হস্তলিপি

হস্তলিপি একটি শিল্প। যাঁরা ডিটেকটিভ হতে চান তাঁদের এই শিল্পের সঙ্গে ভাল পরিচয় থাকা দরকার, নইলে গোয়েন্দাগিরির বিদ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হস্তলিপির ব্যাখ্যা শিখতে হয়, কারণ হাতের লেখায় মনের ভাব ধরা পড়ে। সরল মনে লিখলে তার চেহারা এক রকম হয়, অপরাধের চেতনা

নিয়ে লিখলে আর এক রকম হয়। মুখের ভাবে যেমন এ দুইয়েরই প্রকাশ হয়, হাতের লেখার ভিতর দিযেও ঠিক তাই হয়। অপরাধ চেতনা শুধু মুখের পেশীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে না, হাতের পেশীতেও করে। কাজেই হাতের লেখাতেও তা ধরা পড়ে। তবে কাজটি কঠিন। (বিলেতেও হস্তাক্ষর ব্যাখ্যার বিশেষজ্ঞ খুব বেশি নেই, আর তা ভাল করেই বোঝা গিয়েছিল ক্রফোর্ড-ডিল্‌ক্‌ কেসে)। মিস্টার স্টুয়ার্ট কামবারল্যাণ্ড এবং আরও দুচারজন ব্যক্তি পেশীর ভাব দেখে 'থট রীডিং'-এর ক্ষমতা লাভ করেছেন। অতএব এ বিদ্যা আজকের নয়।

হাতের লেখার সময় আঙুল বেশি ব্যবহৃত হয়, না হাত বেশি ব্যবহৃত হয়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। আমি মনে করি, এর কোনো একটা আর একটাকে একেবারে বাদ দিতে পারে না। আমার মতে অক্ষরের উর্ধ্বমুখী আর নিম্নমুখী টানগুলি দিতে আঙুল ব্যবহৃত হয়, আর লেখাগুলি বাঁ ধার থেকে ডান ধারে চালাতে হাত ব্যবহৃত হয়। কাজেই স্বাভাবিক লেখাতে দুইয়েরই ব্যবহার হয়ে থাকে। স্বাভাবিক লেখার সঙ্গে নকল লেখার তুলনা করলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। স্বাভাবিক লেখায় হাত সহজভাবে চলে, সমানভাবে চলে, কোথাও হঠাৎ বেশি চাপ পড়ে না। নকল লেখায় হাতের ঝাঁকুনি লাগে, দেখলেই বোঝা যায় অক্ষরগুলো লেখকের নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল না। লেখার সময় নিব যখন উপরের দিকে চলে তখন নিব কাগজে বিঁধে যায়।

নকল লেখায় অক্ষরের উল্‌টো দিকে চাপ পড়ে বেশি। এতেও অনেক সময় নকল ধরা যায়। বেনামী চিঠিতেই এ রকম থাকে বেশি।

স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর যখন প্রতারণার জন্য নকল করা হয় তখন হাতের পেশীর কাজই হয় বেশি। তখন আঙুল স্বাধীন ইচ্ছায় সহজ লিখন লিখতে পারে না। মনোযোগটা নকল করার দিকে বেশি চলে যায়।

যাই হোক, নকল ধরার বিদ্যা, প্রয়োগক্ষেত্রে কতখানি সাফল্য লাভ করেছিল সে বিষয়ে একটা ঘটনার কথা বলি।

১৮৭২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি পুলিস কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেন যে ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করে ১২০০ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কে একখানি জালকরা দলিল পেশ করা হয়েছিল। এখানা প্রকাশ্যত মীরাট ট্রেজারির দেওয়া ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের উপর একখানা

ট্র্যান্সফার রসিদ। নির্দেশপত্রে উল্লেখ ছিল মীরাটের তিন নম্বরের দেশী ইনফ্যান্ট্রির অফিসার-কম্যাণ্ডিং-এর কাছ থেকে ঐ রেমিট্যান্স ট্র্যান্সফার রসিদখানা এসেছে। টাকাটা ক্যাপটেন জন মিল অথবা তাঁর নির্দিষ্ট লোককে দিতে হবে। এই নির্দেশপত্র যে খামে এসেছে তার উপরে ডাকঘরের ছাপে মীরাটের নাম আছে, সেটাও জাল। ট্র্যান্সফার রসিদ ওয়াটারলু স্ট্রীটের বিখ্যাত হোটেলের মালিক করবিটের নামে এনডোর্স করা আছে অর্থাৎ ক্যাপটেন জন মিল হোটেল-মালিককে ঐ রসিদ ভাঙিয়ে টাকা তোলার অধিকার দিয়েছেন। চতুর জালিয়াত, করবিটকে তাঁর অজ্ঞাতসারে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। জাল ধরা পড়বার পরে স্বভাবতই করবিটকে পুলিস কমিশনার ডেকে পাঠালেন।

করবিট বললেন—"১৮৭২ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে দীর্ঘদেহ সামরিক চেহারার এক ভদ্রলোক আমার হোটেলে ওঠেন। তাঁর চোখ দুটি নীল চশমায় ঢাকা ছিল। স্টাফ কোরের ক্যাপটেন জন মিল, এই নামে তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি চামড়ার ছোট পোর্টম্যাণ্টো ছিল। তার চামড়ার বন্ধনীর সঙ্গে ইস্পাতের খাপে একখানা তলোয়ার বাঁধা ছিল। একটা বাণ্ডিলে একটি অফিসারের ব্যবহারোপযোগী টুপি ছিল, তার উপরের মাস্তুলের মতন কাঁটাটা বাণ্ডিলের বাইরে দেখা যাচ্ছিল। আর ছিল একজোড়া কাঁটা লাগানো বুট। তিনি নিজের কামরায় বসে খেয়েছেন, এবং ৩রা তারিখে সকালে, প্রাতরাশ খাবার ঠিক পরেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, তাঁকে আজকেই বোম্বে মেলে কলকাতা ছাড়তে হবে। অতএব তিনি আমার উপরে একখানা চেক ভাঙানোর ভার দিচ্ছেন। সেখানা ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল থেকে ভাঙাতে হবে। তাঁর যাবার প্রস্তুতিপর্বের জন্য এত কাজ করতে হবে যে তিনি নিজে ব্যাঙ্কে যেতে পারবেন না। তাঁকে এখুনি ফোর্ট উইলিয়মে গিয়ে ব্রিগেড মেজরের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে। আমি চেক ভাঙাতে রাজি হয়ে তাঁকে ওখানা আমার নামে এনডোর্স করে দিতে বললাম। তিনি এনডোর্স করে দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে আমি ৫০০ টাকা করে ২০ খানা নোট ও ২০০০ টাকা খুচরো পেয়েছিলাম। ঐ টাকা আমি যথাসময়ে, অর্থাৎ তিনি ফোর্ট-উইলিয়াম থেকে ফিরে এলে তাঁকে দিয়ে দিই। টাকা পেয়ে তিনি

হোটেলের বিল পরিশোধ করে দিলেন। এবং অবিলম্বে হাওড়া স্টেশনে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁকে এর আগে বা পরে আর কখনও দেখি নি। হোটেলে থাকার সময় তিনি সব সময়ই চশমা পরে থাকতেন, চশমা ছাড়া অবস্থায় তাঁকে কখনও দেখি নি।

করবিট এর চেয়ে বেশি আর কোনো খবর আমাকে জানাতে পারলেন না। ফোর্ট উইলিয়ামের ব্রিগেড-মেজরকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে তিনি স্টাফ কোরের ক্যাপটেন মিল নামে কাউকে চেনেন না। এমন কোনো লোক ৩রা নভেম্বর তাঁর সঙ্গে দেখা দেখা করেন নি। তাহলে কে এই ক্যাপ্টেন মিল, কোথায় গেলেন তিনি? আমি এই কেসের তদন্তের ভার পাই। কেসটি বড় জটিল। তাছাড়া ছ সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। যেদিন ব্যাঙ্কে ঐ জাল, চেকটি ধরা পড়ল, আমি তার পরদিনই মেল-ট্রেনে মীরাট রওনা হয়ে গেলাম। আমার উপর নির্দেশ ছিল জীবিত হোক, মৃত হোক, ক্যাপ্টেন মিলকে ধরে আনতে হবে। খরচের জন্য কোনো ভাবনা নেই, যত লাগে দেওয়া হবে।

মীরাটে নেমে সোজা ট্রেজারিতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার সঙ্গে জালকরা দলিলগুলি ছিল। রেভনিউ বিভাগের অফিস ঐ একই বাড়িতে অবস্থিত। ট্রেজারি-অফিসার আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রায় চল্লিশজন কেরানি কাজ করছিল। সবটা ঘুরে দেখে কেরানিদের মধ্যে কাউকে জালিয়াত মনে হল না। জিজ্ঞাসা করলাম, ইতিমধ্যে কারো এখান থেকে বদলি হয়েছে কি না। অফিসার কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, ৩১শে অক্টোবরের পরে আর কাউকে বদলি করা হয় নি। বাট্রেস নামে একজন ঐ তারিখে এক মাসের নোটিস দিয়ে অফিস ছেড়ে গেছে। আমি হাতের লেখার নমুনা চেয়ে পাঠালাম। আমাকে রেভনিউ বিভাগের অনেক-গুলো খাতা এনে দেখানো হল। এই খাতাগুলো সে রাখত। তার স্বাভাবিক হাতের লেখার সঙ্গে জাল লেখা মেলাবার সুবিধা হল এতে। আমি বুঝতে পারলাম যে ও দুটি একই লোকের হাতের লেখা। তখন আমি ট্রেজারি-অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই লোকটিকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

তিনি বললেন, "সে বম্বেতে একটি চাকরি পেয়ে ১লা নভেম্বর এখান থেকে চলে গেছে। সেখানে সে যে চাকরিটি পেয়েছে, তার মাইনে বেশি। সে কাজে ইস্তফা দেবার আগের দিন আমাকে একথা বলেছে।"

"ও ! সে বলেছে বুঝি, সে বম্বে যাচ্ছে ?—তা হলে সে আর যেখানেই যাক না কেন, ঐ বম্বেতে সে যায় নি।"—আমি বললাম।

ট্রেজারি-অফিসার বললেন, "একটা কথা মনে পড়ল। মিলিটারী ক্যানটনমেণ্টে ঐ লোকটির স্ত্রী এবং মা থাকে। সম্ভবত তাদের কাছ থেকে আপনি কিছু খবর পেতে পারেন।"

আমি তখনই ক্যানটনমেণ্টে গিয়ে সন্ধান নিতে লাগলাম। তবে যাবার আগে ঐ লোকটির চেহারা কেমন, দৈর্ঘ্য কতটা, এই জাতীয় সব বিবরণ জেনে নিয়েছিলাম। অন্যান্য বিবরণের মধ্যে একটি যে লোকটি ট্যারা। মনে মনে ভাবলাম, "ও! এইজন্য সব সময় কলকাতায় সে নীল চশমায় চোখ ঢেকে রাখত!"

বাটরেসের স্ত্রী ও মা শুনলাম কয়েকদিন আগে ক্যানটনমেণ্ট ছেড়ে চলে গেছে। রেল স্টেশনে গিয়ে জানলাম তারা লখনৌ-এর টিকিট কিনেছে।

সন্দেহ হল, বাট্‌রেসের কোনো বন্ধু মীরাট থেকে তাকে তার করে জানিয়ে দিতে পারে যে তার পেছনে পুলিস লেগেছে। তাই আমি একখানা স্পেশাল এঞ্জিনের সঙ্গে একখানা গাড়ির ব্যবস্থা করে লখনৌ রওনা হয়ে গেলাম, এবং কলকাতা ছাড়ার তিন দিনেরও কম সময়ের মধ্যে আমি আমার পাখিকে খাঁচায় পুরলাম।

তারপর তাকে কলকাতা আনা হল। হাইকোর্টের বিচারে তার দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

হস্তলিপি বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা না থাকলে ব্যাট্‌রেসকে ধরা দুঃসাধ্য ছিল। হয় তো কোনো দিনই ধরা পড়ত না, এবং তার নিজের বিদ্যা নিরাপদে অন্যের উপর খাটাতে থাকত।

এই কেস্‌টি তখন খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, কারণ এমন সফল জালিয়াতির কেস্ বেশি দেখা যায় না। কলকাতার একটি প্রধান সংবাদপত্রে এই কেসের বিবরণে লেখা হয়—'অপরাধীকে খুঁজে বার করা এবং কেস্‌টি পরিচালনা করায় যে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তা পৃথিবীর যে-কোনো পুলিসের পক্ষে উচ্চ প্রশংসা পাবার উপযুক্ত।'

কিন্তু এ জাতীয় প্রশংসা এবং কেসের গুরুত্ব সত্ত্বেও ক্যালকাটা পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে (১৮৭১) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি এই—

(১৮৭২) জালিয়াতি।—ব্যাঙ্কে অব বেঙ্গল বনাম জন বাটরেস ওরফে ক্যাপ্টেন জন মিল। দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ডিটেকটিভ বিভাগের মিস্টার রীড অপরাধীর অনুসন্ধানে মীরাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য—ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের ডাইরেকটরগণ ব্যাটরেসকে ধরার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁদের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ব্যাঙ্কের ইউরোপীয়ান কর্মী যাঁদের হাতে চেক পাস হয়, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য দুই শত টাকা পেলে আমি তাঁদের হস্তাক্ষর পরীক্ষায় ওস্তাদ করে দেব। সে প্রস্তাব তাঁরা নেন নি।)

অপরাধ তদন্ত করার কৌশল

ভারতের প্রত্যেক পুলিস অফিসারই তো অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে যখন অপরাধ ও অপরাধী ধরা পড়ে তখন ডিটেকটিভের কাজ অর্ধসমাপ্ত হয় মাত্র। সবচেয়ে কঠিন কাজ তার পরের ধাপ। অর্থাৎ অপরাধ প্রতিষ্ঠার জন্য সাক্ষী জোগাড় করা এবং যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা। এইসব প্রমাণ বিচারক ও জুরীর কাছে সন্তোষজনক হওয়া চাই। যেসব অপরাধ হঠাৎ বা ঝোঁকের মাথায় অনুষ্ঠিত হয় না, পূর্ব পরিকল্পনায় আটঘাট বেঁধে অনুষ্ঠিত সেই সব অপরাধের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহই সবচেয়ে কঠিন। কারণ এমন অপরাধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন সাক্ষী পাওয়ার আশা করাই অন্যায়। পূর্ব পরিকল্পিত অপরাধ এমনভাবে অনুষ্ঠিত হয় যাতে বাইরেব কেউ তা জানতে না পারে। অপরাধীরা এই জিনিসটাই এড়িয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাদের সকল বুদ্ধি এবং শক্তি নিয়োগ করে। কাজেই জুরী যদি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে অপরাধীকে দণ্ড না দেবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, তা হলে তাঁরা সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধীদেরই মুক্তি দেন। যেসব ছোটখাটো অপরাধ হঠাৎ কোনো উত্তেজনার মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হয়, যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী পাওয়া যায়, এমন ছোট অপরাধের অনুষ্ঠাতারা শাস্তি পায়। তারা হয় তো জাত অপরাধী নয়। অপরাধ অনুষ্ঠানের মুহূর্তে এমন লোকের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। কেউ তা দেখছে কি না তা তাদের খেয়াল থাকে না বলেই তাদের শাস্তি দেওয়া সহজ হয়।

অবশ্য দেশী সাধারণ লোকদের সাক্ষ্য একটু সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার, কারণ তাদের সময় বিষয়ে জ্ঞান খুব ভাসাভাসা। তারা যা দেখেছে তা বর্ণনা করতে সব এলোমেলো করে ফেলে। বাজারের গুজবের উপর এবং কাল্পনিক সত্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে বসে। যা বলে তারও একটার সঙ্গে আর একটার মিল থাকে না, সামঞ্জস্য হারিয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমাদের কতবার হয়েছে যে, সাক্ষী করোনারের কাছে এক কথা বলেছে, এবং কয়েকদিন পরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর এক কথা বলেছে। আর এজন্য তারা শাস্তিও পেয়েছে। এমন সাক্ষীকে যদি তার এই কথার অসামঞ্জস্য দেখিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে বলে, "আগে যা বলেছি তা সত্য নয়, পরে যা বলেছি সেটাই সত্য।'

"তা হলে আগে মিথ্যে বলেছিলে কেন?"

"আমি তো মিথ্যে বলি নি।"

তাকে তখন তার আগের কথাগুলি পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হল। তখন সে বলল, 'আমি এ কথা বলি নি।"

"কিন্তু সবই তো লেখা আছে।"

"তা হলে এটা হাকিমের ভুল, আমার নয়।"

তখন বিরক্ত হয়ে তাকে কাঠগড়া থেকে বার করে দেওয়া ভিন্ন আর কি করা যায়? এ রকম ঘটলে সাক্ষীকে ঘটনাস্থলে নিয়ে তাকে সব জিনিসটা সে কি ভাবে ঘটতে দেখেছে, বর্ণনা করতে বললে অনেক সময় তার সাক্ষ্য সত্য কি মিথ্যা ধরা যেতে পারে।

তদন্তকারী অফিসারকে আমার উপদেশ এই যে, অপরাধের স্বীকারোক্তি খুব সতর্কতার সঙ্গে নিতে হবে। বিশেষ করে সে যদি দীর্ঘকাল কোনো নিম্নপদস্থ পুলিসের হেফাজতে থেকে থাকে তা হলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। কোনো ভয় থেকে বা কোনো লোভ থেকে সে হয় তো নিজের অপরাধ স্বীকার করছে। কিন্তু তা যে কী, তা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে জানা কঠিন। আসামী গুরু অপরাধে অভিযুক্ত। সে হয় তো এই বিশ্বাসে সব স্বীকার করে যে তা হলে তার দণ্ড লঘু হবে। দেশী পুলিস অফিসার অনেক সময় তার মনে এ রকম ধারণা জন্মিয়ে দেয়। কিংবা তার উপর এমন নির্যাতন চালানো হয়েছে যাতে সে অভিযোগ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

এইবার আমি একটি বড় অপরাধের কাহিনী বলব।

ক্যাথীড্রালে হত্যা

(মার্ডার ইন দি ক্যাথীড্র্যাল)

১৭৬৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, ঘোর সন্ধ্যা। এমন সময় যমুনা দাসী নামে এক স্ত্রীলোক এল বামুন বস্তী থানায়। আমি তখন এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। যমুনা দাসী জানাল—

'কলভিনের বস্তীতে আমার একখানা বাড়ি আছে। তাতে ভাড়াটে থাকে একটা ঘরে। তাদের তুজন বেটাছেলে, একজন মেয়েছেলে। গত চার দিন ধরে তাদের দরজা বন্ধ রয়েছে। আজ একটুক্ষণ আগে আমি একটা কাজে ঐ পথ দিয়ে যেতে, হঠাৎ দেখি বাইরের দরজার নিচে দিয়ে রক্তের মতন কি গড়িয়ে পড়ছে। একে সেখানে কেউ নেই, তার উপর এই কাণ্ড! আমার মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তাই এ বিষয়ে কী করা উচিত আপনার কাছে জানতে এসেছি।'

এইখানে আমি প্রসঙ্গত বলে রাখি, এমন ধরনের কেস্-এর সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে পুলিসকে সঙ্গে সঙ্গে যে সব উপায় অবলম্বন করতে হবে তার উপর। চালে একটুখানি ভুল হলেই সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে। সে জন্য পুলিস অফিসারের উপস্থিত বুদ্ধি, বিচারশক্তি ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং স্থিরমস্তিষ্কতা একটু ভাল রকম থাকা দরকার।

এখন যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি তাতে এইসব গুণ থাকা যে কত দরকার তা বোঝা যাবে। দেখা যাবে, এইরকম ঘটনাতেই এ সবের দরকার সব চেয়ে বেশি।

কেস্টি অদ্ভুত ধরনের। কারণ এই হত্যার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিন জাতীয় কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে লোকে নরহত্যা করে। কোনো সময় লুটের উদ্দেশ্যে করে। অধিকাংশ সময়েই করে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে। প্রথম জাতীয় হত্যাকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে না পারলে পরে হয় তো অনুতপ্ত হয়ে নিজে এসে ধরা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে কোনো অনুশোচনাই জাগে না। এ ক্ষেত্রে লুটের মাল কিছু ধরা পড়লে তদন্তের সূত্র পাওয়া যায়। তৃতীয়

ক্ষেত্রে, বিশেষ করে হত্যা যদি পুর্বকল্পিত হয় এবং গোপনে অনুষ্ঠিত হয় তা হলে হত্যাকারীকে ধরা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে।

এই বিশেষ হত্যাকাণ্ডটি পুর্বকল্পিত এবং গোপনে অনুষ্ঠিত। নিহত মেয়েটি যুবতী। তাকে নবীন ও কৈলাস নামক দুইজন দেশী খ্রীস্টান ফুসলিয়ে এনে ঐ ঘরে রেখেছিল এবং দুজনের সঙ্গেই তাকে থাকতে বাধ্য করেছিল। প্রায় চার মাস হল ওরা কলভিন বস্তীর ঐ বাড়িতে বসবাস করছে। এমন সময় একটি মেয়ে—কৈলাসের বোন—কৈলাসকে কলকাতায় দেখতে আসে তার দেশ থেকে। নবীন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়, তাকে বিয়ে করতে চায়। মেয়েটিও তাতে রাজি হয়। মেয়ের বাবাও এসেছিল মেয়ের সঙ্গে। সেও এ বিয়েতে সম্মতি দান করে। জটিলতা আরম্ভ হল এর পর থেকে। কৈলাস এখন নবীনের শালা হতে চলেছে। এমন অবস্থায় ঐ রক্ষিতা মেয়েটিকে বিদায় করা দরকার। কিন্তু কী উপায়ে তা করা যাবে? ঠিক হল, নবীন তাকে কিছু টাকা দেবে এবং অন্যত্র পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু নবীনকে ছেড়ে যেতে সে ভীষণ আপত্তি জানাল। কারণ সে তাকে ভালবেসে ফেলেছে। সে তাকে বলল, "তুমি আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ভুলিয়ে এনেছ, আমার জাত মেরেছ, আর এখন কিনা তুমি আমাকে বিদায় করতে চাও? কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমার টাকায় আমার দরকার নেই। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। মরণ ভিন্ন আর কিছুতে আমাদের দুজনকে আলাদা করতে পারবে না। তুমি যদি আমাকে জোর করে তাড়াতে চাও তা হলে আমি ক্যাথীড্রালের পাদ্রীর কাছে গিয়ে সব বলে দেব। তুমি আমাকে কিভাবে ভুলিয়ে এনেছ, আর কিভাবে আমার সঙ্গে বাস করছ সব বলে দেব। আমাকে এখন তাড়াতে চাও তাও বলব।"

এই শেষের কথাগুলিতে নবীন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে বুঝতে পারল এ কথা সেখানে প্রকাশ হলে তার চাকরিটি যাবে। তখন বিয়ে করাও চলবে না। এইখানে ঐ রক্ষিতাকে হত্যা করার একটা মোটিভ পাওয়া গেল। (আসামী পক্ষের উকিল কিন্তু প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে হত্যায় প্রেরণা দেবার পক্ষে এই যথেষ্ট নয়।)

এই সব তথ্য পাঠককে শোনাবার পর আমি এবারে ঘটনায় ফিরে আসি। আমি বাড়িউলি যমুনা দাসীর মুখে সংবাদ শুনে তখুনি তার সঙ্গে ঘটনাস্থলে

গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম দরজার উপর এবং নিচে দুদিকেই শিকল আঁটা এবং তালাবন্ধ। চৌকাঠের নিচে কিছু ফাঁক ছিল। ফাঁক দিয়েই ঘরের ভিতর থেকে কিছু রক্ত বেরিয়ে এসেছে, দেখে তাই মনে হল। প্রতিবেশীর এক বাড়ি থেকে একখানা কুড়ুল চেয়ে এনে দরজা ভাঙা হল। রাত তখন ৮টা। আমার সহকারীর কাছ থেকে লণ্ঠন চেয়ে নিয়ে আমি একা ঘরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু তার আগে বাইরের কৌতূহলীদের ভিড় সরিয়ে দিতে আদেশ দিলাম। বড় বিরক্ত করছিল তারা।

ভিতরে দরজার কাছেই একটি বাক্স, চেপে বন্ধ করা। ঢাকনাটা কিছু উঁচু হয়ে আছে, এবং একটা অংশ কব্জা থেকে খুলে এসেছে। এই বাক্স থেকেই রক্ত বেরিয়ে আসছে। আমি শিকলটা খুলে ডালাটি তুলতে গিয়ে দেখি ভিতর থেকে এমন ঠাসা অবস্থায় ছিল, যাতে আপনা থেকেই সেটি কব্জা থেকেও খুলে পড়ল। ভিতরে যুবতীর মৃতদেহ। চাপ সরিয়ে নেওয়াতে যেন তা আরও ফুলে উঠতে লাগল। বিভীষিকা বললে কমই বলা হবে। যাই হোক, উপস্থিত বুদ্ধিটি তখনও আমার অক্ষত ছিল। তাই আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে খুব সাবধানে দরজা বন্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভিড়। তাদের প্রশ্ন 'ব্যাপার কি সাহেব?" আমি একটু হেসে বললাম, "বিশেষ কিছুই না। ভাড়াটেরা কারো পাঁঠা চুরি করে এনে গোপনে কেটে বাক্সবন্দী করে রেখেছে। পাড়ার কারো পাঁঠা চুরি গেছে কি না তোমরা জান?"

এ কথা শোনার পর ভিড় ধীরে ধীরে কমতে লাগল। মনে হল তারা যেন ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল। তারা আশা করেছিল মজাদার কিছু দেখতে পাবে।

ভিড় বিদায় হলে প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে আনা একখানা বেঞ্চিতে বসে নোটবুক বার করে যমুনাকে প্রশ্ন করতে লাগলাম।

"তোমার ভাড়াটেদের পরিচয় কী?"

'তারা দুজন দেশী খ্রীস্টান, নাম কৈলাস আর নবীন। ওরা ক্যাথীড্রালে চাকরি করে। আর একজন স্ত্রীলোক ওদের সঙ্গে থাকে।"

"তার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী?"

"সে নবীনের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তারা দুজনেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বাস করে।"

"তোমার ঘর ওরা কতদিন ভাড়া নিয়েছে ?"

"প্রায় চার মাস।"

"ঘর ভাড়া কে নিয়েছে ?"

"দুজনে। যেদিন ভাড়া নেয় সেইদিন সন্ধ্যায় স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে আসে।"

"স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ওদের সব সময়েই কি সদ্ভাব ছিল ?"

"তা ছিল। কিন্তু মেয়েটি নবীনকে বেশি পেয়ার করত।"

"কখনও কি ওদের ঝগড়া হতে দেখ নি।"

"না। কিন্তু সপ্তাহখানেক আগে মনমোহিনী কাঁদছিল জানি। আর বলছিল, নবীন তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়।" মেয়েটির নাম মনমোহিনী।

"তোমার কাছে কি সে ঐ একবারই মাত্র অভিযোগ জানিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ, ঐ একবারই।"

"মনমোহিনীকে শেষ কবে দেখেছ ?"

"চার দিন আগে সন্ধ্যায় তাকে শেষ দেখেছি। সে তখন দরজার কাছে বসে ভাত খাচ্ছিল।"

"নবীন অথবা কৈলাস কি তখন উপস্থিত ছিল ?"

"হাঁ। তারা দুজনেই ঘরের মধ্যে ছিল।"

"নবীন আর কৈলাসকে পরে কবে দেখেছ ?"

"পরদিন সকালে দেখেছি।"

"কী অবস্থায় দেখেছ ? মানে, তারা তখন কী করছিল ?"

"তারা তখন কাজে বেরুচ্ছিল।"

"তুমি তখন কোথায় ছিলে ?"

"আমি দরজা খুলছিলাম।"

"তাদের কাজে বেরুবার সময় তোমার দরজার সামনে দিয়েই যেতে হয়।"

"হাঁ।"

"যাবার সময় তাদের সঙ্গে তুমি কোনো কথা বলেছিলে ?"

"না। তারাই বলেছিল।"

"তাদের মধ্যে কে বলেছিল ?"

"নবীন।"

"কী বলেছিল ?"

"বলেছিল, সালাম বাড়িউলি। আমি আমার দরজা তালাবন্ধ করে যাচ্ছি। কয়েক দিন থাকব না, আপনি একটু দেখবেন।"

"তুমি কী বলেছিলে ?"

"আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনমোহিনী কোথায় ?"

"নবীন কী বলল ?"

"মনমোহিনী ভবানীপুরে তার মাসির বাড়ি গেছে। কিছুদিন সেখানেই থাকবে।"

"নবীনের সঙ্গে যখন তোমার এই সব কথা চলছিল, তখন কৈলাস কোথায় ছিল ? সেও কি সেখানে উপস্থিত ছিল ?"

"সে তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নবীনের জন্য অপেক্ষা করছিল।"

"এই ঘটনার পর ওদের কেউ সেখানে এসেছিল ?"

"না। আমি দেখি নি।"

"মনমোহিনীও আসে নি ?"

"না।"

"নবীন ও কৈলাসের তখন কি রকম জামাকাপড় পরা ছিল।"

"সাদা চাপকান।"

"আগের দিন যখন সন্ধ্যায় তারা ওখানে আসে তখন তাদের কী রকম কাপড় পরা ছিল ?"

"নবীনের গায়ে ছিল ম্যাজেন্টা রঙের ফ্ল্যানেলের কোট, আর কৈলাসের গায়ে ছিল নীল রঙের। দুজনেই তা শাদা চাপকানের উপর পরেছিল, কারণ সে সময় গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছিল।"

"তাদের পায়ে জুতো ছিল ?"

"জুতো তারা হাতে ঝুলিয়ে রেখেছিল, কারণ বস্তীর জমিতে জল জমেছিল। বিশেষ করে তাদের ঘরের দরজার সামনে একটু বেশি জল ছিল।"

"পরদিন সকালে যখন তারা বেরিয়ে যায় তখন তাদের পায়ে জুতো ছিল।"

"না। কারণ জল পার হয়ে তাদের ফুটপাথে উঠতে হয়েছিল।"

"তাদের হাতে কিছু ছিল ?"

"না।" (যে ফ্ল্যানেল কোটের কথা বলা হয়েছে, তা ঐ ঘরেই মৃতদেহের কাছে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ম্যাজেণ্টা রঙের জামাটায় রক্তের দাগ ছিল। দুজনেই, ও জামা তাদের, এ কথা অস্বীকার করেছিল, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছিল তাদের কথা মিথ্যা।)

প্রতিবেশীদের কয়েকজনকে ডাকিয়ে ঐ একই ধরনের প্রশ্ন করে তাদের সাক্ষ্যও সব শেষ করে নিলাম। এ দেশে যে সব অদ্ভুত উপায়ে সাক্ষ্য আদায় করা হয়, তা জানতে হলে সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। কোনো ইংরেজের এ সব জানা না থাকলে তার পক্ষে ঐ সব অদ্ভুত উপায়গুলির কথা বিশ্বাস করাই শক্ত হবে। অবশ্য কঠিন কঠিন অপরাধের ক্ষেত্রেই এ রকম দরকার হয়।

এই ঘটনার এক জন সাক্ষীর কাছ থেকে যেটুকু খবর পাওয়া গেল, আমার সন্দেহ হল, সে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে, কিন্তু অনেক কথা গোপন করে যাচ্ছে। তখন আমি আরও কথা আদায়ের জন্য এই উপায় অবলম্বন করলাম—

"শোন হরি সিং, মনমোহিনীর সঙ্গে একই বাড়িতে তুমি থাকতে। তোমার ঘর আর তার ঘরের মাঝখানে মাত্র একটি পাতলা মাটির দেয়ালের ব্যবধান। নবীন আর কৈলাসের সঙ্গে তুমি শেষ যেদিন ঐ বাড়িতে কাটিয়েছ, সেদিন রাত্রে নিশ্চয় তুমি পাঁঠা কাটার সময় তার ডাকের মতন কোনো আওয়াজ শুনেছ। ব্যাপারটা জরুরি কিছু নয়, কিন্তু তুমি জান আমি এ সব জিনিস তন্নতন্ন করে জানতে চাই। এইবার বল তো হরি, কী রকম শব্দ হয়েছিল?"

হরি সিং একটুখানি ভেবে বলল, "রাত্রে আমি বড়ই ক্লান্ত ছিলাম, তাই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আমার বউ শব্দ শুনেছিল।"

"কী রকম শব্দ শুনেছিল, বল।"

"সার, আপনি যেমন বলছেন, তেমন শব্দ নয়। পাঁঠার ডাকের শব্দ নয় সে। মানুষের গলা টিপে ধরলে যেমন শব্দ হয়, চেঁচাতে যাচ্ছে অথচ পারছে না, তেমনি শব্দ। তারপরে দরজা ধাক্কার শব্দ। কয়েকজন মানুষের কথার আওয়াজ, কিন্তু খুব অস্পষ্ট।"

"ঠিক আছে। এবারে তোমার বউএর কাছ থেকে আরও ভাল করে শুনি?"

"কিন্তু সার, সে যে পর্দানশীন, আপনার সামনে বেরোবে না।"

"আমি তাকে দেখতে চাই না, পর্দার আড়াল থেকেই শুনব।"

হরি সিং রাজি হল। তার স্ত্রী যা বলল তা নোট করে নেবার পর সাক্ষীদের কাছে এবং প্রতিবেশীদের কাছে কী ঘটেছে সব খুলে বললাম। সাক্ষীদের বিশেষভাবে বললাম তারা যা বলেছে, তা সরল ভাবেই বলেছে, এবং তা লিখে নেওয়া হয়েছে। আশা করছি পরে আরও নতুন কিছু পাওয়া গেলে তারা যা একবার বলেছে তা যেন ভুলে না যায়। তারা সবাই আবাকে প্রতিশ্রুতি দিল, ভুলবে না। তখন তাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলাম মৃতদেহ সনাক্ত করাতে। কিন্তু সেই বিকৃত দেহ দেখে তারা এমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল যে, এ যে কার মৃতদেহ তা তারা আর বলতে পারল না। কেউ কেঁদে উঠে চোখ ঢাকল। অন্যদের কোনো রকমে হাত ধরে বাইরে আনা হল। সেই বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্য তারা সহ্য করতে পারল না।

এই সব সরল গরিব বেচারাদের সাক্ষ্য আমি যে আগেই পকেটস্থ করেছি এজন্য আমার যে তুষ্টি হয়েছিল তা প্রকাশ কারার ভাষা আমার নেই। কারণ বুদ্ধি করে এটা আগেই না করলে পরে ঐ মৃতদেহ দেখে আর তারা মাথা ঠিক রেখে কিছু বলতে পারত না। সমস্তই যেখানে গৌণ প্রমাণ বা circumstantial evidence-এর উপর নির্ভর করে, সেখানে ব্যর্থ হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয় কিছুই। অভিজ্ঞ বিচারপ্রসূত সাক্ষ্য এই সব বস্তীর লোকদের মুখ থেকে আদায় করা কখনই সম্ভব নয়। এরা জোরের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারে না। তারা কোনো খুনের কেসের মধ্যে নিজেদের জড়াতে ভীষণ ভয় পায়। অনেকে যারা কাজের মতন সাক্ষ্য দিতে পারত তারা সামনে আসেই না। এবং পাছে তাদের ডাক পড়ে সেজন্য অনেক সময় পলাতক হয়।

তদন্তের প্রথম দিকে আমি বুদ্ধি করে আমার এক নিম্নপদস্থ অফিসারকে সাদা পোশাকে ক্যাথীড্রালে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম নবীন ও কৈলাসকে গ্রেফতার করতে, অথবা না ডাকা পর্যন্ত সেইখানে আটকে রাখতে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কেন, তা সহজেই অনুমেয়। হত্যার স্থানের কাছাকাছি স্থান থেকে যতটা তথ্য সংগ্রহ করা যায় তা করা হয়ে গেলে, একজন লোককে পাঠানো হল ক্যাথীড্রালে। সেখানে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়ে থাকলে

ঘটনাস্থলে তাদের নিয়ে আসতে হবে এই ছিল নির্দেশ। লোক কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল শুধু নবীনকে নিয়ে। কৈলাসকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর তাকে মনমোহিনীকে ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হল। বলা হল তার যদি কিছু বলবার থাকে, তবে বলতে পারে। আমি আরও বললাম, "কিন্তু মনে রেখ, তুমি এখন আমাকে যা বলবে, তা তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে।"

নবীন এর উত্তরে বলল, "মনমোহিনী আমার কেউ ছিল না, সে কৈলাসের রক্ষিতা ছিল। হত্যা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।"

নবীনকে তখন ঘরের ভিতরে নিয়ে লাশ দেখানো হল। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কার দেহ? সে বাক্সটির দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, "হাঁ, এটি মনমোহিনীরই মৃতদেহ।"—এর বেশি আর সে বলতে পারল না। হাওয়ায় কাঁপা পাতার মতন কাঁপতে লাগল। তার মুখ ঘামে ভিজে উঠল, ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল গলা বেয়ে।

গ্রেফতারের পর নবীনের দেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল তার বাঁ কানটায় একটা মোটা আঁচড়ের দাগ। কানের পাশের একটা জায়গা থেকে একগোছা চুল সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। সে বলল, ক্যাথীড্রালের কম্পাউণ্ডে সে তার দেশের একটি লোকের সঙ্গে কুস্তি লড়েছিল, সেই সময় এই সব ঘটেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী তার চুল মুঠো করে ধরেছিল তাকে কাবু করার জন্য। সে সুরকির উপর পড়ে গিয়েছিল। এসব তারই চিহ্ন।

আমি এ বিবৃতিতে খুশি হতে পারলাম না। তার কথা সত্য মনে হল না। একটুখানি ভাবতেই মনে পড়ল নিহত স্ত্রীলোক নিশ্চয় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় হাতে যা পেয়েছে মুঠো করে ধরেছে। নবীনের মাথা থেকে এক গোছা চুল অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাব্য কারণ এটাই। আমার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে মৃতার হাতের মুঠোয় তার প্রমাণ মিলতে পারে। কাউকে কোনো কথা না বলে সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে লাশ পরীক্ষা করলাম। দেখলাম ঠিক তার ডান হাতের মুঠোয় তখনও এক গোছা চুল ধরা রয়েছে। এ চুল আকারে, এবং বর্ণে নবীনের চুলের সঙ্গে মেলে। এতে কী প্রমাণ হয়? আমি মনে মনে বিচার করতে লাগলাম। নবীন মেয়েটিকে শুধু যে হত্যা করেছে তাই নয়, মেয়েটি নিহত হওয়ার সময় চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, আর নবীন তার উপর ঝুঁকে পড়ে তার দম বন্ধ করে মারছিল। আর ঠিক এই কারণেই

মেয়েটি তার ডান হাতে নবীনের বাঁ দিকের চুলের গোছা ধরতে পেরেছিল। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য হত্যাকারীর সঙ্গে শেষ বারের মতন এই লড়াই স্বাভাবিক। আর নবীনের বাঁ কানে যে মোটা আঁচড়ের দাগ পড়েছে সেও ঐ একই কারণে।

পুলিস সার্জন মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন। আমি তখন তার হাতের শক্ত মুঠো থেকে খুব সাবধানে চুলের গোছাটি খুলে নিয়ে, ভাল করে ধুয়ে কাগজে সযত্নে জড়িয়ে রাখলাম, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলে। নবীনের কাছে একটি চাবি পাওয়া গেল। সে চাবি মৃতার ঘরের একটি তালায় লাগে। আমাকে তালায় চাবি লাগিয়ে পরীক্ষা করতে দেখে নবীন বলল, 'ওটা ক্যাথীড্রালের এক দরজার তালার চাবি।' পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল এ কথাটা সত্য। কিন্তু ক্যাথীড্রালে যেখানে সে থাকত, তার গুদামে আসল চাবিটি পাওয়া গেল। ওখানে এ চাবি এল কি করে, তার উত্তরে নবীন বলল, "ঐ ঘরে আমার সঙ্গে কৈলাস বাস করত। সেই হয় তো চাবি ওখানে ফেলে গেছে। আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। মনমোহিনীর কাছে কৈলাসই শেষ বার গিয়েছে।"

ক্যাথীড্রালের রক্ষকের কাছ থেকে আরও কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল। সে বলল, যে দিন হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, সেই রাত্রে ওরা দুজনেই ক্যাথীড্রালে অনুপস্থিত ছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় তারা তার কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিয়েছিল। সাধারণভাবে দুজন একসঙ্গে সমস্ত রাত্রির জন্য বাইরে থাকতে পারে না। তা হলে ধরা পড়ে যাবে। কারণ তাদের একটি কাজ হচ্ছে পালা করে রাত্রে গীর্জা পাহারা দেওয়া, আর রক্ষকের কাজ হচ্ছে মাঝে মাঝে দেখা যে, তারা ঠিকমতন কর্তব্য করছে কি না। রাত্রে এ রকম দু একবার তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কাজেই কেউ না থাকলে ধরা পড়ে যাবেই।

এবারে নবীনের কথা রেখে কৈলাস কি কি করেছে তা দেখা যাক। সে রাত্রের জন্য ছুটি নেওয়ার পর নবীনের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আর তাকে সেদিন দেখা যায় না। হত্যাকাণ্ড আবিষ্কারের পূর্বদিনের আগে পর্যন্ত তার দেখা মেলে না।

সেদিন রবিবার ছিল, তাই সে এসে গীর্জার প্রার্থনা সভার ঘণ্টা বাজানোয় নবীনকে সাহায্য করেছিল। দুই দিন অনুপস্থিত থাকার কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে

বলে, ক্যাথীড্রালের গেট বন্ধ করতে হাতে তার আঘাত লাগে, তাই সে দুদিন কাজ করতে পারে নি। এ কৈফিয়ৎ ক্যাথীড্রালের রক্ষকের বিশ্বাস হয়, তাই এ বিষয়ে আর কোনো কথা ওঠে না। কৈলাস কিন্তু সেই রাত্রেই আবার নিরুদ্দেশ হয়। পুলিস অনুমান করল লবণ হ্রদের কাছাকাছি তার এক কাকা বাস করে, সে তার নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে ঠিক সেইখানে উঠেছে। মধ্যরাত্রে কয়েকজন পুলিসের লোককে ছদ্মবেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারা সেই বাড়িটি ঘিরে রইল এবং কয়েকজন ভিতরে গিয়ে কৈলাসকে গ্রেফতার করল। তাকে থানায় এনে যখন বলা হল, তার বিরুদ্ধে মনমোহিনী হত্যায় নবীনের সাকরেদরূপে কাজ করার অভিযোগ আনা হচ্ছে, তখন সে সেকথা একেবারে অস্বীকার করে বসল। সে বলল, "আমি এর কিছুই জানি না। সবাই জানে মেয়েটি নবীনের রক্ষিতা ছিল, আমি কদাচিৎ সেখানে গিয়েছি। গত একমাসের মধ্যে একবারও যাই নি।"

কৈলাসের ডান হাতের তিনটি আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। আমি ব্যাণ্ডেজ খুলতে বললাম। দেখলাম তিনটি আঙুলেরই পিছন দিকে আগাগোড়া ছাল উঠে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে হল? সে গীর্জার রক্ষকের কাছে যা বলেছিল, আমাকেও তাই বলল। আমি তখন তাকে ক্যাথীড্রালে নিয়ে গিয়ে বললাম, আমাকে দেখাও ঠিক কিভাবে ঐ আঘাত লেগেছে। গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে দিলাম। বললাম গেট বন্ধ করতে। কিভাবে আঘাত লাগে তা আমি দেখতে চাই। কৈলাস খুব চাতুর্যের সঙ্গে এটি দেখাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে যেভাবে দেখাল, তাতে হাতের আঙুলে আঘাত লাগে ঠিকই, কিন্তু ওভাবে চামড়া উঠে যেতে পারে না, চাপ পড়ে শুধু কালসিটে পড়ে যেতে পারে।

আমি মনে মনে বুঝতে পারছিলাম ঐ আঘাত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি চলে গেলাম ঘটনাস্থলে। বাক্স থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাক্সটি ঐখানেই পড়েছিল। দেখলাম ডালাটা যে লোহার পাত দিয়ে চারদিকে মোড়া ছিল তা ডালা বন্ধ করলে বাক্সের গায়ে এক ইঞ্চি পরিমাণ নেমে যায়। আমার এখন মনে পড়ল যখন আমি এর ডালা তুলি, তখন মেয়েটির হাতের কনুই এবং কাঁধ ডালার চাপ থেকে ছাড়া পেয়ে অনেকখানি উঁচু হয়ে উঠেছিল। আরও একটু চিন্তা করতেই মনে হল কৈলাস বাক্সের ডালাটি যাতে সহজে বন্ধ করা যায় সেজন্য নিশ্চয় মৃতদেহটিকে

খুব জোরের সঙ্গে ভিতরে চেপে রেখেছিল। ডালাটা বন্ধ করার জন্য যখন আরও চাপ দিচ্ছিল, সেই সময় ঐ লোহার পাতে তার আঙুলের চামড়া এইভাবে উঠে গেছে। সেখানে চামড়া লেগেছিল। তিনখণ্ড তা থেকে তুলে ভিজিয়ে কাগজের উপর মেলে দিলাম। চামড়ার ঐ অংশগুলি নিয়ে কৈলাসের আঙুলের তিনটি ক্ষতস্থানে রেখে দেখলাম সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে।

ক্যাথীড্রাল থেকে কৈলাস নিরুদ্দেশ হয়েছিল, নবীন হয় নি, এটি অনেকের কাছে বিস্ময়কর বোধ হতে পারে। কারণ সমস্ত ঘটনা এবং সাক্ষ্য ইত্যাদি থেকে নবীনকেই হত্যাকারী মনে হবে। অথচ সে পালায় নি কেন? এর কারণ সম্ভবত এই যে নবীনের কিছু সম্পত্তি ছিল। সে নিরুদ্দেশ হলে তার ক্ষতি হত। কৈলাস ছিল নিঃস্ব, তার হারাবার কিছু ছিল না। হত্যার দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে কৈলাস লুকিয়ে থেকে বিচার এড়াতে পারবে ভেবেছিল। এতে নবীনকে আর কেউ সন্দেহ করত না। এজন্য নবীনের কাছ থেকে সে অনেক টাকা খেয়েছিল। এই কেস্‌টার আর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। হত্যাটি পূর্ব-পরিকল্পিত, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে: মৃতদেহটি বাক্সের মধ্যে রাখা হল কেন? কারণ এভাবে ফেলে রাখলে তো ধরা পড়তেই হবে? আমার যা মনে হয় তা এই—

ওরা ভেবেছিল হত্যার রাত্রিতেই ওখান থেকে সব সরিয়ে ফেলবে এবং পুকুরে বা নদীতে নিয়ে সবসুদ্ধ ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু যখন দেহটি বাক্স থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল এবং ডালার কব্জা খুলে এল, তখন এ পরিকল্পনা তাদের ছাড়তে হল। এদিকে সকাল হয়ে আসছিল, তাই তারা 'যা হয় হোক' মনে করে অগত্যা ওখান থেকে সরে এসেছিল।

তদন্ত শেষ করে কেস্‌টি যথাযথ ভাবে দক্ষিণবিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাশে দেওয়া হল। নবীন ও কৈলাস ইচ্ছাকৃত নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হল। তারপর পরবর্তী হাইকোর্টের অধিবেশনে এদের বিচার আরম্ভ হল।

হরি সিং সাক্ষ্য দেবার সময় বলেছিল, গলা চেপে ধরলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ তার স্ত্রী শুনতে পেয়েছিল। শ্বাসরোধ করেই মেয়েটিকে মারা হয়েছিল তা পোস্ট মর্টেম বা মরণোত্তর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। স্পেশাল জুরীর কাছে পুলিস সার্জন যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা এইরূপ—

পুলিস সার্জন ডাক্তার উডরব শপথ গ্রহণান্তে বললেন—'আমি পুলিস সার্জন। ৮ই তারিখে আমি মনমোহিনী নামক এক দেশী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখি। সে সময়ে এটি একটি ছোট বাক্সে (বাক্সটি দেখানো হল) চেপে ঢোকানো ছিল। প্রথম আমি এটিকে কলভিনের বস্তীর একটি কাঁচা ঘরের মধ্যে দেখি। এই বস্তী সার্কুলার রোডে অবস্থিত। দরজার চৌকাঠ ও বাক্সের মধ্যবর্তী স্থানে মেঝের উপর আমি রক্তাক্ত ফেনা দেখতে পাই। আমার মতে এই ফেনা ঐ মৃত স্ত্রীলোকের নাক মুখ এবং কান থেকে বেরিয়েছে এবং বাক্স থেকে গলে বাইরে এসেছে। বাক্সটি বাইরে এনে অনেক কষ্টে দেহটি তা থেকে বার করা হয়। পরে আমি মেডিক্যাল কলেজ হস্পিটালের মড়া-ঘরে ঐ একই শবদেহ দেখেছি। এবং আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মরণোত্তর পরীক্ষা শেষ করেছি। আমার মতে দেহের মৃত্যু ঘটেছে দুই থেকে চার দিনের মধ্যে (এর চেয়ে সঠিকভাবে সময় বলা কঠিন)। আমি যখন মৃতদেহটি দেখেছি এ সময়টা তারই পূর্বেকার। মৃতদেহ তিন দিন পরে যেমন চার দিন পরেও প্রায় সেই রকমই দেখায়। এবং শবদেহ কি অবস্থায় রাখা হয়েছে, কি রকম তাপে রাখা হয়েছে তার উপর তার পরিবর্তন নির্ভর করে। অর্থাৎ এই সব অবস্থা অনুযায়ী মৃতদেহের অনেকখানি বদল ঘটে। আমি দেহটিকে গলিত অবস্থায় দেখতে পাই। অনেকখানি পচনক্রিয়া তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। চোখ বেরিয়ে এসেছে, দাঁত থেকে জিভ প্রায় এক ইঞ্চি বাইরে বেরিয়ে এসেছে। জিভ দাঁতে চাপা ছিল। গলার শ্বাসনলী থেকে বাঁয়ের দিকে চার ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ একটি অনুভূমিক বা হোরিজণ্টাল রেখাচিহ্ন লক্ষ করেছি। পচন শুরু হওয়াতে মগজ নরম হয়ে পড়েছে। দুটি ফুসফুস, যকৃৎ এবং বৃক্কতে অতিরিক্ত রক্ত জমেছে দেখতে পাই। হৃৎপিণ্ডের ডান দিকে রক্ত দেখতে পাই, বাঁ দিকে কোনো রক্ত দেখতে পাই না। পাকস্থলীতে যে ভাত দেখতে পাই তা মৃত্যুর তিন চার ঘণ্টা আগে খাওয়া হয়েছে, তার বেশি নয়। দেহটি যুবতীর, মৃত্যুর সময় তার স্বাস্থ্য অটুট ছিল। আমার মতে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়েছে। মৃত্যু ঘটাতে পারে এমন কোনো দেহাভ্যন্তরস্থ অসুখের সন্ধান আমি পাই নি। শ্বাসরোধের চিহ্ন হচ্ছে—গলার চিহ্ন, চোখ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা, জিভ ঝুলে পড়া, (দাঁতের চাপে যেমন ছিল,) এবং ফুসফুসদ্বয় রক্তে ভরে থাকা। শ্বাসরোধেই যে মৃত্যু আমার সে অনুমানের এইগুলির হচ্ছে কারণ। আমি এই মৃত্যুর অন্য কোনো কারণ অনুমানে

অক্ষম। যেসব শ্বাসরোধজনিত মৃত্যু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, সেসব দেহে আমি এর চেয়েও বলপ্রয়োগের চিহ্ন কম দেখেছি।

মিস্টার মিয়রফিল্ডকে :—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মৃত্যু শ্বাসরোধের পরে ঘটেছে এবং দেহটিকেও মৃত্যুর পরে বাক্সবন্দী করা হয়েছে। এতটা ছোট একটা বাক্সে দেহটি ঢোকাতে বেশ শক্তির দরকার হয়েছে। গলায় যে চিহ্ন দেখা গেছে তা দড়িতে ঘটেছে, আঙুলের চাপে নয়। এই দড়ি (দড়ি ঐ বাড়িতে পাওয়া, পুলিস কর্তৃক সামনে উপস্থিত করা হল)—এই দড়ি যদি গলায় বেষ্টন করা যায় এবং টেনে ধরা যায়, তা হলে শ্বাসরোধ হবে এবং যেমন দেখেছি তেমনি চিহ্ন পড়বে। মৃতদেহের ডান হাতে মুঠোয় এক গোছা কালো চুল ধরা ছিল।

বিচারকের প্রতি :—গলায় দড়ির চিহ্ন রেখা উপরের দিকে যায় নি যেমন ফাঁসিতে ঝুললে দেখা যেত।

(আসামীরা ডাক্তারকে কোনো প্রশ্ন করে নি।)

এদের পক্ষের উকিল খুব কৃতিত্বের সঙ্গে এদের সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু স্পেশাল জুরী খুব জোরালো গৌণ প্রমাণের উপর নির্ভর করে দুজনকে হত্যা অপরাধে অপরাধী স্থির করলেন, এবং তার ফলে দুজনেরই চরম দণ্ড হল।

১৮০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর সকালে বড় জেলের সম্মুখে এদের ফাঁসি হয়।

গৌণ প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত

আমি পরপর দুটি ঘটনার বিবরণ দেব। একটি পোলক স্ট্রীট ট্র্যাজিডি, আর একটা আমহার্স্ট স্ট্রীট রহস্য। কিন্তু তার আগে এই ভূমিকা। এই দুটি কেস্-এর তদন্ত যে খুব সাফল্যের সঙ্গে করা হয়েছিল তা বলছি না। পুলিস বরং দুটি ঘটনার তদন্তেই অতি নিন্দনীয়ভাবে গোলমাল করে ফেলেছিল। এবং এ জন্যও ঘটনা দুটি উল্লেখযোগ্য নয়। আমি দেখাতে চাই বহু অকাট্য গৌণ প্রমাণ যেখানে উপস্থিত, সেখানেও সেগুলি পরম্পর সাজিয়ে একটি সম্পূর্ণ কেস্ খাড়া করতে কত কৌশলের দরকার হয়। এরই দৃষ্টান্ত মিলবে এ দুটি কেস্-এ।

অনভিজ্ঞের কাছে আমি গৌণ প্রমাণের প্রকৃতি ও ক্ষমতা বিষয়ে কিছু

ব্যাখ্যা দেব। এক একটা কেস্-এ এমন সব প্রমাণ দেখা যায়, যার সবগুলিই পৃথকভাবে কোনো একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। প্রথমগুলির পরবর্তী প্রমাণগুলিকে সমর্থক প্রমাণ বা অতিরিক্ত প্রমাণ বলে।

এই সব সমর্থক-প্রমাণ যে কতখানি কার্যকারী তা পরীক্ষা করতে হলে প্রচুর সতর্কতা দরকার। যে সব প্রমাণ কেস্‌কে সমর্থন করছে শুধু সেইগুলিকেই নয়, যেগুলি কেস্-এর বিপক্ষে যাচ্ছে সেগুলিকেও বিবেচনা করে দেখতে হবে। তা ছাড়াও তৃতীয় কোনো অনুমান করা যায় কি না তাও ভেবে দেখা দরকার। তারপর যখন মনে হবে, আমরা সব রকম সম্ভাবনা পরীক্ষা করেছি, আর অবশিষ্ট কিছু নেই, সম্ভাবনা বা অনুমান কিছুই আর চলছে না, সমস্ত যুক্তি একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিচ্ছে, একমাত্র তখনই জোরের সঙ্গে বলা যাবে যে ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

সম্ভাব্য যুক্তিগুলি একত্র করে পরপর বিচার করলেও একই সিদ্ধান্তে টেনে নিয়ে যাবে। কোনোটা কোনোটাক দুর্বল না করে পরস্পরকে জোরালো করবে। কারণ এর প্রত্যেকটা পৃথকভাবেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে। কোনো একটি মাত্র যুক্তি যদি নিশ্চয়তাবোধক হয়, তা হলে সিদ্ধান্ত নির্ভুল হতে বাধ্য। এই রকম ক্ষেত্রে তাই প্রত্যেক পৃথক যুক্তির ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হিসাব করে দেখতে হবে। এইভাবে সমস্ত যুক্তিগুলি যদি একত্র অনুমানকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তখন ঐ নিশ্চয়তাবোধক যুক্তিটি সমষ্টি থেকে বাদ দিয়ে নিলে সেটি সমগ্রের চেয়ে বেশি সার্থক।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এতে এই জাতীয় বিচারের সঙ্গে যে অনিশ্চয়তা থাকে, তাও দেখা যাবে। মনে করা যাক কোনো একটি মানুষ একটি আঘাতের ফলে পথের উপর মরে পড়ে আছে। সেইদিনই সন্ধ্যায় একটি লোককে ঐ অঞ্চল থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখা গেল। এই লোকটির বাড়ি তল্লাস করে রক্তমাখা কাপড়, অথবা সম্প্রতি ধোয়া হয়েছে এমন ভিজে কাপড় পাওয়া গেল। মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়েছে এবং এসেছে এমন মানুষের পায়ের ছাপের সঙ্গে এই লোকটির পায়ের ছাপও মিলে যায়। তারপর যে অস্ত্রে মৃত লোকটিকে আঘাত করা হয়েছে সেই রকম আঘাত হানার অস্ত্র এই লোকটির কাছে ছিল সবাই জানে, কিন্তু এখন পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব এই ব্যক্তিই যে মৃত লোকটিকে হত্যা করেছে এমন সম্ভাবনা বেশি। প্রত্যেকটি ঘটনাই পৃথকভাবে ঐ লোকটির অপরাধের দিকে ইঙ্গিত

করে। সবগুলি ঘটনা একত্র বিচার করলেও, সেই যে অপরাধী, এ যুক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মনে করা যাক এই লোকটিকে ধরার পরে সে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দিচ্ছে—সে ছোরা হাতে পথে চলছিল, এমন সময় একটি লোক তাকে এসে আক্রমণ করে। এর ফলে একটা লড়াই হয় এবং সে তার আক্রমণকারীকে খুন করে। তারপর যখন বুঝতে পারল কাজটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে তখন ভয়ে সে ছোরা ফেলে বাড়ি পালিয়ে যায়। কোনো ভীরু স্বল্পভাষী লোকের মুখ থেকে এমন কথা শুনলে তা বিশ্বাসযোগ্য হতেও পারে কিন্তু এর বিপরীত সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করতে হলে লোকটির স্বভাবচরিত্রের পরিচয় নেওয়া এবং উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করা দরকার, অবশ্য যদি কোনো উদ্দেশ্য থেকে থাকে! যদি মৃতব্যক্তির টাকা-পয়সা চুরি গিয়ে থাকে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছে তা পাওয়া যায়, তা হলে সেই যে হত্যাকারী সে সন্দেহ আরও বাড়বে। কিন্তু যদি দেখা যায়, তার স্বভাবচরিত্র ভাল এবং হত্যার কোনো উদ্দেশ্য তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া না যায়, তা হলে সে যে বিবৃতি দিয়েছে তা মিথ্যা মনে না হতে পারে।

অপ্রচুর প্রমাণ থেকে যথাসম্ভব নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছনো অপরাধ অনুসন্ধানের কাজে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য সমস্ত জানা প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে একটা অনুমান খাড়া করলে, তবে তাকে ভিত্তি করে সন্ধানের ক্ষেত্র আরও বাড়ানো চলতে পারে। কিন্তু এই রীতিটি ডিটেকটিভ বিভাগের চেয়েও বিচার বিভাগের কাজে আসে বেশি। কারণ বিচার বিভাগের তাড়াতাড়ি বিচার শেষ করে ফেলার গরজ আবশ্যিক নয়। বরং বিচারকের রীতি হচ্ছে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া, যাতে অস্পষ্ট আলো ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, এবং শিথিল অনুমান দৃঢ় সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হতে পারে। ডিটেকটিভের কাজ তড়িদ্‌গতি। চিন্তার মতনই দ্রুত, কাজেই যে-ডিটেকটিভের বিচার ক্ষমতা নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, সে ডিটেকটিভই নয়। অপরাধ এবং অপরাধী সংক্রান্ত বিষয়ে সাফল্যলাভে দ্রুত বিচার ক্ষমতা এবং সুবিবেচনা-প্রসূত কর্মক্ষমতা বিশেষ দরকার।

পোলক স্ট্রীটের হত্যাকাণ্ড

১৮৬৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ভোর চারটে—কলকাতার এক ধনী ইহুদী বণিকের স্ত্রী মিসেস লী জুডাকে তাঁর শোবার ঘরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহে পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। অস্ত্রের আঘাত হাতে পায়ে মুখে সর্বত্র। তখনও তিনি মারা যান নি। তাঁর একজন চাকর এই অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে সাহায্যের জন্য লোক ডাকবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। পুলিসের তদন্তে জানা গেল—

মিসেস লী জুডা দুটি সন্তানসহ ৫নং পোলক স্ট্রীটে বাস করতেন। সন্তানদের মধ্যে একটি কোলের শিশু, অন্যটি চার বছরের মেয়ে। তাঁর স্বামী মিস্টার এন-ই জুডা, নাম করা ব্যবসায়ী। তিনি আফিঙের কারবারী, এই হত্যার সময় তিনি চীন দেশে ছিলেন। এ সময়ে ঐ বাড়িতে দুজন ধাই, একজন পাচক, একজন কোচম্যান, একজন সহিস, একজন বেয়ারা ও একজন মালপত্র বহনকারী সাধারণ ভৃত্য বাস করত। মিসেস জুডার সঙ্গে যাঁরা দেখাসাক্ষাৎ করতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর আত্মীয়—নাম নাসীম শ্যালোমি গাবৃবয়। কলকাতা শহরে তাঁদের সম্প্রদায়ে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি মিসেস জুডার কাছ থেকে বিদায় নেবার আধঘণ্টা অথবা কিছু বেশি সময় পরে তাঁর ভৃত্যেরা এই হত্যাকাণ্ড টের পায় এবং সোরগোল করতে থাকে। তাদের কাছ থেকে জানা গেল শিশুটি রাত আড়াইটের সময় কেঁদে ওঠে ও দুধের ধাই তাকে স্তন্য পান করায়। এই স্ত্রীলোকটির ঘুম সহজে ভাঙে না। ভাঙলেও চোখ থেকে সহজে ঘুম ছাড়তে চায় না। শিশুকে স্তন্য পান করানোর সময় সে লক্ষ করে, সে যখন ঘুমতে যায় তখন দুটো আলো জলছিল, কিন্তু জাগবার পরে দেখে একটা জলছে। একটা আলো নিবে গেছে বা কেউ নিবিয়ে দিয়েছে। তার কর্ত্রীর ঘর অন্ধকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাঁর গোঙানির শব্দ শুনতে পায় তিন চার বার। কর্ত্রী দুঃস্বপ্নের ঘোরে অমন চেঁচাচ্ছেন মনে করে সে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'মেমসাহেব, মেমসাহেব, জেগে উঠুন, নইলে ছোটরা ভয় পেয়ে যাবে।' কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে সে তার ঘরের অন্য বিছানা থেকে দ্বিতীয় ধাইকে ডেকে বলে, 'দেখ তো, মিসেস কেমন যেন করছেন, এমন

গোঁঙানি তো আগে শুনি নি কখনও।' কিন্তু সে কোন উত্তর দেয় না। হয়তো ঘুম ভাঙে নি, অথবা খুব ভয়ে কথা বলতে পারে নি। ইতিমধ্যে মিসেসের ঘরে ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার মতন শব্দ শুনতে পায়। বাচ্ছার দোলনাটা যেখানে ছিল শব্দটা সেইখানে হল। তারপর পুরুষের গলায় কে যেন বলে উঠল 'চুপ কর—' (যে কথাটা উচ্চারণ করল সেটি ইহুদির কথা) এতে সে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে চাকরদের ডেকে বলে, 'ওগো তোমরা দেখ তো কি হল।' তার চিৎকারে চার বছরের মেয়েটা বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে তার কাছে ছুটে আসে। আসবার পথে তার পা তার মায়ের দেহে লাগাতে সে দেখে তার মায়ের পায়ে দড়ি বাঁধা। সে তখন কেঁদে উঠে ধাইকে বলে, মায়ের পায়ের দড়িটা খুলে দাও। সে তখন কর্ত্রীর ঘরের দরজা দিয়ে তাঁর রক্তমাখা দেহটাকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখতে পায়। মুখেও ভীষণ কাটা। সে তা দেখামাত্র বারান্দায় ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'বাড়িতে কি সর্বনাশ হল গো।' ভৃত্য ছুটে এসে উপর তলায় কর্ত্রীকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে কপালে করাঘাত করে বলতে লাগল "এমন শয়তানি কে করল?" ধাই তাকে বলে, এখুনি ছুটে যাও মিস্টার এজেকিয়েলের কাছে, তাঁকে গিয়ে সব জানাও। —এজেকিয়েল নিহতা মহিলার শ্বশুর। তখন চারটে। তিনি খবর পেয়েই ছুটে এলেন ৫নং পোলক স্ট্রিটে, সেখানে মিস্টার এলাইয়াস গাব্বয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। (ইনি যে লোকটির ভাই, তাঁর ভূমিকা এ কাহিনীতে একটি প্রধান স্থান অধিকার করবে।)

মিসেস জুডার দেহটি বিছানার সঙ্গে সমকোণ অবস্থায় ছিল। পরিধানের বস্ত্রাদি রক্তে এমন ভিজে গিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যেন সেগুলো ঐ রঙেরই কাপড়। বিছানায় মশারি টাঙানো ছিল। বিছানা ও বালিশে ব্যাপকভাবে রক্তের চিহ্ন ছিল। দেয়ালে মেঝে থেকে তিন ফুট পর্যন্ত উপরের দিকে রক্ত ছেটানো ছিল। শিশুদের ঘরের দিকের দরজার ডান দিকের পাল্লাটা বন্ধ ছিল, তার নিচের অংশে রক্তের চিহ্ন দেখা গেল। বিছানার চাদরে নোংরা পায়ের চিহ্ন, অথচ অবাক কাণ্ড, বিছানায় ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন নেই। বালিশ, চাদর, যেমন পাতা ছিল তেমনি আছে। মশারিটি অবশ্য ছেঁড়া দেখা গেল। পুরুষের পায়ের কালো চামড়ার একপাটি জুতো বিছানার উপর পাওয়া গেল। বিছানার নিচে পাওয়া গেল একজোড়া রবারের জুতো। এর এক পাটির

উপরের দিকটায় রক্তের চিহ্ন আছে, কিন্তু ভিতরে নেই। এতে স্পষ্টই বোঝা গেল হত্যার সময়ে এ জুতো হত্যাকারীর পায়ে পরা ছিল, তা নইলে ভিতরেও রক্তের দাগ পাওয়া যেত। রক্তমাখা নোংরা ছেঁড়া একখণ্ড মলমল বিছানার উপরে বালিসের কাছে পাওয়া গেল।

দেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল বুকের বাঁ পাশে দুটি জায়গায় অস্ত্র বেঁধানো হয়েছে, তার একটা নবম ও দশম বক্ষাস্থির মাঝখানে। এই আঘাতে পীলেটা কেটে দুভাগ হয়ে গেছে। অন্য আঘাতটা একাদশ ও দ্বাদশ বক্ষাস্থির মাঝখানে। এই আঘাতে অন্ত্রের ঝিল্লি আবরণ কেটে আলাদা হয়ে গেছে। ডান গাল কেটে হাড় পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। ডান হাতের পেশী তিন জায়গায় ভাগ হয়ে গেছে, কব্জির টেণ্ডন বা কণ্ডরা কেটে গেছে এবং ডান চোখটি সম্পূর্ণরূপে ভেদ হয়ে গেছে। এই সমস্ত ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। মিসেস জুডার ঘর থেকে রক্তমাখা পায়ের চিহ্ন ঘোরানো সিঁড়ির উপর অবধি দেখে বোঝা যায় হত্যাকারী কোন্ পথে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

ভৃত্যকে জেরা করে জানা গেল: "রাত তিনটের সময় আমার মনে হল কে আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। জেগে উঠে দেখি নাসীম খ্যালোমি গাব্বয় আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। তিনি খুব ভীত এবং উত্তেজিত-কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'সদর দরজা খুলে দাও, তাড়াতাড়ি।' আমি আদেশ পালন করতে ছুটে গেলাম। কোচম্যান আর সহিস জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?' আমি বললাম, 'নাসীম সাহেব।' তিনি গেট পার হয়ে তাঁর রাধাবাজারের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। আমার চোখে তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে, তাই আমি তাঁর হাতে কোনো বাণ্ডিল, অথবা পায়ে জুতো ছিল কিনা নজর করি নি।

৫নং পোলক স্ট্রীট থেকে নাসীমের বাড়ি যেতে জনৈক মিস্টার মাইকেলের বাড়ি পার হয়ে যেতে হয়। তিনি রাত তিনটের কিছু পরে তাঁর জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি নাসীমকে তখন ঐ পথে খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে দেখেছেন। মনে হয়েছে তিনি বেশ উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন। গ্যাসের আলোটি মিস্টার মাইকেলের জানালার খুব কাছে অবস্থিত, সেই আলোতেই তিনি তাঁকে পরিষ্কার চিনতে পেরেছিলেন। নাসীম তাঁর বিশেষ পরিচিত বলেই তাঁর সব হাবভাবের সঙ্গে তিনি পরিচিত।

নাসীম ৫নং পোলক স্ট্রীট থেকে প্রায় ১৫০ গজ দূরে তাঁর রাধাবাজারের বাড়িতে বাস করতেন। বাড়িটি একটি ছোট দোতলা বাড়ি, এর মালিক তাঁর ভাই মিস্টার এলাইয়াস গাব্‌বয়। এটি তাঁর স্বদেশী গরিব আত্মীয়-স্বজনের জন্য আলাদাভাবে রেখেছিলেন। নাসীমের সঙ্গে তখন এইরকম তিনজন আত্মীয় বাস করছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে মার্কাস স্টীন, মার্কোভিচ এবং নাথান লেভি। নাসীম যখন ঐ পথে যাচ্ছিলেন তখন মাইকেল ভিন্ন আর সবাই ঘুমোচ্ছিলেন।

মার্কাস স্টীন বললেন : প্রায় সাড়ে তিনটের সময় আমি আমার বিছানায় ঘুমোচ্ছিলাম, এমন সময় মনে হল কে যেন আমাকে ধাক্কা মারছে। ঘর অন্ধকার ছিল, কে এমন করছিল দেখতে পাই নি। আমি জেগে উঠে দেখি নাসীম একপাত্র জল বয়ে নিয়ে চলেছে আমার ঘরের ভিতর দিয়ে তার ঘরের দিকে। সে সময়ে তার পরনে ছিল ঢিলে পাজামা, কিন্তু কোমর থেকে উপরের দিকে কোনো জামা ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে আরও একপাত্র জল নিয়ে তার ঘরে চলে গেল। আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম, সেখান থেকে নাসীমের ঘরের ভিতরটা দেখা যায় না, কিন্তু শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল নাসীম কাপড় ধুচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ পথে কে চিৎকার করে উঠল 'মানুষ খুন!' আর সঙ্গে সঙ্গে নাসীম আমার ঘরে ছুটে এসে আমার হাত ধরে খুব উত্তেজনার সঙ্গে বলল, 'তুমি সাক্ষী, আমি বাড়িতেই আছি।' পথের সোরগোল বেড়ে যেতে মার্কোভিচ ও নাথান লেভি ঘুম থেকে জেগে উঠল। আমি জানালা দিয়ে পোলক স্ট্রীটের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম বহু লোক মিসেস জুডার বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে। আমরা এই সব হল্লা শুনছিলাম আর লোকদের দেখছিলাম, এমন সময় নাসীম হিব্রু ভাষায় বলল, 'কাকুম, কাকুম, (অর্থাৎ র‍্যাব্বি, র‍্যাব্বি) তোমরা সাক্ষী, আমি সমস্ত রাত বাড়িতেই ছিলাম। তারপর সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এর পরে নাসীম গ্রেফতার হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি সমস্ত রাত বাড়িতে ছিলাম, এবং আমার সাক্ষী আছে।'—নাসীমের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য-মূলকভাবে মিসেস জুডাকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল। পুলিস প্রহরায় তাঁকে মৃতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল, এবং সেখানে তাঁর দেহ তল্লাস করা হল। তাঁর ডান হাতের তেলোয় এবং বুড়ো আঙুলে কয়েকটি

বাঁকা আঁচড়ের দাগ দেখা গেল। দাগ স্পষ্ট, যদিও রক্তপাত হয় নি। বাঁ হাতের কব্জিতেও ঐ একই রকম আঁচড়ের দাগ আছে কিন্তু সেগুলি আরও বেশি স্পষ্ট, এবং তা থেকে রক্ত পড়েছে বোঝা গেল। ডান হাঁটুতেও আঁচড়ের দাগ। সেখানে চামড়া ছড়ে গেছে। বেশি নয়, সিকি পরিমাণ জায়গায়। তার উপরে একখণ্ড কাপড় বাঁধা রয়েছে। এ রকম ক্ষত হাঁটুর নিচে এবং হাঁটুর মাথার উপরে। এই শেষের দাগটি খুব লাল এবং সাম্প্রতিক, কিন্তু শুকনো। তিনি বললেন বাথরুমে পড়ে গিয়ে এটা হয়েছে। হাতেও চক্রাকার অথবা ডিম্বাকার কালসিটে, কিন্তু কয়েকদিনের পুরনো। প্রথমে বললেন, তাঁর এক বন্ধুর কাজ এটি, কিন্তু পরে স্বীকার করলেন কয়েকদিন আগে মিসেস জুডা ঠাট্টাচ্ছলে কামড়িয়ে দিয়েছিলেন। শার্টের ডান হাতায় রক্তের চিহ্ন ছিল। বললেন, মশার কামড়ের ফলে হয়েছে। মিসেস জুডার খাটের নিচে যে রবারের জুতো পাওয়া গিয়েছিল, তা ওঁর পায়ে সুন্দর ফিট করল। প্রথমে সে জুতো যে তাঁর, সে কথা অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু নিহতার বোন তাঁর সামনেই বলল, ও জুতো ওঁরই। এই সময়ে মেয়েটি উপস্থিত ছিল সেখানে।

আসামীকে এবারে পুনরায় তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। এইখানে তাঁর ছাড়া জামা কাপড় সব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করা হল। একটা সম্পূর্ণ ভিজে ফেজ টুপি পাওয়া গেল। বোঝা গেল কিছুক্ষণ আগে ওটা ধোয়া হয়েছে। একটা শার্ট পাওয়া গেল ভিজে-ভিজে, দোমড়ানো এবং তাতে সন্দেহজনক চিহ্ন। মনে হল এতে ভিজে হাত মোছা হয়েছে। আরও একটি শার্ট পাওয়া গেল। সেটি অল্পক্ষণ ধোয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে বড় বড় রক্তচিহ্ন রয়েছে। কাপড়গুলি পরীক্ষা করলেন সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার ম্যাকনামারা। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বললেন, আসামীর দেহে যে সব আঁচড়ের চিহ্ন আছে, আর কাপড়চোপড়ে যে সব রক্তচিহ্ন পাওয়া গেছে —এ দুইয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। যে অস্ত্রে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য বাড়ি তল্লাশ করা হল, কিন্তু কোনো অস্ত্র পাওয়া গেল না। আসামীর একখানা ছোরা ছিল, কিন্তু তার পাত্তা মিলল না। সেখানা কোথায় গেল তা একটি রহস্য রয়ে গেল। একটা পাত্রে শুকনো চায়ের পাতা ছিল, তার মধ্যে একটা ছিপি আঁটা শিশি পাওয়া গেল। শিশিটি কাগজে জড়ানো ছিল, কাগজে ছাপা ছিল 'স্মিথ অ্যাণ্ড স্ট্যানিস্ট্রীট,' কিন্তু শিশির মাথায় যে

আবরণ থাকে, তা এতে ছিল না। শিশিতে যে লেবেল ছিল, তাতে লেখা 'ক্লোরোফর্ম'। মিসেস জুডার বিছানায় যে একখণ্ড ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, তা যে-কাপড় থেকে ছেঁড়া, সে রকম কোনো কাপড় এখানে পাওয়া গেল না।

আবার, যে কালো চামড়ার জুতো জোড়ার একখানা বিছানায় আর একখানা মেঝেতে পাওয়া গিয়েছিল, তার মালিক যে কে তাও বোঝা গেল না। অতএব আবও একবাব ৫নং পোলক স্ট্রীটে গিয়ে ঘরখানা তন্ন-তন্ন কবে পরীক্ষা করাব দরকাব হল।

যে দরজাটি দিয়ে হলের দিকে যাওয়া যায়, সেটি খোলা অবস্থায় ছিল। তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় সেই দিক দিয়েই হত্যাকারী (অথবা হত্যা-কারীরা) প্রবেশ করেছিল। রক্তের ছোপ এবং রক্তমাখা পায়ের দাগ এই দরজা থেকে হলঘরে কোণাকুণিভাবে দেখতে পাওয়া গেল। তারপর আর একটা ছোট ঘর, এবং তারপর ঘোরা সিঁড়ির আরম্ভ। এর পর থেকে আর চিহ্ন নেই। সিঁড়ি পরীক্ষা করা হল। এই সিঁড়ি থেকে নিচে নামলে বাড়ির উত্তর দিকের সরু পথ। উঠোন সাত-আট ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঐ গলির বিপরীত দিকে দেয়ালে ছোট একটি দরজা। ঐ সরু পথে পোলক স্ট্রীটে বেরোন যায়। এই ছোট দরজাটি দুদিক থেকেই তালাবন্ধ ছিল। দেয়ালে পায়ের চিহ্ন দেখা গেল ঐ দরজার কাছাকাছি জায়গায়। পথের দিকে দেয়ালের দু জায়গা পলেস্তারা খসে পড়েছে। ভিতরের দিকেও দুটি জায়গায় পলেস্তারা ভাঙা। বোঝা গেল, মই লাগানো হয়েছিল। বর্ষাকালে দেয়ালে যে সবুজ ছত্রাক জন্মে, তাও সম্প্রতি ঘষা লেগে কয়েক স্থানে উঠে গেছে দেখা গেল। সন্দেহ রইল না, দেয়ালের এইখানে সদ্য কোনো লোক উপর দিয়ে পারাপার করেছে। এই লোকটি নাসীম নন, কারণ নাসীম সদর দরজা দিয়ে আসা যাওয়া করেছেন। তা হলে কে এই লোক?

একজন দেশী কনস্টেবলের সে সময়ে টিরেটা বাজারের উত্তরের গলিতে বীট ছিল। সে ভোর ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে বাঁশের মই ঘাড়ে নিয়ে একটি লোক তার দিকে আসছিল দেখেছে। তার হাতে একটি বাণ্ডিল ছিল। তার পোশাক কেমন ছিল তা সে লক্ষ করে নি। পায়ে জুতো ছিল কি না তাও তার নজরে আসে নি। শুধু দেখেছে তার মাথায় একটা ফেজ টুপি

ছিল। আর একজন কনস্টেবলের ঐ সময়ে ডিউটি ছিল হরিণবাড়ি লেনে। সে ঐ লোকটিকে ছুটে যেতে দেখে তাকে থামতে বলে এবং কোথায় চলেছে জিজ্ঞাসা করে। সে বলে 'জাহাজে চলেছি মাল তুলতে।' তাকে অত্যন্ত বিচলিত বোধ হয়েছে! এবং সে মাতালের মতন টলছিল। সে তার সঙ্গের বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে দেখেছে, তা ভিজে ছিল। যাই হোক, সে তাকে যেতে দেয়। লোকটি কে, এবং কোথায় সে গেল, তখন তা কেউ বলতে পারল না।

আরও সন্ধান নিয়ে দেখা গেল মিসেস লী জুডার হত্যার অল্প কিছু দিন আগে নাসীমকে এজকিয়েল সার্বানী নামক এক দুশ্চরিত্র ইহুদীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা যেত। লোকটার জন্ম নীচ ঘরে এবং অবস্থাও খুব খারাপ। এমন একটা লোকের সঙ্গে নাসীমকে পথে ঘুরতে দেখে তাঁর নামেও খুব নিন্দে রটেছিল। এই ইতর লোকটির চরিত্র এতই খারাপ যে তার অসাধ্য কোনো কাজ ছিল না। নির্মম, জেদী চরিত্রের সার্বানী, অযোধ্যার রাজার অধীন সামরিক বিভাগে কাজ করত। কিছু অর্থলোভে তাকে দিয়ে নরহত্যা করানো এমন কঠিন কিছুই নয়। দুষ্কার্য করানোর পক্ষে এর তুল্য লোক আর নেই।

২৯শে সেপ্টেম্বর বুধবার, এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এরা দুজন একসঙ্গে সকালের খাওয়া খেয়েছে। এই শেষের দিন নাসীম তাঁর চাকর দাসরুকে ডেকে বলেন, 'এর সঙ্গে বাজারে যাও এবং এর যা দরকার সব কেন। তোমাকে বলছি, কারণ আজ ইহুদীদের একটি ধর্মীয় ভোজের দিন, আজ কোনো ইহুদীর পয়সা ছোঁয়া নিষেধ। কাজেই টাকা যা দেবার তুমি হাতে করে দেবে।' তারপর একটা পাল্কী ডেকে তাতে চেপে সার্বানী সার্কুলার রোডের মৌলালীর দরগার দিকে চলল, চাকরটি তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল। এখানে পাঁচ আনা দিয়ে একটা বাঁশের মই কেনা হল। মইটির মাপ বারো ফুট দৈর্ঘ্যে এবং প্রায় এক ফুট প্রস্থে। এটাকে বয়ে নেওয়ার জন্য একজন মুটে ঠিক করা হল। মৌলালীর দরগা থেকে ওরা টিরেটা বাজারে এসে এক বাক্স লুসিফার দেশলাই কিনল। এইখানে এসে চাকরটি মনিবের বাড়ির দিকে রওনা হল, সার্বানী মুটেকে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে গেল।

সেইদিনই সন্ধ্যা ছয়টার সময় এজকিয়েল আরও একবার নাসীমের বাড়ি এল মই সঙ্গে নিয়ে। পথে দাসরুর সঙ্গে দেখা। এজকিয়েল তাকে বলল

মইখানা এক জাহাজের ক্যাপটেনের জন্য দরকার। এ কথাটা তাকে জানাবার কোনো দরকার ছিল না যদিও। এজকিয়েল এবং নাসীম দুজনেই মই নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে এজকিয়েল আবার চাকরটাকে বুঝিয়ে দিল যে মইখানা ক্যাপটেনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা আধ ঘণ্টার জন্য বাইরে ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোথায় গিয়েছিল এবং কী করে এল? তারা কি মইটাকে স্থবিধামত কোনো স্থান রেখে এল, যাতে পরে সেখান থেকে যথাসময়ে নিয়ে যাওয়া যাবে?

কিন্তু সেসব কথা এখনকার মতন থাক। ২৭শে সেপ্টেম্বর নাসীমকে আমরা দেখেছি এজকিয়েলের সঙ্গে, ডালহাউসি স্কোয়ারে, ওষুধের দোকানে, ক্লোরোফর্ম কিনতে। এবং ২৮শে তারিখের রাত্রে দেখা যাচ্ছে, নাসীম তাঁর এক ভৃত্যের উপর ক্লোরোফর্মের ক্রিয়া পরীক্ষা করছেন। বলছেন, মজা করছেন একটা। মার্কাস স্টীনকে বলা হল, শুয়ে পড়। শোবার পর নাসীম রুমালে ক্লোরোফর্ম ঢেলে তার নাকে চেপে ধরলেন। মার্কাস অর্ধ অচেতন হল মাত্র, সম্পূর্ণ হল না। মেডিক্যাল বিভাগের লোকেরা বলেন, ক্লোরোফর্মে কেউ আংশিকভাবে, এমন কি প্রায় অচেতন হলেও, বাইরের কথা শুনতে পায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। স্টীনের মাথা তোলার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু তবু নাসীম ও নাথান লেভির ঠাট্টার হাসি বেশ শুনতে পেয়েছে। তাঁরা বলেছিলেন, ওকে মাতালের মতন দেখাচ্ছে, সে-কথাও সে স্পষ্ট শুনেছে। মার্কোভিচ অন্য ঘরে ছিল, সে বুঝতে পারছিল স্টীনকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা করছে, কিন্তু সে বেরিয়ে আসে নি। স্টীন চেতনা ফিরে পেলে সে তার কাছে এসে পরে সব শুনেছে।

এই ক্লোরোফর্মে আশানুরূপ ফল না পেয়ে নাসীম পরদিন সার্বানীর সঙ্গে লালবাজারের একটি দোকানে গিয়ে বলেন, এমন ক্লোরোফর্ম কিনতে চাই যাতে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ কাজ হয়। সার্বানী ঐ দোকানে নাসীমের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। নাসীম যখন ঔষধ বিক্রেতার কাছে বলছিলেন খুব কড়া ক্লোরোফর্ম চাই, যতদূর সম্ভব কড়া, তখন সে প্রাণ খুলে হেসেছিল। ভেবে দেখুন, যে লোকটা অন্যকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে সম্পূর্ণ অসহায় করে ফেলার কল্পনায় এমন হাসতে পারে সে কি জাতীয় জীব! দোকানে তখন একজনমাত্র লোক ছিল। মালিকের অনুপস্থিতিতে এ রকম বিপজ্জনক জিনিস দুজন অপরিচিত লোকের কাছে কি করে বেচে, তাই সে তাদের অন্য সময়ে আসতে

বলল। পরদিন যখন দোকানের মালিক উপস্থিত ছিলেন সেই সময় আবার ওঁরা এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মালিক বললেন কড়া ক্লোরোফর্ম তিনি বেচবেন না। একথা শুনে তাঁরা ওখান থেকে চলে গেলেন। অতঃপর তাঁরা ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের কাছে অবস্থিত স্কট টমসনের দোকানে গেলেন। এখানেও তাঁরা কড়া ক্লোরোফর্ম কিনতে পারলেন না।

নাসীম এবং সার্বানী হত্যার আগে, সন্ধ্যায় একসঙ্গে আহার করেছেন। টেবিলে খাবার পরিবেশনের আগে দুজনে নাসীমের ঘরে দরজা বন্ধ করে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে পরামর্শ করেছেন। খাওয়া শেষ হলে নাসীম একা বেরিয়ে যান। সার্বানী আধ ঘণ্টা সে-ঘরে বসে থাকে এবং অন্যান্য ইহুদীদের সঙ্গে মদ্যপান করে। তারপর সেও চলে যায়। তখন রাত প্রায় নয়টা।

এতটা তথ্য সংগ্রহ করার পর পুলিস সার্বানীকে গ্রেফতার করে। সে একটা নোংরা বস্তীর ঘরে বাস করত। সে ঘর অনুসন্ধান করা হল। সেও তখন উপস্থিত ছিল সেখানে। কয়েকখানা জামা পাজামা পাওয়া গেল, প্রত্যেকটিতে ইংরেজী এন-এস-জি লেখা। অর্থাৎ নাসীম শ্যালোমি গাব্‌বয়। সেগুলোও পরীক্ষা করা হল। একটি শার্ট ও একটি ঢিলে পাজামায় সবুজ ছত্রাকের চিহ্ন পাওয়া গেল, ৫নং পোলক স্ট্রীটের বাড়ির ভিজে দেয়ালে যেমন ছিল। পুলিস এই সবুজ চিহ্ন দেখেছে, এটি সার্বানী লক্ষ করা মাত্র সে পুলিসকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, সম্প্রতি এক ইহুদীর সমাধি অনুষ্ঠানে গিয়ে সেখানে একটি কবরের উপর বসাতে এই রকম দাগ লেগে গেছে। তৎক্ষণাৎ সন্ধান নিয়ে জানা গেল সম্প্রতি কোনো ইহুদীকেই কবর দেওয়া হয় নি। পরীক্ষা চলা কালে একটা ময়লা কাপড়ের বাণ্ডিল থেকে একটা শার্ট টেনে বার করা হল। দেখা গেল তার বুকের কাছ থেকে একটা অংশ ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। নিহত মহিলার বিছানায় যে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, তা এর সঙ্গে লাগিয়ে দেখা গেল, সম্পূর্ণ মিলে যায়। রাত্রে প্রহরারত সেই দুই কনস্টেবল, হত্যার রাত্রে ভোরে এই লোকটাকেই বাঁশের মই নিয়ে যেতে দেখেছিল এবং সনাক্ত করল।

এবারে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। এ হত্যায় একমাত্র সার্বানীরই যদি স্বার্থ থাকত, তা হলে তার উদ্দেশ্য বা মোটিভ হত লুণ্ঠন। কিন্তু ঘর থেকে কিছুই অপহৃত হয় নি। হত্যার সময় মিসেস জুডার হাতে ভারী ওজনের সোনার ব্রেসলেট ছিল, তা অপহৃত হয় নি। দামী হীরের

আংটি ছিল, সেটাও আঙুলেই ছিল, সোনার বালা, সোনার ঘড়ি ও চেন বালিশের নিচে ছিল, তাতেও কেউ হাত দেয় নি। ঘরের অন্যান্য জিনিসও চুরি হয় নি। তা হলে হত্যায় একমাত্র নাসীমেরই স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে, এবং সার্বানী কাজ করেছে তাঁর সাকরেদ হিসাবে। কিন্তু নাসীমের কী স্বার্থ আত্মীয় হত্যায়? কি তাঁর মোটিভ, কি তাঁর উদ্দেশ্য? এ কি ঈর্ষা?

এইবার তা হলে শুনুন। লীর স্বামী মিস্টার জুডা চীনদেশের সঙ্গে আফিঙের ব্যবসাতে লিপ্ত। তাঁর বড় ব্যবসা। তিনি লেনদেন ব্যাপারে কোনো এজেন্টের উপর ভরসা না করে নিজেই হংকং-এ যেতেন। এর জন্য তাঁকে বিদেশে থাকতে হত বেশির ভাগ সময় আর সেহেতু স্ত্রীকে সাহচর্য দিতে পারতেন খুবই কম। এই কারণে লী নিজের পরিচিতের সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন একক জীবনের অবসাদ দূর করার জন্য। নাসীম ৫নং পোলক স্ট্রীটের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। তিনি লীর আত্মীয়ও বটে। কাজেই তাঁর ঘন ঘন এ বাড়িতে আসা অপরের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। ধীরে ধীরে ওঁদের দুজনের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়। লীর একক জীবনের শূন্যতা নাসীম প্রণয় দিয়ে পুরণ করতে লাগলেন, অথচ কলঙ্ক রটল না। নাসীমের যাতায়াত ক্রমেই বেড়ে গেল, এবং শেষে ভৃত্যদের কাছেও ব্যাপারটা অজানা রইল না। যখন ওঁদের এই অবৈধ প্রণয় শুরু হয়, তখন থেকে নাসীম সদর দরজার চাবি ভৃত্যের কাছ থেকে চেয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন। যখন ইচ্ছা গেট খুলে আসতেন এবং যখন ইচ্ছা বন্ধ করে চলে যেতেন। লীর অনুমতিক্রমেই এটা ঘটেছিল। নাসীম কখনো কখনো রাত দুটো পর্যন্ত লীর ঘরে থাকতেন, এবং অনেক সময় তিনটে চারটে পর্যন্ত। একটা খালি ঘরে তাঁর নিজের জিনিসপত্রও কিছু রেখেছিলেন। এই জিনিস রাখা লীর স্বামীও জানতেন। তিনি এর মধ্যে যে খারাপ কিছু থাকতে পারে এমন মনে করতে পারেন নি।

মিসেস লী জুডার অন্যান্য আত্মীয়রা ওঁদের এ ব্যাপারটা জানতেন কিনা তা ঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু দেখা যায়, তাঁর শ্বশুর গত ছমাস এ বাড়িতে পদার্পণ করেন নি। একবার মাত্র কিছু কফি ওজন করানোর জন্য তিনি এ বাড়িতে এলেও উপরে ওঠেন নি। লী অবশ্য নিহত হবার চার পাঁচ দিন আগে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং সে সময় তাঁর শ্বশুর তাঁর সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন।

মিসেস লী জুড়া নিহত হবার আগে কতদিন ধরে ঠিক সেই ফরাসী প্রবাদ—'স্ত্রীলোক এক স্বামীতে খুশি থাকলেও একপ্রণয়ীতে খুশি থাকে না'—সার্থক করেছিলেন তা জানা গেল না। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে নাসীম যখন নিজেকে লীর একক প্রণয়ী কল্পনা করে প্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন, তখন তিনি এক সময় বুঝতে পারেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জুটেছে। নিজের স্ত্রী হোক বা প্রণয়িনী হোক, প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী জুটলে তাকে সহ্য করা কোনো হিব্রুর ধাতে নেই। এবং সে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূর করতে রক্তপাত করা তার স্বভাবসিদ্ধ। এমন অবস্থায় ঠাণ্ডা-মাথা ইংরেজ বিবাহবিচ্ছেদ আদালতে দাওয়া করে। স্পর্শচেতন ফরাসী ব্যবহার করে তার সরু তরোয়াল—প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে বিঁধিয়ে দেয়। কিন্তু হিব্রু তার স্ত্রী বা প্রণয়িনীকে খুন না করা পর্যন্ত তৃপ্ত হয় না।

যাই হোক, এতক্ষণ আমরা সযত্ন তদন্তের ফলে যেটুকু জানতে পেরেছি তা বিবৃত করলাম। আসামীর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করা গেছে, তা সবই গৌণ প্রমাণ। এবারে, যে সব ঘটনা ও পরিস্থিতি এতক্ষণ বিবৃত করলাম, প্রমাণগুলি পরীক্ষার পর তা বিচার করব। আর এসব প্রমাণ প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে কিভাবে খাপ খায় তাও দেখব। আর সব শেষে দেখব তা থেকে কোন্ সিদ্ধান্তে এসে পৌছনো যায়। আমি ধরে নিচ্ছি এই বিশ্লেষণ উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারগণ মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। কারণ তাঁদের সম্মুখে কোনো জটিল কেস উপস্থাপিত হলে তাঁরা উল্টো দিক থেকে কিভাবে তার প্রমাণগুলি বিশ্লেষণ করতে হয় তা বোঝেন। প্রথমে প্রশ্ন তোলা যাক—মিসেস লী জুডার হত্যাকারীরূপে আসামী নাসীম গাববয় যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে এ কেস্ থেকে আমরা কি কি দেখতে পাব বলে আশা করতে পারি? তারপর দেখব প্রমাণগুলি তাঁকে অপরাধী প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট কি না। এ কেস্-এ দেখা যাচ্ছে যা আমরা দেখব আশা করছি, এবং যা দেখতে পাওয়া গেছে, এ দুয়ের মধ্যে একটা মিল আছে। আমরা আশা করব যে—

প্রথম :—যে-নাসীম একটি নারীকে একদা ভালবাসতেন তাকে তিনি একা খুন করবেন এটি প্রায় অসম্ভব। শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে দুর্বলতা আসতে পারত, কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি এ কাজে একজন সাকরেদ খুঁজেছেন।

অতএব আমরা নিহতা নারীর বিছানার পাশে দ্বিতীয় লোকের জুতো

দেখতে পেয়েছি। আর পেয়েছি শার্ট থেকে ছেঁড়া একখণ্ড কাপড়—এবং এই শার্ট নাসীমের নয়।

দ্বিতীয় :—আমরা আশা করব তিনি এমন একটি লোককে তাঁর এই দুষ্কার্যের সহকারী বানাবেন, যে লোকটি তাঁর সমধর্মী, এবং চরম দরিদ্র, নাসীমের চেয়ে পদে খাটো, শক্তিশালী এবং রক্তপাতে অভ্যস্ত। এবং তার সঙ্গে তাঁর পূর্বে বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি হত্যার আগে যে লোকটির সঙ্গে তিনি হত্যার ব্যবস্থা করেছিলেন তার স্বভাবচরিত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে ঠিক আমরা যা প্রত্যাশা করি সেই মতো। এবং সেই লোকটির সঙ্গে আগে এক টেবিলে খেয়েছেন, একসঙ্গে বেরিয়ে গেছেন, একসঙ্গে ফিরে এসেছেন, প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে টাকা দিয়েছেন, এবং তাকে পোষাক দিয়েছেন। অথচ কেন, তার কোনো সদুদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় :—যদি হত্যা হয়ে থাকে, তবে আমরা আশা করব, যে লোকটি ঐ বাড়িতে দিনে রাত্রে অবাধে যাতায়াত করতেন তিনি সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন, এবং যে লোকটি ও বাড়ির সবার অপরিচিত সে পিছনের দরজা দিয়ে যাতায়াত করবে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাসীম সাধারণ সিঁড়ি এবং দরজা দিয়ে যাতায়াত করেছেন এবং তাঁর সাকরেদ গোপন পথে এসেছে এবং গিয়েছে, এবং এই কাজের চিহ্ন তার পোষাকে পাওয়া গেছে। পিছনের দরজার পথে তার রক্তাক্ত পায়ের ছাপও দেখা গেছে। তারপর পাওয়া গেছে বাঁশের মৈ-এর দাগ।

চতুর্থ :—সাকরেদের উঠোনের দেওয়ালের উপর দিয়ে আসা যাওয়ার ব্যাপারে কিছু পূর্বপ্রস্তুতি দরকার, এবং আমরা তার প্রমাণ আশা করব।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাসীম তার চাকরকে সঙ্গে দিয়ে এজকিয়েলকে সার্কুলার রোডের মৌলালী-কা-দরগায় পাঠিয়েছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। হত্যার আগের দিন এটি ঘটেছে।

পঞ্চম :—আমরা আশা করব হত্যাকারী রাসায়নিকের সাহায্যে স্ত্রীকে হত্যার আগে অচেতন করার চেষ্টা করবেন, যাতে হতভাগীর কান্না বা আর্তনাদ কেউ না শুনতে পায়।

অতএব আমরা নাসীম ও এজকিয়েলকে কয়েকটি ওষুধের দোকানে একত্র

যেতে দেখেছি, এবং আমরা সেই ক্লোরোফর্মের শিশিটি লীর ঘরে পড়ে থাকতে দেখেছি।

ষষ্ঠ :—নাসীম ক্লোরোফর্মের ক্রিয়া কিভাবে প্রকাশ পায় তা জানতেন না, কাজেই তিনি যে এই জিনিসটি আগে পরীক্ষা করে দেখবেন, এটা আশা করব।

অতএব দেখছি, সে ক্লোরোফর্ম তাঁরই বাড়ির একটি লোকের উপর পরীক্ষা করেছেন, এবং বলেছেন এটি তিনি করেছেন মজা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

সপ্তম :—আমরা আরও আশা করব—এই অপরাধী দুজন তাঁদের দুষ্কার্যের নানা চিহ্ন ফেলে যাবেন— যথা কাপড়-জাতীয় অথবা পরবার অন্য কিছু।

অতএব আমরা শার্ট ছেঁড়া একখণ্ড কাপড় এবং একজোড়া জুতো দেখতে পেলাম, যে ঘরে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেই ঘরেই। শার্ট-এর অংশটা এজকিয়েলের এবং জুতোজোড়া নাসীমের।

অষ্টম :—আমরা নিহত ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই-এর চিহ্ন দেখতে আশা করব। এক্ষেত্রে যদিও লড়াই সমানে সমানে নয়, কারণ যাকে খুন করা হয়েছে সে স্ত্রীলোক, কিন্তু তবু লড়াই তো কিছু হবেই।

অতএব আমরা দেখছি, ওঁদের হাতে আঁচড়ের চিহ্ন আছে। হতভাগী মৃত্যুর আগে যে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন তারই চিহ্ন ওগুলি। তাঁর আঙুলের আঙটি অথবা হাতের নখের। খাটের ধারে হাঁটুর ঘষা লাগলে যেমন ক্ষত হওয়া উচিত ঠিক তেমনি ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল নাসীমের হাঁটুতে, আর এজকিয়েলের দেয়াল টপকানোর চিহ্ন দেখা গেল তার পায়ে।

নবম :—নাসীমের পোষাকে রক্তচিহ্ন আশা করব, এবং বাড়ি গিয়ে প্রথমেই তিনি সেই চিহ্ন ধোয়ার চেষ্টা করবেন, আশা করব।

অতএব দেখলাম নাসীম লীকে হত্যা করে বাড়ি ফিরেই কাপড় ধুয়েছেন। ভিজে কাপড় তল্লাসীতে পাওয়া গেছে। ভিজে ফেজ টুপিও দেখা গেছে।

দশম :—নাসীম বা এজকিয়েলের কাছে আমরা হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র পাবার আশা করব।

অতএব আমরা একখানা অস্ত্র (ছোরা) যা লীর গায়ের ক্ষতের মতন ক্ষত করতে সমর্থ, লীর ঘরে পেলাম এবং সে অস্ত্র নাসীমের, কিন্তু হত্যার দু-তিন দিন পরে তা জানা গেল, অথচ তা তাঁর কাছে এখন নেই কেন তা বোঝা গেল না।

একাদশ :—নাসীম অপরাধ করে থাকলে মিথ্যা বলে অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করবেন।

অতএব আমরা দেখলাম তিনি রাত ১০টা ১০॥ টার মধ্যে সবাইকে বেশ জানিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে ঢুকেছেন, এবং পরে কাউকে না জানিয়ে গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। তারপর যখনই তাঁর উপর সন্দেহ পড়েছে, তখনই তিনি বাড়ির লোকদের ডেকে বলেছেন, তিনি সমস্ত রাত বাড়িতেই ছিলেন তার তারা সাক্ষী। তারা যেন পুলিসকে এ কথা বলে।

আমরা একটি বড় অপরাধের ইতিহাস রচনা করতে বসি নি। আমরা শুধু ডিটেকশন-কৌশলের একটি পাঠ চিত্রিত করলাম, অতএব যেখানে পুলিসের কর্তব্য শেষ হয়ে জাজ এবং জুরির কর্তব্য আরম্ভ হল, সেইখানেই কাহিনী শেষ করা গেল।

আমহার্স্ট স্ট্রীট রহস্য

১৮৬৮ সালের ১লা এপ্রিল, রাত দুটো। একটা দেশী কনস্টেবলের আমাহার্স্ট স্ট্রীটে তখন পাহারা দেবার পালা। এই উপলক্ষে সে নানা গলি-ঘুঁজির মধ্যেও উঁকি মেরে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু কোথাও অস্বাভাবিক কোনো কিছুই তার নজরে আসে নি। সে তার শেষ সীমা অবধি ঘুরে ঘুরে যখন ফিরে আসছিল, তখন সে তার 'বুল্‌স আই' লণ্ঠনের সাহায্যে দেখতে পেল বড় রাস্তায় উপরে স্ত্রীলোকের কাপড়ের একটি বোঝা পড়ে আছে। এটি দেখল সে পথের পশ্চিম ধারে। কাছে এসে দেখল কাপড়ের বাণ্ডিলের মধ্যে একটি দেশী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। তার বাঁ হাতখানা বাঁ কোমরের নিচে চাপা, আর ডানহাতখানা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ডানধারের কানের কাছে উঠে আছে। তার গলায় গভীর কাটা চিহ্ন, তা থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, আর সে রক্ত পথের উপরে যেখানে দেহটি পড়ে আছে সেইখানেই জমে আছে। কনস্টেবলের বীটের শেষ প্রান্ত থেকে ফিরতে মাত্র একঘণ্টা সময় লেগেছে, এরই মধ্যে এই কাণ্ড। স্ত্রীলোকটির পরনে একখানা শাড়ী, তারই একপ্রান্ত গায়ে জড়ানো, গায়ে একটি বডিস মাত্র। শাড়ী ঘাড়ের কাছে বেশি পাকিয়ে গেছে এবং তার একটা অংশ কাটা জায়গার ভিতরে ঢুকে গেছে। মাথার বাঁ পাশ থেকে একহাত দূরে

একখানা ছুরি পড়ে আছে। এ ছুরি বিশেষভাবে নাবিকেরা ব্যবহার করে। এই ছুরির হাতলটা ছিল ঘাড়ের দিকে ফেরানো এবং তার ফলায় যে রক্ত ছিল তা শুকনো। দেহটি যেখানে পাওয়া গেল তার সামান্য দূরে পশ্চিমদিকে খানিকটা রক্ত দেখা গেল। রক্ত যেটুকু জায়গা জুড়ে ছিল সে জায়গার মাঝখানের রক্ত তখনও তরল ছিল, ধারগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। দেহের উত্তরদিকে ছ'সাত পা তফাতে নানা স্থানে রক্তচিহ্ন দেখা গেল, তাদের আকার একটাকা পরিমাণ থেকে এক সিকি পরিমাণ। কিন্তু এই রক্তচিহ্ন এবং ঐ দেহের মধ্যবর্তী স্থানে কোনো রক্ত দেখা গেল না। পায়ে কোনো জুতো ছিল না, অথচ মাটির দাগ বা ধুলোও ছিল না। তাতে বোঝা যায় সে মৃত্যুর আগে পথে হাঁটে নি। পায়ের নানা চিহ্ন দেখে মনে হল জুতো পরা অভ্যাস ছিল। অথচ দেহের কাছাকাছি কোথাও জুতো পড়ে থাকতে দেখা গেল না। বডিস ছোট ছোট হুক দিয়ে বুকের কাছে আঁটা, এবং রক্তচিহ্ন বাদে বডিসটি পরিষ্কার, মনে হয় নতুন ধোয়া। বিপরীত দিকে পথের অপর পাশে গ্যাসের আলো জ্বলছিল। রাত দুটো এবং তিনটের মধ্যে কনস্টেবল সে পথে যাতায়াত করেছে, কিন্তু কোনো চিৎকার বা গাড়ি চলার শব্দ শুনতে পায় নি। অন্য একজন কনস্টেবলের জিম্মায় দেহটি রেখে বীটের কনস্টেবল থানায় গেল দারোগাকে জানাতে। তখন রাত সাড়ে তিনটে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের ট্রিনিটি গীর্জার ঘড়িতে চারটে বাজছে সেই সময় ইন্সপেক্টর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন মাটিতে যে রক্ত পড়ে ছিল তার উপর তিনটি আঙুলের চিহ্ন শুকিয়ে আছে, কিন্তু ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন নেই। দেহের প্রায় পঁচিশ পা তফাতে একখানা রুমাল পাওয়া গেল। সেখানা ব্যবহৃত রুমাল, নতুন ধোয়া নয়। তার একটা কোণ পাকানো। মনে হয় তাতে চাবি বাঁধা আছে। সেটা খুলে চাবি পাওয়া গেল। হাত-পা ঠাণ্ডা হলেও নড়ানো যায়, শক্ত হয়ে যায় নি তখনও। কানে এক জোড়া সোনার ইয়ার-রিং, হাতে বিয়ের আংটি দেখা গেল। বোঝা যায় স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্টিয়ান, এবং বিবাহিত। আর দেখা গেল প্রবালের নেকলেস। এটি গলায় দুই পাকে জড়ানো ছিল, কিন্তু তার একটি পাক ছুরির আঘাতে ছিঁড়ে গেছে, এবং একটি অংশ গলার কাটা অংশে ঢুকে গেছে। ৭টার সময় দেহটিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মড়া-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে মোট চারদিন রাখা সত্ত্বেও কেউ তাকে সনাক্ত

করতে পারল না। ইতিমধ্যে দেহে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে কাজেই দেহটিকে কবর দেওয়ার আদেশ দেওয়া হল। অবশ্য ২রা এপ্রিল তারিখে মেসার্স স্যাচে অ্যাণ্ড ওয়েস্টফিল্ড কর্তৃক দেহটির ফোটোগ্রাফ তুলিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই ফোটোগ্রাফের কপি শহরে ও শহরতলীতে প্রচারের ব্যবস্থা করা হল।

পুলিস সার্জন মেডিক্যাল কলেজে মরণোত্তর পরীক্ষায় এই বিষয়গুলি জানতে পারলেন।—ছুরির আঘাত বাঁদিকের চোয়ালের নিচে থেকে গলা কেটে ডানধার পর্যন্ত চলে গিয়েছে এবং সেদিকও ঠিক চোয়ালের কোণে নিচে গিয়ে শেষ হয়েছে। কণ্ঠের উপরের কার্টিলেজ বা কোমলাস্থি কেটে গেছে এবং গলার দুপাশ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মাঝখানের আঘাত মেরুদণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছে এবং সেখানে হাড়ে ছুরির দাগ লেগেছে। ছুরির আঘাত পাঁচ ইঞ্চি চওড়া এবং দুই ইঞ্চি গভীর। ছুরি এর বেশি আর যেতে পারে নি। ক্ষতচিহ্ন সরল, তাতে বোঝা যায় আঘাত একটিমাত্রই দেওয়া হয়েছে। আঘাত ডানদিকে এসে যেখানে শেষ হয়েছে, তা থেকে প্রায় এক ইঞ্চি দূরে খানিকটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। মনে হয় ছুরির ধারে কিছু জায়গা ভাঙা ছিল, অথবা হতভাগীর গলায় যে প্রবালের হার ছিল তার সঙ্গে ছুরি বেধে ও রকম হয়েছে, অথবা হঠাৎ মাথা ঘুরিয়েছিল বলে হয়েছে। কিন্তু ছুরির ধার কোথাও ভাঙা ছিল না, মনে হয় আঘাতের সময় স্ত্রীলোকটির মাথা ফেরানোতে এ রকম হয়েছে। ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণে মৃত্যু ঘটেছে। এবং গলা ঐ ভাবে কাটার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু ঘটেছে। সম্ভবত মেয়েটি পড়ে যাবার আগে এলোমেলোভাবে কয়েক পা ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিস সার্জনের মতে এটা সম্ভব নয়, এবং পথে রক্তের চিহ্ন থেকেই সেটা বোঝা যায়। দেহের অবস্থা, বিশেষ করে বাঁ হাত ও বাঁ পাশের অবস্থা দেখে বোঝা যায়—আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই বাঁয়ের দিকে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

এটা যে হত্যাকাণ্ড না হতে পারে, এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত করা যায়: দেহে বলপ্রয়োগের কোনো চিহ্ন নেই। লড়াই-এর কোনো চিহ্ন নেই। যেখানে দেহটি পাওয়া গেছে সেখানে চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে পড়েছে এমন চিহ্ন নেই। চুল বা পোষাক এলোমেলো হয় নি। গলায় আঘাতের আগে এক বা একাধিক লোক তাকে জাপটে ধরলে তার চিৎকারে পাড়ার লোক জেগে উঠত।

অপরপক্ষে এটা যে আত্মহত্যার ঘটনা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কাটার স্থান দেখে। নিজহাতে গলা কাটলে এতটা নিচে আঘাত পড়ত না। তা ভিন্ন হাতে এত জোর হত না যার দরুন ছুরি কোমলাস্থি কেটে মেরুদণ্ডের হাড় পর্যন্ত পৌছতে পারে। উপরন্তু তার কোনো হাতেই রক্তের চিহ্ন নেই।

দেহ সমাধিস্থ করার পরে অনুসন্ধান চলতে লাগল। নিহত স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য শহর ও শহরতলীতে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হল, যে খবর দিতে পারবে তাকে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশেষে ৮ই এপ্রিলের অপরাহ্ণে কিছু সংবাদ মিলল। ১০০ নং বৈঠকখানা লেনে মিস্টার হ্যারিস নামে একজন লোক থাকতেন, তিনি ঐ স্ত্রীলোকটির একখানা ফোটোগ্রাফ দেখে বললেন, এ যে আমাদের কম্পাউণ্ডে বাস করত সেই মেয়েটার মতন দেখতে। আমি জোর করে ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার স্ত্রী বলতে পারবেন।

মিসেস হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করা হল। তিনি ফোটোগ্রাফ দেখামাত্র মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। যে গুদামঘরে সে বাস করত সেইখানে দেখা গেল দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। জানালাগুলিও বন্ধ। কিন্তু তালায় একটুখানি টান দিতেই তালাটা খুলে এলো, বোঝা গেল আদৌ তা চাবিবদ্ধ ছিল না। ঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল বিছানা পাতার পর সেখানে আর কেউ শোয় নি। মশারি খাটানো ছিল। তার তিন দিক বিছানার নিচে গুঁজে দেওয়া আছে। একটি দিক গোঁজা হয় নি, তার ভিতর দিয়ে একজন লোক অনায়াসে ভিতরে ঢুকতে বা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সে বিছানাতে কেউ শুয়েছে এমন চিহ্ন নেই। ঘরের মধ্যে আসবাব ও কাপড় চোপড় দেখা গেল। একখানা ফোটোগ্রাফ পাওয়া গেল। ওখানা যার ছবি, পুলিসমহলে সে পরিচিত, তার নাম কিংস্‌লি। পরিচয়ের প্রথম সূত্র পাওয়া গেল এইখানেই।

বীটের কনস্টেবল শুনতে পেল সব কথা। সে তৎক্ষণাৎ এসে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তা হলে জানি ওর কথা। মাধবচন্দ্র দত্ত এ স্ত্রীলোকটিকে ঐখানে নিয়ে আসে। আমার বীট ছিল তখন, আমি দেখেছি। মাধব দত্তর বৌবাজার স্ট্রীটে একটা দোকান আছে। তাকে আমি ভাল রকম চিনি। কয়েক বছর হল তার সঙ্গে আমার পরিচয়।

মাধব দত্তকে গ্রেফতার করা হল। তাকে সওয়াল করে জানা গেল, মিস্টার হ্যারিসের কম্পাউণ্ডে অবস্থিত গুদামঘরে সে ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু তার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এ রকম জবাব যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা তাকে বুঝিয়ে বলা হল, কিন্তু তবু সে বলতে লাগল তাকে সে চেনে না। তারপর আরও চেপে ধরাতে সে স্বীকার করল জিগজ্যাগ লেন থেকে সে তাকে নিয়ে এসেছিল। ঐ লেনের বাড়িটি সে দেখিয়ে দিল। বাড়িটি মিস্টার রোজারিও নামক একটি লোকের। এইখান থেকে পুলিস স্ত্রীলোকটির নাম ও অন্যান্য কয়েকটি খবর জেনে নিল। স্ত্রীলোকটি রোজ ব্রাউন নামে পরিচিত ছিল। মিস্টার রোজারিওর বাড়িতে সে প্রায় দুই মাস হল বাস করছিল। তারপর এইখান থেকে সে মিস্টার হ্যারিসের কম্পাউণ্ডে উঠে যায়। যখন রোজ ব্রাউন জিগজ্যাগ লেনে ঘর নেয়, তখন তার সঙ্গে একটা বাণ্ডিল মাত্র ছিল, কোনো আসবাবপত্র ছিল না। কয়েক দিন বাস করার পর সে একখানা খাট কিনে নেয়। তার যে অলঙ্কারপত্র ছিল তা সে মিসেস রোজারিওর কাছে গচ্ছিত রাখে। একজোড়া বালা দাম হবে ৪৫০ টাকা, সোনার খোদাই করা একটি লেডিস হান্টিং ওয়াচঘড়ি, তার সঙ্গে একটি চেন, দাম ১২০ টাকা। ১২ টাকা দামের একজোড়া সোনার ইয়ার-রিং। দেশী ডিজাইনের একটি সোনার নেকলেস দাম ৫০ টাকা। চারিটি হীরে বসানো সোনার আংটি, দাম ২০০ টাকা, আর একটি বিয়ের আংটি।—এই তার মোট অলঙ্কার। মোট দাম হবে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। রোজারিওর বাড়িতে সে যতদিন ছিল, ততদিন মাধবচন্দ্র দত্ত তার কাছে প্রায়ই আসত। দুমাস শেষ হবার আগেই সে বাড়ি ছাড়ে। প্রথম মাসের ভাড়া দেয় মাধব দত্ত, দ্বিতীয় মাসের যে কদিন ছিল সে কদিনের ভাড়া রোজ ব্রাউন দেয়। ঐ বাড়ি ছাড়ার চারদিন আগে সে তার অলঙ্কারগুলি মিসেস রোজারিওর কাছ থেকে চেয়ে নেয়। নেবার সময় মাধব সেখানে উপস্থিত ছিল না, অতএব সে কিছু জানতে পারে নি। এ বাড়ি ছাড়ার কারণ স্বরূপ মাধবের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যে কিংসলি তাকে খুঁজছে। কিংসলির সঙ্গে তার আগে ভাব ছিল। তা ছাড়া জিগজ্যাগ লেনের বাড়ি যথেষ্ট নিরাপদ কিংবা অন্তরালে নয়। অতএব কিংসলি তাকে খুঁজে বার করবে সহজেই, তাকে পেলে সে তাকে চলন্ত রেলগাড়ি থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কারণ রোজ ব্রাউন তার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে তাকে ছেড়ে

এসেছে। কিন্তু মাধব এসব কথা অস্বীকার করল, বলল, সে এমন কথা রোজ ব্রাউনকে কখনো বলে নি। অবশ্য একথা যে সে রোজ ব্রাউনকে বলেছে এমন সাক্ষী কেউ নেই। মিসেস রোজারিওর কাছে সে এইসব বলেছিল মাত্র। অতএব একথা সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে একথা ঠিক যে নিহত স্ত্রীলোকটি কিংসলিকে ভীষণ ভয় করত, কাজেই তার প্রতিহিংসা সম্পর্কে সে নানারকম বিভীষিকা দেখে থাকবে। রোজ ব্রাউনের মনে কি তার এই শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে কোনো পুর্বাভাস জেগেছিল?

রোজারিও পরিবারের কাছ থেকে রোজ ব্রাউন এবং মাধব দত্ত সম্পর্কে যতটা খবর জানবার তা জানা হয়ে গেলে মাধবকে মিস্টার হ্যারিসের কম্পাউণ্ডে নিয়ে যাওয়া হল। এখানে এসে দেখা গেল কিংসলিকে পুলিসে গ্রেফতার করেছে। রোজ ব্রাউনের কাপড় জামার মধ্যে কিংসলির ফোটো-গ্রাফ পাওয়ার ফলেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে হাওড়া থেকে ধরে আনা হয়েছে। এর পর পুলিস মাধব দত্তের বাড়িতে খানাতল্লাশি চালাল। সেখানে তার বাক্সে একটা চাবি পাওয়া গেল, এবং সে চাবি রোজ ব্রাউনের ঘরের তালায় ঠিক ফিট করে। যে বাক্সে ঐ চাবি পাওয়া গেল তার মধ্যে পাঁচ ছয় শত টাকার অলঙ্কার ছিল। তার দোকানে কিছু পুরনো নাবিকের পোষাক পাওয়া গেল, কিন্তু কোনো ছুরি পাওয়া গেল না। এ কথা বলা আবশ্যক যে মাধব নিলাম থেকে পুরনো ছুরি চামচে এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়মিত কিনত। এই জিনিসগুলি সবই মৃত নাবিকদের ব্যবহার্য জিনিস। তার দোকানে লেমনেড সিগার প্রভৃতির সঙ্গে ও সবও বিক্রয়ের জন্য খোলা অবস্থায় সবার সামনে ধরা থাকত। তার দোকান ছিল লালবাজারে।

মাধবচন্দ্র দত্তের বাড়ি তল্লাশির পর পুলিস হাওড়াতে কিংসলির বাড়ি খানাতল্লাশিতে গেল। কিংসলি তার পকেট থেকে চাবি বার করে গেট খুলে দিল। চটের একটা ব্যাগে ব্যবহার করা কাপড়জামা পাওয়া গেল। তার মধ্যে একটি শার্ট পাওয়া গেল, সেটি দুমড়ানো, এবং তার হাতা ভিজে। সম্প্রতি ধোয়া হয়েছে বোঝা গেল। কিংসলি বলল, সে গত গ্রীষ্মকালের পর থেকে আর এ জামা পরে নি। সে সাধারণত ফ্ল্যানেল শার্ট পরে। হাতা ভিজে লাগছে কেন, তা সে বলতে পারে না। কিন্তু পুলিস সার্জনের মতে রোজ ব্রাউনকে পিছন দিক থেকে অস্ত্রাঘাত করা হয়েছে, অতএব ভিজে

হাতার ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল। কিংসলির বাইরের অফিসঘর তল্লাশি করা হল, সেখানে স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য কয়েকটি পোষাক পাওয়া গেল, তাতে রক্তের দাগ ছিল। এর কি ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় কিংসলি বলল, এগুলি রোজ ব্রাউনেরই বটে, কিন্তু এগুলি ব্যবহার করত মারিয়া স্মিথ, কারণ রোজ ব্রাউন তার আশ্রয় থেকে চলে গেছে। মারিয়া স্মিথ একদিন মাতাল হয়ে গুঁতো খেয়েছিল তার ফলে রক্ত বেরিয়ে পোষাকে লেগে গেছে। এই ঘরে দুটো চাবি পাওয়া গেল। একটা বারান্দায় হাত ধোয়ার স্ট্যাণ্ডের উপর। এই চাবিটি রোজ ব্রাউনের ঘরের তালায় লাগে। গেটের তালা ভিন্ন কিংসলির বাড়িতে আর একটি মাত্র তালা ছিল, আর তার চাবি ছিল কিংসলির পকেটে।

মারিয়া স্মিথ কিংসলির রক্ষিতা-রূপে তার সঙ্গে বাস করত, কিন্তু ঝগড়া বাধাতে সম্প্রতি সে তার আশ্রয় ছেড়ে গেছে। তাকে খুঁজে বার করা হল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ২৫শে মার্চ থেকে ৫ই এপ্রিলের মধ্যে কোনো রাত্রে সে বাড়ির বাইরে ছিল কি না। মারিয়া স্মিথ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, মাসের শেষ দিন সন্ধ্যায় সে বাড়ি ছেড়ে যায় এবং পরদিন ফেরে।' তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, 'মার্চ মাস মোট কদিনে?' সে বলল, 'ত্রিশ দিনে।' তাকে বলা হল সে ভুল করছে, মার্চ মাস একত্রিশ দিনে, তখন সে বলল, 'হতে পারে, কিন্তু আমার মনে আছে, মাসের শেষ দিন সে সমস্ত রাত্রি বাইরে ছিল।' মারিয়া স্মিথ এরপর জিজ্ঞাসা করল, এ সব প্রশ্ন তাকে কেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। এবং ঐ সঙ্গে বলল, কিংসলি তার উপর যেভাবে অত্যাচার করেছে, তাতে এ সব কথায় যদি তার ফাঁসি হয় তবে সে খুব আনন্দের সঙ্গে ফাঁসির দড়ি টানতে রাজি আছে। মারিয়াকে বলা হল, যে স্ত্রীলোকটি কিংসলির সঙ্গে আগে বাস করত, সে খুন হয়েছে।

পরদিন কিন্তু মারিয়া স্মিথ আগের দিন যা বলেছিল তার সত্যতা অস্বীকার করল। সে বলল ঐ বিবৃতি দেওয়ার সময় তার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কিংসলি কোনো দিনও বাড়ির বাইরে রাত কাটায় না, বাইরে গেলে রাত বারোটার আগেই সে ফিরে আসে। তার সঙ্গে সে যতদিন বাস করছে—এই তার অভিজ্ঞতা।

কিংসলির বাড়িতে খানাতল্লাশি চালিয়ে যখন সবাই ফিরে আসছিল তখন পথে আসামী মাধব দত্ত নিজে থেকেই একটি বিবৃতি দিল। কিন্তু সে

কিছু বলবার আগে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হল, সে যা কিছু বলবে তা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা হবে। সে বলল, "জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে রোজ ব্রাউন আমার কাছে একদিন সকালে এসে বলল, সে কিংসলির কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, এবং জিগজ্যাগ লেনে মিসেস রোজারিও নামের এক স্ত্রীলোকের বাড়িতে বাস করছে। সে আমাকে বলল তাকে যেন আমি মাঝে মাঝে দেখে আসি। আমি তাই করতাম। একদিন তার খরচের জন্য আমি তাকে কিছু টাকা দিলাম। কয়েকদিন পরে সে আমার দোকানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল এবং জানতে চাইল আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে কিংসলির দেখা হয়েছে কি না। সে শুনেছে কিংসলি জিগজ্যাগ লেনে তার বাসার কাছেই একটি মদের দোকানে নিয়মিত যায়। তাই তার ভয়, কোনো দিন হয়তো কিংসলি ধরে ফেলবে সে কোথায় থাকে। মিস্টার রোজারিও জানতে পেরেছেন যে সে তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এখানে লুকিয়ে আছে, তাই তিনি তাকে অন্যত্র উঠে যেতে বলেছেন।

"এ কথা শোনার পর আমি তাকে মিস্টার হ্যারিসের কাছে নিয়ে যাই এবং তার জন্য একখানা ঘর ভাড়া করি। ৩১শে মার্চ তারিখে সে আমাকে বলল, এ ঘরে এতদিন লুকিয়ে আছে, তাতে সে বড়ই পীড়া বোধ করছে। তাই সে আমাকে অনুরোধ জানায়, তাকে নিয়ে আমি যেন একটু বাইরের খোলা হাওয়ায় ঘুরিয়ে আনি। তখন আমি তাকে বললাম তোমার ঐ খ্রীস্টানী পোষাকে তোমার সঙ্গে বেরুলে যদি আমার কোনো হিন্দু আত্মীয় দেখে ফেলে তা হলে আমার জাত যাবে। সে তখন আমাকে একখানা শাড়ী আনতে বলল। আমি শাড়ী এনে দিলাম। বিকেল সাড়ে চারটের সময় শাড়ী নিয়ে তার ঘরে গেলাম, এবং তাকে শাড়ী দিয়ে আমি বাড়িতে খেতে চলে যাই। আমি পুনরায় তার কাছে ফিরে আসি রাত নটার সময়। এই সময় তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাব এই আমার ইচ্ছা। তার দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু একটু কড়া নাড়তেই সে ভিতর থেকে বলল, সে এখন পোষাক বদলাচ্ছে, আমি যেন বাইরে একটুখানি অপেক্ষা করি। কিছু পরেই সে শাড়ী পরে বেরিয়ে এলো, তার হাতে একখানা রুমাল, তার এক কোণে সে তার তালা বন্ধের পর চাবিটি বেঁধে রাখাল। তার কানে ছিল একজোড়া ইয়ার-রিং আর ছিল বিয়ের আংটি। প্রবালের নেকলেস গলায় ছিল কি না তা আমি লক্ষ করি নি। কিন্তু সে বলেছিল, গলায় নেকলেস আছে। তার

পায়ে জুতো ছিল না। পৌনে দশটার সময় আমরা তার ঘর থেকে বেরুলাম। বেরিয়ে বৌবাজার স্ট্রীটে এসে পড়লাম, এবং সেখান থেকে ওয়েলিংটন স্ট্রীট কলেজ স্ট্রীট হয়ে কলুটোলা স্ট্রীট। বললাম রাত বেড়ে যাচ্ছে, এবারে ঘরে ফেরো। কিন্তু বাইরে ঘুরতে তার যে আনন্দ হয়েছিল, খোলা হাওয়া নিশ্বাসে টানায় সে যে স্ফূর্তি অনুভব করছিল, তা সে সহজে ছেড়ে ঘরে যেতে চাইল না। রাত বেশি হলেই বা কি, সঙ্গে তো পুরুষ আছে, অতএব সে নিরাপদ।

'আমি তার ইচ্ছায় কলুটোলা স্ট্রীট দিয়ে চিৎপুর রোডে গিয়ে পড়লাম। তারপর বৌবাজার হয়ে পশ্চিমে চলতে থাকলাম। তারপর লালবাজার। যখন আমরা সেণ্ট জেভিয়ার্স গীর্জায় পৌঁছেছি তখন রাত একটা। রোজ ব্রাউন তখন ক্লান্ত, আমি তার কয়েক পা আগে আগে চলেছি। হঠাৎ পিছন ফিরে তার দিকে তাকাতেই দেখি কিংসলি পিছন দিক থেকে তার ঘাড়ে হাত রেখেছে। রোজ ব্রাউন সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে 'বাপ-রে-বাপ!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। (বাংলাদেশে লোকেরা ভয়ে, বিস্ময়ে বা বেদনায় এই কথা বলে চেঁচায়।) কিংসলির গায়ে ঘন ব্রাউন রঙের পোষাক, মাথায় ফেল্ট হ্যাট। হ্যাটের চারিদিকে সিল্কের পাগড়ি জড়ানো। কাছেই জোরালো গ্যাসের আলো ছিল, সেই আলোয় তাকে চিনতে পারলাম। কিন্তু তার পা টলছিল কি না তা লক্ষ করি নি। আমি এই দৃশ্য দেখা মাত্র সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম। কারণ আমার সঙ্গে তার রক্ষিতা ঘুরছে, এতে সে উত্তেজনাবশে আমাকে আর অক্ষত দেহে ফিরতে দিত না। আমি গিয়ে পৌঁছলাম এক সরু গলির মধ্যে। সেখান থেকে লুকিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগলাম। ওরা আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে চলল, একটু চাপা স্বরে কথা বলছিল। চলছিল ধীরে ধীরে। তারা আড়ালে যাবার পর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। পরদিন শুনলাম একটি স্ত্রীলোক খুন হয়েছে আমহার্স্ট স্ট্রীটে। তার গলা কাটা। কিন্তু আমি সন্দেহ করি নি যে সে স্ত্রীলোক রোজ ব্রাউন, তাই আমি এ বিষয়ে আমার কিছু করণীয় আছে বলে ভাবি নি। কিন্তু আমি যে স্ত্রীলোকটিকে মিস্টার হ্যারিসের কম্পাউণ্ডের ঘরে নিয়ে তুলেছিলাম, তার সম্পর্কে যখন পুলিস আমাকে জেরা করছিল, তখনও কেউ আমাকে বলে নি যে সে খুন হয়েছে।'

একটা জিনিস এখানে লক্ষ করতে হবে—মাধব দত্ত এই যে বিবৃতি দিল,

এটি সে আগে দেয় নি। সে এই বিবৃতিটি দিয়েছে কিংসলির হাওড়াস্থিত বাড়ি সার্চ হওয়ার সাত ঘণ্টা পরে। এবং হাওড়া যাবার আগে মিস্টার হ্যারিসের বাড়িতে কিংসলির সঙ্গে মাধবের দেখা হয়েছে। তখনও সে, ৩১শে মার্চ রাত্রে (অথবা আরও নির্ভুলভাবে বললে ১লা এপ্রিল সকালে) এই লোকটার সঙ্গে যে তার লালবাজারে দেখা হয়েছিল, সে-কথা বলে নি। হতে পারে কিংসলির সামনে কিছু বলতে তার মনে ভীরুতা জেগেছিল, কিন্তু সেখানে তো পুলিস ছিল, তাতে তার ভয় দূর হওয়া উচিত ছিল।

আমি কয়েকটি মাত্র মন্তব্য অতঃপর করব। তারপর মাধব এবং কিংসলি—এই দুজনের মধ্যে কে রোজ ব্রাউনকে হত্যা করেছে, এ রহস্যের মীমাংসা বুদ্ধিমান পুলিস অফিসারের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

আগের কেস্-এ লী জুডা হত্যার ব্যাপারে দুজন লোক একযোগে কাজ করেছে। বর্তমান কেস্-এ সে রকম নয়। এখানে রোজ ব্রাউন হত্যায় দুজন লোককে পৃথকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, কারণ একযোগে মিলিতভাবে হত্যার প্রশ্ন এখানে নেই। মাধবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রমাণ, সে বলেছিল, হত্যার রাত্রে রোজ ব্রাউন খালি পায়ে অতটা পথ হেঁটেছিল, অথচ খুন হওয়ার পর রোজ ব্রাউনের পায়ে খালি পায়ে হাঁটার চিহ্ন ছিল না। অর্থাৎ ধুলো বা কাদা কিছুই ছিল না। খালি পায়ে হাঁটলে কখনও তা হতে পারত না। অতএব রাত্রে খালি পায়ে পাঁচ ছ' মাইল হাঁটার কথা যদি বানানো হয়, তা হলে কিংসলির সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল, এ কথাও বানানো। তা যদি হয়, তা হলে রোজ ব্রাউনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও হত্যার মধ্যে বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি। সে যা বলেছে তার চেয়ে সে অনেক বেশি জানে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

মাধবের বিরুদ্ধে আরও একটা ঘটনা আছে। রোজ ব্রাউনের অলঙ্কার খুঁজে পাওয়া যায় নি, এবং তারও অর্থ পরিষ্কার নয়। মাধব জানে, তার ৬০০ কিংবা ৭০০ টাকার অলঙ্কার ছিল। রোজারিওর বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে উঠে যাওয়া এই মাধবের প্ররোচনাতেই ঘটেছে। ঐখানে মাধব অনেকের পরিচিত ছিল, কিন্তু যেখানে রোজ ব্রাউনকে নিয়ে তুলল, সেখানে মাধবকে কেউ চিনত না। কিংসলি যে রোজ ব্রাউনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং পেলে তাকে যে খুন করবে, এটি মাধবই রোজ ব্রাউনকে বানিয়ে বলেছে।

কিন্তু মাধবই যদি রোজ ব্রাউনের হত্যাকারী হয়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য বা মোটিভ হচ্ছে লুণ্ঠন। আবার কিংসলি যদি হত্যাকরী হয়; তবে তার মোটিভ হচ্ছে ঈর্ষা, অথবা প্রতিহিংসা, অথবা দুইই।

মনে রাখা দরকার যে, কিংসলি অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক, চরিত্র-হীন, এবং মাতাল অবস্থায় স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যন্ত পাশবিক হয়ে ওঠে। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সে একজন নিম্নস্তরের লোক। এরাই অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। রোজ ব্রাউনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, অতএব স্ত্রীলোকটি তাকে ছেড়ে যাওয়াতে সে যে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এমন কথা ভাবা অসঙ্গত নয়। রোজ ব্রাউন নিজে তার সঙ্গকে ভীষণ ভয় করত, এবং সে তাকে ছেড়ে আসার পরেও, তাকে ঐ লোকটা খুঁজে বার করতে পারে এই ভয় তার মনের আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছিল। 'সে যদি ধরতে পারে তা হলে সে আমাকে খুন করবে'—এ কথা সে অনেকবার বলেছে। এই লোকটাকে সে যমের মতন ভয় করত। এর ভয়েই সে ভাবতে পেরেছিল যে, সে যদি এই পশুটার কাছ থেকে অন্যত্র পালিয়ে যায় তা হলে পরে ধরতে পারলে তাকে মেরেই ফেলবে। এবং এ রকম ভয়ও সে দেখিয়েছিল। এবং এরকম করা যে তার পক্ষে সম্ভব এবিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। রোজ ব্রাউনের পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর আর কেনো অর্থ করা যায় না।

এ সবই বিবেচনা করে তবে প্রশ্ন উঠবে কে হত্যাকারী? মাধব, না কিংসলি?

পুর্বের কেস্-এ যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে সেটি এই কেস্-এও অনুসরণ করতে হবে। তাই আমি প্রস্তাব করছি, যে সব ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হল তা দুটি কলমে পাশাপাশি সাজাতে হবে। এবং দুদিক থেকেই যে সিদ্ধান্ত হয় তাও লিখতে হবে। তা হলে সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যাবে হত্যাকারী কে।

বিশ্লেষণ :

প্রমাণ সমর্থিত ঘটনা ॥ তা থেকে যে সিদ্ধান্ত হয় তা।

যে অপরাধের কোনো কিনারা হয় না

এদেশে মানুষ খুন করা সবচেয়ে নিরাপদ, এ কথা যতই অবজ্ঞার কথা হোক, এতে আনন্দ পাওয়া যায় না। কারণ কথাটা সত্য। কোনো হিন্দু তরুণীবিধবা অবৈধ প্রেমে প্রলুব্ধ হল। তারপর কিছুকাল প্রেম গোপনে চলতে থাকল। শেষে কিন্তু এমন অবস্থা হল যাতে আর গোপন রাখা যায় না। তখন আত্মীয়স্বজনের সমাজের কাছে মাথা নিচু। তখন তারা আত্মসম্মান বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠল। কিন্তু কপালে করাঘাত করা ভিন্ন তাদের আর কি করণীয় আছে? (এ রকম হলে ইউরোপীয়ান অন্যের মাথায় আঘাত হানত, নিজের কপালে নয়।) আত্মীয়েরা গোপনে এইভাবে হায় হায় করতে থাকে এবং ব্রিটিশ সরকার সতীদাহ উঠিয়ে দিয়েছে বলে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে কলঙ্ক যাতে বাইরে না রটে তার জন্য যত রকম সতর্কতা প্রয়োজন তা অবলম্বন করে। ভ্রান্ত বিধবাটিকে 'তীর্থযাত্রা'য় পাঠিয়ে দেয়, এবং সেখানে তার পাপমুক্তির যে সব ব্যবস্থা করা হয়, তার পরেও যদি মেয়েটি বেঁচে থাকে, তখন সে তার এই হীন প্রায়শ্চিত্তের পর ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু এই পাপভার মুক্তির পরীক্ষায় কজন বাঁচতে পারে? দেশী দাই এ সব ব্যাপারের কতটুকু জানে? তাই তার ব্যবস্থায় অধিকাংশ হতভাগীরই প্রাণ যায়। আর যে হতভাগীর এই স্থূল ব্যবস্থাতেও ভারমুক্তি ঘটল না, তার অবস্থা যে আরও কত শোচনীয় তা ভাবতেও কষ্ট হয়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারে এমন ঘটনা ঘটলে তার পরিণাম আরও খারাপ। এ রকম ক্ষেত্রে সতীদাহের ব্যবস্থা করা হয়। এ 'সতী' অনুষ্ঠানকে ঠাণ্ডা সতী বলা হয়। একটা আয়োজন করা হয়, হতভাগীকে নেশার দ্রব্য খাইয়ে অচেতন করে তাকে পরে বিষ খাওয়ানো হয়। তারপর তাড়াতাড়ি তাকে শ্মশানে নিয়ে পোড়ানো হয়। জীবন সম্পূর্ণ লুপ্ত হবার আগেই শ্মশানে নেওয়া হয়, কারণ বাড়িতে মারা গেলে সবার পাপ হবে। কোনো ধর্মপ্রাণ হিন্দু সেজন্য মুমূর্ষুকে আগে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যায়, সেখানে গিয়ে মারা গেলে আর কোনো পাপ হয় না। এই জাতীয় 'ঠাণ্ডা সতী'তে ডবল

হত্যার অপরাধ। কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর হয় যখন, যাকে মারতে নেওয়া হচ্ছে, সে সব ষড়যন্ত্রটা টের পেয়ে যায়। সে তখন বিষ খেতে অস্বীকার করে। সে তখন হয় তো তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বিলাপ করে বলে, "মা, আমাকে বাঁচাও, আমার প্রতি দয়া কর।" কিন্তু তার উত্তরে মা বলে, "খেয়ে ফেল মা, খেয়ে ফেল, তোর মায়ের ইজ্জত বাঁচা, বাবার সম্মান রক্ষা কর।" ভ্রূণ হত্যার কাজ খুবই প্রচলিত রয়েছে এ সমাজে, এবং এ কাজ কেন করা হয়, তাও সবার জানা। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুবিধবা কোনো সন্তানের জন্ম দিলে নবজাতকের মুখে উনুনের ছাই ভরে দিয়ে তার শ্বাসরোধ করা হয়। এইভাবে ধর্ম বাঁচিয়ে যে শিশুকে হত্যা করা হল তাকে ভাঙা ইটের টুকরো দিয়ে ঝুড়িতে পুরে শিশুর মাতামহী গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসে।

এখানকার সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা নেই। তারা সবাই অন্তঃপুরের আড়ালে বাস করে, তাই এমন কথা শুনলে ইংরেজরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে এমন দেশে এটা সম্ভব। আর যারা অপরাধী তারা নিষ্কৃতি পায়, কারণ এ ধরনের শিশু বিনাশে ধর্ম রক্ষা পায় এবং এটি এদেশের অনেকদিনের আচরিত প্রথা। পর্দার আড়ালে কত পাপানুষ্ঠান হচ্ছে তা তো আর গোপন থাকে না, কিন্তু কজন সামাজিক সংস্কারকের এ প্রথার বিরুদ্ধে লড়বার সাহস আছে? এমন কি জেলাশাসকও এ রকম কেস খোলা চোখে দেখতে চান না, কারণ এ ধরনের কেস হাতে নিলে নানা ঝঞ্ঝাট, এর ভিতরে যে গোপনীয়তা আছে তা টেনে বার করার চেয়ে এর থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকাই তাঁর পক্ষে বেশি নিরাপদ মনে হয়।

আর গ্রাম্য পুলিসের লোকের কথা না বলাই ভাল। সাধারণত তারা অত্যন্ত নির্বোধ, অতএব তাদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না। তা ছাড়া যেখানে সে কম নির্বোধ, সেখানে তার চতুর ব্যবহারে সমাজেরই ক্ষতি হয়। সে অপরাধীর কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা খেতে থাকে, এবং অপরাধ যেমন চাপা ছিল তেমনি চাপাই থেকে যায়। সে পয়সার বশ, এবং ঘুস দিয়ে তাকে দিয়ে না করানো যায় এমন কাজ নেই। এবং যেখানে তার জাতের সঙ্গে কর্তব্যের বিরোধ ঘটে সেখানে তাকে আদৌ বিশ্বাস করা চলে না। সে অসহায় এবং দুর্বলের উপর অত্যাচার চালাতে বড়ই পটু। ধনীর কাছে সে জোড়হাত। কিন্তু বুদ্ধিমান এবং কর্তব্যপরায়ণ হলেই বা তাকে দিয়ে কি লাভ হচ্ছে?

বিধবার পদস্খলন আইনের চোখে অপরাধ নয়। কোনো বিধবার সন্তান সম্ভাবনা কি করে ঘটল তা তদন্ত করার ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো অধিকার নেই। যখন পেটের সন্তান নষ্ট করার আশঙ্কা থাকে, তখনই কেবল সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট জানবেন কি করে যে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে? জানবেন, কারণ বেনামা চিঠি আসে তাঁর নামে। যে সব চিঠির অভিযোগ সত্য বলে ধারণা হয়, সেই সব চিঠি পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং এ ক্ষেত্রেও কেস জরুরি জ্ঞান করা হয় না, এবং সম্ভবত সেটা ঠিকই করা হয়। তদন্তে এত দেরি হয় যে ভ্রূণহত্যার একশ'টি ঘটনার মধ্যে পঁচিশটির বেশি পুলিস প্রমাণ করতে পারে না। আমি এ বিষয়ের একটা অংশমাত্র প্রকাশ করলাম, বিস্তারিত বলতে গেলে পাঠকের হৃৎকম্প উপস্থিত হবে, রক্ত হিম হয়ে যাবে।

আমি এ কথা স্বীকার করছি, অন্য দেশেও এমন সব সামাজিক দুর্নীতি আছে যা কোনো সরকারের সাধ্য নেই যে ঠিকভাবে দমন করতে পারে। কিন্তু হতভাগ্য বিধবাদের এ দেশে যে অমানুষিক অত্যাচার এবং অবিচার সহ্য করতে হয়, আমার বিবেচনায় তার কিছু প্রতিকার অন্তত করা উচিত, এবং করা অসাধ্য নয়। পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত করা উচিত, এবং যে লোকটি বিধবা বিবাহ করবে সেও যাতে জাতিচ্যুত না হয় এমন আইন করা উচিত। সরকার নিরাপদে এ পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু এর বেশি যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রগতিশীল সংখ্যালঘু হিন্দুরা যাই বলুন, কোনো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসকই শিশুবিবাহ রোধ করে সমস্ত দুর্নীতির মুলোচ্ছেদে সোজা লেগে যেতে পারেন না। এই সংস্কার সমাজের ভিতর থেকেই আরম্ভ হওয়া উচিত। আমাকে হয় তো বলা হবে, সরকার তো বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা আইনসিদ্ধ করেছেন। সে কথা সত্য, কিন্তু উচ্চ জাতি এর বিরোধী। একটি সাম্রাজ্যের গভর্মেণ্টের কি অবস্থা ভেবে দেখুন।

ইংরেজ সরকারী লোকের পক্ষে বলা অবশ্যই সহজ যে বিবাহিত বিধবা এবং তার আত্মীয়েরা উচ্চজাতিকে অগ্রাহ্য করে চলুক। কিন্তু যারা এমন কথা বলে তারা জানে না 'মহাজন'-এর অভিশাপ কাকে বলে। সেই বিধবা এবং তার স্বামী এবং অধিকাংশ সময়ে এদের আত্মীদের সবাই বিষের মতন পরিত্যাগ করবে।' কাজেই দুজনের সৎসাহসের জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক দুঃখ ভোগ করবে। জীবনে শুধু নয় মরণেও তাদের দুঃখ ভোগের অন্ত

থাকবে না। তাদের কোনো অনুষ্ঠানে উঁচু জাতের হিন্দুরা আসবে না, তারা তাদের কোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হবে না। কর্ষণদাস মুলগি এক বিধবাকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু তার দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। তার বউ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করত, ওগো, আমরা কবে জাতে উঠব, তখন কর্ষণদাস শুধু অসহায়ভাবে কাঁদত, কোনো জবাব দিতে পারত না তার কথায়। সামাজিক শাসন এমনই ছিল কঠোর। এই যে জাতিচ্যুত অবস্থায় সবার পরিত্যক্ত হয়ে থাকার ব্যাপার এটি ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষের কল্পনার বাইরে। মৃত্যু এর চেয়ে অনেক ভাল। বিধবা বিবাহ অন্তে স্বামী স্ত্রীর সুখে থাকার পালা প্রায় সব ক্ষেত্রেই জন্মের মতন ঘুচে যায়। তাদের নানাভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। তাদের উপার্জনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়, এমন কি তাদের উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয় এবং এই নতুন জীবনের শিক্ষা না থাকাতে স্বামী স্ত্রী সম্পূর্ণ হতাশভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগোতে থাকে। পরস্পরের সুখের আশা মিলিয়ে গিয়ে এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাতে থাকে। তারপর এইভাবে সামাজিক নির্যাতনের চরম সহ্য করে অনেকে কুপথগামী হয়। জাতের কত বড় গৌরব! তবে এত বাধা ও অত্যাচার সত্ত্বেও এ দেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, তাতে প্রমাণ হয় এটি সময়োচিত প্রয়োজনের দাবিতেই হচ্ছে, এবং এর শেষ সাফল্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। গভর্মেণ্ট যদি এইটুকুমাত্র করে যে, বিধবা বিবাহে কেউ বাধা দিতে পারবে না, এবং যদি কোনো 'মহাজন' এই রকম বিয়ে যে করেছে তাকে জাতিচ্যুত করে তা হলে পাবলিক প্রোসিকিউটর তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে, তা হলে সংস্কারের কাজ দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে মানুষের স্বাধীনতার উপর এই যে অত্যাচার এ কি কি কারণে সম্ভব হল? এর উত্তর হাতের কাছেই আছে। হিন্দু বিবাহ রীতি বহু শতাব্দীর শাস্ত্র-শাসিত রীতি। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ রীতি এতকাল ধরে পালন করে আসছে। হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ—প্রত্যেক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে দিতেই হবে। বাড়িতে যদি কোনো পিতার অবিবাহিতা কন্যা থাকে তবে সে শুধু যে জাতিচ্যুত হবে তাই নয়, তার ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে তাই নয়, তার অবস্থা এর চেয়েও খারাপ হবে। এই ঘটনা একটি ধর্মীয় পাপ বলে গণ্য হবে। শুধু ইহজগতের নয়, পরজগতের জন্যও তার কি শাস্তি হবে তা তাকে জানানো হবে। অর্থাৎ চিরনরক ভোগ। অতএব

প্রত্যেক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে দিতেই হবে যেমন হয়েছিল লক্ষ্মীবাঈয়ের বেলায়।

এ বিষয়ে আমি একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ১৮৮২-৮৩ সালে কলকাতায় মিশনারিদের দশম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সেই সময় মহীয়সী ইংরেজ মহিলা মিসেস ইথারিংটন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—

'গভর্মেন্টের বিগত সেন্সাস রিপোর্টে এই ভয়ঙ্কর জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতে একুশ নিযুতের বেশি (২১ মিলিয়নের বেশি) বিধবা আছে। এর অর্থ কি, তা কি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি? ভারতের সমস্ত জনসংখ্যার সম্পর্কে প্রতি পাঁচজন পুরুষের মধ্যে একজন করে বিধবা আছে। এর মধ্যে ছোট পুরুষ শিশুকেও ধরা হয়েছে। আমি যদি এ বিশ্বাস করি তা হলে কি আমার খুব ভুল হবে যে, এই একুশ নিযুত বিধবার অর্ধেক সংখ্যাই যথার্থ অর্থে স্ত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করে নি? তারা নিতান্তই বালিকা, তারা বালক স্বামীর নামমাত্র স্ত্রী হয়েছিল—এবং এই হাজার হাজার শিশু-বিধবা স্বামীকে চেনে না, হয় তো একবারের বেশি দেখেও নি? আমাদের মধ্যে যারা তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের দেখার সুযোগ পেয়েছি (বিধবাদের আবার বাড়ি আছে নাকি?) সেই আমরা জানি, তাদের কি অবর্ণনীয় দুর্দশা। খুব কম করেও তাদের সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, যাতে জীবন সার্থক হয় তা থেকে তারা চিরবঞ্চিত। বলব না যে তারা খুব সুখ পায় নি, বলব যে জীবন যাতে নামমাত্র সহনীয় হয়, তাও তারা পায় নি কোনো দিন। একটি বিধবা আমাকে যে বলেছিল—যেমন আরও অনেক বিধবাই আমাকে বলেছে যে, আপনাদের সরকার আমাদের মৃত স্বামীর চিতায় মরবার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়েছে, তার বদলে দিয়েছে শুধু দুঃখ যাতনা। আর কিছুই আমাদের জীবনে অবশিষ্ট নেই। সহমরণ এর চেয়ে অনেক বেশি কাম্য ছিল।'

'একজন প্রভাবশালী হিন্দু ভদ্রলোক একদা আমার স্বামীকে বলেছিলেন, 'শিশুবিধবাদের মধ্যে অন্তত‌পক্ষে দশজনের নয় জনই বিপথে যেতে বাধ্য হয়।' এবং আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এর মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই কিছুই। ভারতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাজ করতে যে সব নানা বাধা উপস্থিত হয়, সে সব বাদ দিয়ে আমি শুধু এই একটি বিষয় নিয়ে এতক্ষণ বলেছি, তার কারণ এই সভা—এই প্রভাবশালী সভা—এই দুর্দশা দূর করার

জন্য কিছু করবেন, এই আমার আশা। কি করলে বিধবাজীবনের এই অভিশাপ দূর হতে পারে তার উপায় নির্ধারণ করার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু আমি এ কথা বলব যে, অবিলম্বে পুরুষেরা যদি একাজে ব্রতী না হন, তাহলে নারীরাই বাধ্য হয়ে এ কাজে নামবেন।'

কিন্তু সমাজ সংস্কারকের হাতেই আমি একাজের ভার দিতে আশা করি। এর পর আমি আর এক শ্রেণীর অপরাধের কথা বলি। এ অপরাধও ধরা পড়ে না, এবং অন্তরালে থেকে যায়। রেল লাইনের কাছাকাছি একটি লোককে খুন করা হল। তারপর রাত্রের অন্ধকারে তার দেহটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল রেল লাইনের উপরে এবং সেখানে শুইয়ে রাখা হল। যথা-সময়ে রেলগাড়ি সেই দেহের উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল। তখন সবাই জানল এটা রেলদুর্ঘটনার ব্যাপার। এই চাতুরিতে পুলিস অনেক সময়েই বিভ্রান্ত হয়। এবং এতে কষ্টসাপেক্ষ তদন্তও বেশ এড়িয়ে চলা যায়। কোনো পুলিস ঔদাসীন্যবশত জোর তদন্ত যদি না চালায় এবং কোনো পুলিস অফিসার যদি তৎপরতার সাহায্যে কোনো এলাকার অপরাধপ্রবণতা দাবিয়ে রাখে, তা হলে সাধারণ লোক অবশ্যই শেষেরটি পছন্দ করবে।

তদন্তকারী অফিসার যদি খুব উৎসাহী হন এবং যথার্থভাবে কর্তব্য পালন করেন, তা হলে ঐ জাতীয় প্রতারণা ধরা তাঁর পক্ষে অবশ্যই সহজ হবে। রেল লইনের উপর মৃতদেহ রাখা হয়েছে, না জীবন্ত লোক কাটা পড়েছে, এটা একটু তৎপর হলেই ধরা যায়। কিন্তু পুলিসদের মধ্যে আপন কর্তব্য বোঝে এবং তদনুসারে কাজ করে এমন ব্যক্তি খুবই বিরল। সেজন্য সাধারণের উপকার হবে আশায় আমি আত্মহত্যা ও দুর্ঘটনাজাত মৃত্যু এবং হত্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, এবং কি করে তা চেনা যায় সে সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছি। কোনো মৃত ব্যক্তির দেহ যদি ট্রেনে কাটা পড়ে তা হলে সেই কাটাছেঁড়া দেহ থেকে যে রক্তপাত হবে, তার পরিমাণ হবে খুবই অল্প। আর সে রক্তের চেহারা হবে পাতলা এবং জলো। এবং সে রক্ত জমাট বাঁধবে না। পক্ষান্তরে জীবন্ত মানুষ যদি কাটা পড়ে তা হলে সেই দেহ থেকে যে রক্তক্ষরণ হবে, তার পরিমাণ হবে বেশি, আর শুধু তাই নয়, সে রক্ত বাইরের হাওয়ায় জমাট বেঁধে যাবে। তার রং হবে ঘন লাল এবং উজ্জ্বল। মৃতদেহের উপর এঞ্জিন চলে গেলে সে রকম হবে না। এ দুইয়ের তফাৎ একটু মনোযোগ দিলে মোটেই বোঝা কঠিন হবে না।

রেলওয়ে সম্পর্কে যে সব গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে বলতে গেলে আরও অনেক রকম অপরাধের কথা মনে আসে। একটি অতি হীন চেষ্টা হয় যাত্রীবোঝাই গাড়ি লাইনচ্যুত করিয়ে গাড়িটাকে ধ্বংস করে দেওয়া। এটি প্রায়ই হতে দেখা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই সব অপরাধ যারা করে তারা প্রায়ই ধরা পড়ে না, অতএব তারা নিরাপদে এই পাপ কাযটি করতে পারে।

এঞ্জিন চালক লাইনে কোনো কিছু পড়ে আছে দেখতে পেলে কি করে বলছি। সে ব্রেক কষে গাড়িটাকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি থামিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। তখন গার্ড এবং ড্রাইভার দুজনেই নেমে দেখতে চেষ্টা করে লাইনের উপর কি রকম বস্তু পড়ে আছে, বা অন্য কি রকম বাধা উপস্থিত হয়েছে। তারপর পথ মুক্ত করা হয় এবং ট্রেনটিকে পরবর্তী স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখানে গিয়ে ঘটনা রিপোর্ট করা হয়। ইতিমধ্যে অপরাধীরা হয় তো নালা কিংবা একটু দূরের কোনো ঝোপের ভিতর থেকে সব দেখছিল, এবং যখন দেখল ট্রেন ধ্বংস হল না, তখন সেখান থেকে নিরাপদে পালিয়ে গেল। তারপর কয়েক ঘণ্টা বাদে পুলিস আসে, এবং না এলে যে ফল হত, আসাতেও তাই হয়, এবং বাইরে বাইরে তদন্ত করে চলে যায়। যদি লাইনের বাধা আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গার্ড যে কজন লোক পাওয়া সম্ভব তাদের সঙ্গে নিয়ে ট্রেন থামামাত্র, উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের চতুর্দিকে অনুসন্ধানে পাঠায়, তা হলে সম্ভবত অপরাধীদের ধরতে পারে।

আমি নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এটা অবশ্য ডিটেকশনের এলাকায় পড়ে। যখন কে অ্যাণ্ড ডি রেলওয়ে প্রথম খোলা হয়, তখন ট্রেন ধ্বংসের কয়েকটি চেষ্টা হয়েছিল। আমি নিজে এ তদন্তের ভার নিয়েছিলাম। কয়েকজন উৎসাহী ট্রলিচালককে সঙ্গে নিয়ে আমি রোজ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চলতে লাগালম। লাইনের দুপাশ তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল না, তাই গাড়ির গতি ছিল মন্দ। এতে সুবিধা ছিল এই যে, কোনো বিপদ দেখা দিলে গাড়ি তাড়াতাড়ি থামিয়ে ফেলার সুবিধা ছিল। আমার পরিকল্পনা পরীক্ষা করতে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। একদিন রাত্রে ড্রাইভার দেখতে পেল লাইনের উপর একটা গাছের গুঁড়ি পেতে রাখা হয়েছে। হঠাৎ গাড়িটা সে থামিয়ে ফেলল। আমি এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে লোকজন সঙ্গে নিয়ে চারদিকে যেখানে যেখানে দুষ্ট লোকদের লুকিয়ে থাকবার সম্ভাবনা,

সেই সব স্থানে ছুটে গেলাম। একটা বাঁশের ঝাড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই দুটি লোক সেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে ছুটে চলছে দেখতে পেলাম। আমি তাদের অনুসরণ করলাম, কিন্তু তাদের চেনবার বা ধরবার আগেই তারা বস্তীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। গ্রামে গিয়ে প্রত্যেকটি বাড়ি সার্চ করলাম। কিন্তু দেখা গেল সবাই ঘুমুচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকে প্রত্যেকটি ঘুমন্ত পুরুষের বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করতে লাগলাম, দেখছিলাম কার বুকে নিশ্বাস ওঠাপড়া করছে বেশি। কার হৃৎপিণ্ড বেশি লাফাচ্ছে।

অবশ্য অভিযুক্ত করার পক্ষে এটি যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কিন্তু এতে রেললাইনে বাধা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর কখনো হয় নি এর পর।

গুরু অপরাধ করেও কি করে শাস্তি এড়ানো যায় তার আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একটা পারিবারিক কলহে এক মুচি তার জামাইকে একেবারে মেরে ফেলে। তার বাড়ি থেকে কিছু দূরে এক বাঘ একটা গোরুকে আগের দিন মেরেছিল, গোরুর কিছু অংশ খেয়ে বাঘ মড়ীটাকে সেইখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল, পরদিন এসে খাবে উদ্দেশ্যে। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে ঐ মুচি তার জামাইয়ের মৃতদেহ রাত্রের অন্ধকারে ঐখানে টেনে নিয়ে ফেলে এলো। সকালে উঠে হত্যাকারী সোজা থানায় গিয়ে জানাল যে তার জামাই মড়ীটার কাছে চামড়া ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিল এমন সময় বাঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘটা কাছেই জঙ্গলে ছিল, সে তার জামাইকে ক্ষতবিক্ষত করে মেরে ফেলেছে। এই কাহিনী এমনই নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছিল যে পুলিস এ বিষয়ে আর কোনো তদন্ত করার দরকারই মনে করে নি। নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছিল কারণ ওদের চামড়ার ব্যবসা, এবং বাঘে গোরু মেরেছিল সেটাও সত্য ঘটনা।

আরও একটা মারাত্মক অপরাধ কিভাবে গোপন করা হয়েছিল, বলি। এইটেই এবারের আমার শেষ কাহিনী। মফঃসলের কোনো এক স্থানে একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ঘটে। জায়গাটায় সহজে যাওয়া যায় না। এই হত্যাকাণ্ড প্রকাশ্যে অনেক লোকের সামনে ঘটেছিল। সেই মহকুমার শাসককে খবর পাঠানো হল যথাসময়ে, তাঁকে সমস্ত জানানো হল। তিনি একজন পুলিস ইন্‌সপেক্টরের উপর এর তদন্তের ভার দিলেন। কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তদন্তে এলেন। তিনি এসে যাদের বিরুদ্ধে

হত্যার অভিযোগ করা হয়েছিল, তাদের গ্রেফতার করলেন। কিন্তু তারা সবাই হত্যা বিষয়ে একেবারে ঝাড়া অস্বীকার। তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না, এবং কেউ এ এলাকায় খুন হয় নি কবুল করল। তারা বলল, যে খুন হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে, সে দাঙ্গায় ধরা পড়ার ভয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। দাঙ্গা হয়েছিল একখণ্ড জমি নিয়ে। জলজ্যান্ত হত্যা বেমালুম অস্বীকার করে বসল, অথচ যাকে নিয়ে কথা, তার দেহ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু প্রমাণ করাও শক্ত। প্রতিপক্ষের লোকেরা বলতে লাগল তারা স্বচক্ষে দেখেছে লোকটাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে একেবারে মেরে ফেলা হয়েছে, অথচ প্রমাণ করা যাচ্ছে না। একদিকের লোকেরা করছে অস্বীকার, অন্যদিকের লোকেরা বলছে তারা খুন হতে দেখেছে, এবং দুদিকের সাক্ষীরাই সমান জোরালো। এখন দেহ পাওয়া ভিন্ন খুনের প্রমাণ একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠল। পুলিস অফিসার খুবই চেষ্টা করতে লাগলেন সত্য আবিষ্কারের জন্য, যদিও দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি বুদ্ধিটা আরও একটু বেশি চালনা করতে পারেন নি।

আশপাশের যাবতীয় পুকুরে খোঁজা হল, কয়েক মাইলের মধ্যে যত ঝোপঝাড় ছিল সেখানে খোঁজা হল, কিন্তু মৃতদেহের কোনো সন্ধান মিলল না। অবশেষে অভিযুক্তের বাড়ির পঞ্চাশ গজ দূরে একটা জায়গার মাটি দেখে মনে হল সম্প্রতি সেখানটা খোঁড়া হয়েছে। ঢিলে কিছু মাটি তুলে ফেলা হল, কিন্তু দেখা গেল সেখানে একটি মৃত ঘোড়া পুঁতে রাখা হয়েছে, সেটা মানুষের দেহ নয়। এইটে দেখেই তারা সন্ধানের কাজ থেকে বিরত হল। কিন্তু তারা আরও একটু যদি এগোত, তা হলে দেখতে পেত মৃতদেহটা সেখানেই ছিল। দেহটাকে ঘোড়ার পেটের ভিতর শেলাই করে রাখা হয়েছিল। ঘোড়ার পেটের নাড়ি সব বার করে সেইখানে দেহটাকে পুরে শেলাই করে দেওয়া হয়েছিল।

এই কেসে শেষ পর্যন্ত শেয়ালেরা ডিটেক্‌টিভের ভূমিকা নিয়েছিল। তারা পুলিসের চেয়ে ভাল ডিটেকটিভ। তারাই এ অপরাধের কিনারা করেছিল শেষ পর্যন্ত। অথচ পুলিস একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল নির্বুদ্ধিতার জন্য। পাড়ার লোকেও পুলিসের ব্যর্থতায় অবাক হয়েছিল।

দেশী পুলিস অফিসার হয়ে এই চাতুরি ধরতে পারল না এটা বড়ই বিস্ময়কর। বিশ্বাসই করা যায় না। তার বোঝা উচিত ছিল ঘোড়া মারা

গেলে এত কষ্ট করে তার কবর দেয় না কেউ। এই ঘটনাতেই পুলিসের মনে সন্দেহ জাগা উচিত ছিল।

চোর দিয়ে কি চোর ধরা যায় ?

১৮৮৪ সালের ৬ই মার্চ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস' নামক কাগজে একটি উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় রেল পুলিসের যোগ্যতা এবং গঠন সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। ঐ রচনাটি তারই সম্পর্কে। এর কথা আমি আগেও একবার বলেছি। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী একটি দিচ্ছি—

দুএক বছর আগে রেলওয়ে পুলিস কমিটি ৮০০০ মাইল রেলপথে কি জাতীয় পুলিস কাজ করে, কি রকম লোকদের পুলিসে নেওয়া হয় এসব তদন্তের ফলে যা জানা গেছে তা এই যে, ডিটেকটিভ নিয়োগের পদ্ধতি কোথাও নেই, কারণ ভারতীয়দের মধ্যে ডিটেকটিভ হবার যোগ্যতা কারো নেই। যদি চোর ধরতে একমাত্র চোরের যোগ্যতাই সমর্থনযোগ্য হয়, তা হলে কমিটির সিদ্ধান্তে জনসাধারণের বলবার কিছু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধ-ইতিহাস এর উল্টোটাই প্রমাণ করবে। পুলিস কোর্টের অথবা সেশনস কোর্টের রেকর্ড দেখলেই বোঝা যাবে অপরাধে যে সব চাতুর্য এবং সূক্ষ্ম কৌশল ব্যবহৃত হয়, তার জন্য একমাত্র সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ডিটেকটিভই দরকার।

সব সময় চোর দিয়ে চোর ধরা যায় না। ডিটেকটিভদের কৌশল আর চোরদের কৌশল আকাশ পাতাল তফাৎ। ধরা না পড়বার যাবতীয় চাতুরিতে সে ওস্তাদ হয়, কিন্তু ডিটেকটিভের বুদ্ধিকে অনেক বেশি প্রখর করতে হয় সেই চাতুরি ধরে ফেলতে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ হাইকোর্টের কয়েকটি বিখ্যাত কেসের নাম করা যেতে পারে। যথা, ভারত সম্রাজ্ঞী বনাম চন্দ্রকান্ত, ডাকঘর প্রতারণার বড় কেস এটি। তারপর সম্রাজ্ঞী বনাম বাট্রেস ওরফে ক্যাপটেন মিলস, মীরাট ট্রেজারি রসিদ জালের কেস এটি। সম্রাজ্ঞী বনাম ডাণ্ডাস, ওরফে মেজর অকল্যাণ্ড। ইনি কলকাতার বহু ব্যবসায়ীকে ঠকিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী বনাম টমাস ও'টুল, একটি খ্রীস্টান সোসাইটিকে প্রতারণা করেছিলেন। তারপর

সম্রাজ্ঞী বনাম মাধবচন্দ্র সরকার—ইনি মেসার্স ম্যাকেঞ্জি লায়াল অ্যাণ্ড কো-কে ব্যাপকভাবে ঠকিয়েছিলেন।

টমাস ও'টুল নিজে পাকা জালিয়াত ছিলেন, কিন্তু তবু বাট্‌রেসের জালিয়াতি কি তিনি ধরতে পারতেন? [বাট্‌রেসের কেস বিস্তারিতভাবে আগে বলা হয়েছে।] বাট্‌রেস কি ডাণ্ডাসকে ধরতে পারতেন? চন্দ্রকান্ত রায় কি মাধবচন্দ্র সরকারের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারতেন? অথচ নিজে তিনি ডাকঘরের ডাকাতিকে এক গভীর রহস্যজালে ঢেকে রাখতে পেরেছিলেন। এ জাতীয় কেসে ডিটেকটিভের দরকার হয়। সাধারণ চুরি ডাকাতিতে বিশেষ ডিটেকটিভের কৌশল দরকার হয় না।

একটা রহস্যজনক চুরির কথা বলি। ভারতীয় রেলওয়েসমূহ একবার মূল্যবান পার্সেলসমূহের রহস্যজনক অন্তর্ধানে প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়। কোথায় যায় সে- সব পার্সেল? মনে হয় যেন শূন্যে মিলিয়ে যায়। যেন সে একটি সুখস্বপ্ন মাত্র। প্রিয় পাঠকগণ, আমি যবনিকা উত্তোলন করছি, আপনারা অভিনয় দেখুন।

কোনো একটি প্যাকেট ভুলে অন্য স্টেশনে চলে গেছে। এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। যে স্টেশনে ঐ প্যাকেটটি ভুলের ফলে গিয়ে পৌছল, সেখানকার মালবাবু যদি অসৎ হন, তা হলে এই ফাঁকে তিনি বেশ কিছু লাভ করে নিতে পারেন। তিনি এমন একটা মূল্যবান জিনিসের অধিকারী হলেন, যার জন্য কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। এমন অবস্থায় তিনি কি করবেন? ওয়াগন থেকে মাল সরিয়ে লুকিয়ে রাখবেন? তারপর কোনো শুভ মুহূর্তে সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে ভোগ করবেন? মোটেই তা নয়। কারণ তা হলে রেলের কোনো খালাসি দেখে ফেলতে পারে, রেল পুলিস দেখে ফেলতে পারে। আর তার ফলে চাকরি খতম, এবং হয় তো কারাবাস। না না, ওপথে নয়। ভাল পথ আছে, সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি সেই প্যাকেটটি একটি ছদ্ম প্রেরকের নামে বুক করে দিলেন তাঁর পরিচিত কোনো লোককে। রেল রসিদ গেল তাঁর নামে। কিভাবে মাল খালাস করতে হবে, সব উপদেশ গেল রসিদের সঙ্গে। বন্ধুটি রসিদ পেয়ে স্টেশনে গিয়ে মাশুল দিয়ে প্যাকেটটি নিয়ে গেলেন। তাঁরও আর পাত্তা মিলবে না। সরল পথের প্রতারণা। ধরা পড়বার ভয় নেই। দু'চার দিন পরে প্যাকেটের সন্ধান শুরু হল। ট্র্যাফিক

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে অভিযোগ গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব সম্ভাবিত স্টেশনে জরুরি তার গেল—প্যাকেট ঐ স্টেশনে গেছে কি? কিন্তু তারা কি উত্তর দেবে? অতঃপর কেস্ গেল পুলিসের হাতে। পুলিস কি করবে? ভারত মহাসাগরের বুক থেকে ছোট্ট একখণ্ড উপল খোঁজার চেষ্টা করবে তারা। কিন্তু তাদের সব রকম কৌশল খাটিয়ে যদি বুঝতেও পারে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে, তা হলেও সে জিনিসের সন্ধান তারা পাবে না। কারণ কোন্ স্টেশন থেকে এ ব্যাপার ঘটেছে তা বোঝা তাদের সাধ্য নয়। অতএব যাঁরা গুপ্তচরের সাহায্যে—অর্থাৎ 'চোর দিয়ে চোর ধরা'র পদ্ধতিকে সমর্থন করেন, তাঁরা ভেবে দেখুন, এমন কেসে তারা কিছুই করতে পারবে না।

স্পাই-পদ্ধতি অথবা পুলিসের ভাষায় যাকে বলে গুপ্তচরের মাধ্যমে অপরাধীকে ধরা, তা দৈহিক শাস্তির সাহায্যে স্বীকারোক্তি আদায়ের মতনই নীচ কাজ এবং তার মতনই নিষ্ঠুর কাজ। এই দুইয়েতেই নিরপরাধ লোকে শাস্তি পায়। সরকার এবং এদেশের ইউরোপীয় সমাজ—উভয়েরই উচিত এ পদ্ধতিকে নিরুৎসাহ করা এবং ঘৃণা করা।

যে ব্যক্তি পুলিস-স্পাইয়ের কাজ করতে সক্ষম, তাকে বিশ্বাস করা কঠিন। তার সম্মানহানির ভয়ও নেই, বিবেকের জ্বালাও নেই। যাকে সে অপরাধী মনে করছে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ সে দেবে না। সে কেবল ভাববে যার টাকা খাচ্ছে তাকে কি করে খুশি করা যায়। সে ছোটকে বাড়িয়ে বড় করে, একটু দোষ পেলে দশগুণ করে দেখায়, ভালকে বিকৃত করে। অনেক সময় সে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেও চেষ্টা করে নিরপরাধকে দণ্ড দেবার ব্যবস্থা করে। অতএব এদেশে গুপ্তচরের সাহায্যে কাজ উদ্ধারকে অসম্মানজনক জ্ঞান করা উচিত।

চোর দিয়ে চোর ধরার ফলাফল

পার্ক স্ট্রীটের থানা অঞ্চলে একদিন অপরাহ্নে আমি কনস্টেবলদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছিলাম, এমন সময় একজন নিরীহ চেহারার লোক একখণ্ড কাগজ হাতে করে মাঠের দিকে এগিয়ে এলো। সে ক্রমে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে এক দীর্ঘ সালাম ঠুকে কাগজখানা আমার হাতে দিল। দেখলাম সেখানা একখানা দরখাস্ত, ডেপুটি কমিশনারের উদ্দেশে

লেখা, তাঁরই হাত ঘুরে এখানা আমার কাছে এসে পৌঁছল, এবং তা বোঝা গেল তাঁর স্বাক্ষর দেখে। তিনি দরখাস্তের এক কোণে লিখে দিয়েছেন, 'Mr. Reid, give this man a trial'—অর্থাৎ একে একবার কাজে লাগিয়ে দেখ, কি রকম। দরখাস্তখানা পুলিস আদালতের দরখাস্ত লিখিয়েদের ভঙ্গিতে লেখা।—দরখাস্তকারীর পুলিস ইনফর্মারের বৃত্তি, অর্থাৎ সে অপরাধীদের সম্পর্কে গোপন খবর সরবরাহ করে। এ কাজে সে বড়ই দক্ষ, অতএব এই লাইনে সে চাকরি করতে চায়। সে পুলিসের গুপ্তচর হতে চায়। সম্প্রতি এ অঞ্চলে যে সব বড় বড় চুরি হচ্ছে, সে বিষয়ে সে অনেক গোপন খবর সরবরাহ করতে পারবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দরখাস্তখানা পড়বার পর আমি লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলাম, লোকটা সাধারণ লোকদের চেয়ে উচ্চতায় কিছু খাটো। চোখ দুটি ছোট এবং চঞ্চল, এবং তা আমার মুখ ভিন্ন চতুর্দিকের সকল জিনিসের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেহারা মোটেই ভাল নয়। দেখলাম তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের পরের আঙুলটি নেই। একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে লোকটাকে দেখে আমি খুশি হই নি। কিন্তু যেহেতু পুলিসের ডেপুটি কমিশনার তাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, সেহেতু আমি তাকে নিযুক্ত করতে বাধ্য।

পুলিসের গুপ্তচর রূপে নিযুক্ত হবার পরই তার প্রথম অনুরোধ হল এই যে, রাত্রে যে সব কনস্টেবলের ডিউটি থাকে, তাদের আদেশ দেওয়া হোক, তারা যেন তাকে চোর মনে করে ধরে তার উপর কোনো রকম জবরদস্তি না চালায়। বরং তাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। চোর ধরার জন্য তাদের ডাকলেই যেন তারা সাহায্য করে। এ রকম অনুরোধ যুক্তিসঙ্গতই মনে হল, এবং আমি তাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করলাম। তারপর তার দ্বিতীয় অনুরোধ হল এই যে, তাকে আগাম কিছু টাকা দেওয়া হোক, কোনো রকমে দিন চলার মতন, তারপর চোর ধরলে তো বড় পুরস্কার পাবেই। তার এ অনুরোধও পালন করা হল। তারপর এই গুপ্তচরটি চোর ধরার কাজে লেগে গেল।

এক সপ্তাহ পরে সে তার কাজের রিপোর্ট পেশ করল। সে এক মস্ত বিবরণ। কি ভাবে সে চোরদের অনুসরণ করেছে, কি ভাবে তাদের অল্প দিনের মধ্যেই ধরা যাবে, কি ভাবে সে তাদের বেকায়দায় ফেলে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলবে, কি ভাবে সে সতর্কতার সঙ্গে কাজে এগোচ্ছে, সে

বিষয়ে লম্বা এক বিবরণ পেশ করল। বলল, 'স্যার, আপনি নিশ্চয় জানেন, বমাল না ধরতে পারলে শুধু চোর ধরে কোনো লাভ নেই, কারণ তা হলে তো আর তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকবে না। আর তা হলে আমিও আমার প্রাপ্য পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকব, আর কেস্ চালানোর কৃতিত্বটুকু আপনি খোয়াবেন। যাই হোক, আমাকে আরও সামান্য কিছু টাকা দিন, দুই এক দিনের মধ্যেই যে জাল ফেলেছি, তা টেনে তোলবার মতন সুযোগ পেয়ে যাব।'

রাস্ক্যালটা আরও কিছু টাকা আদায় করে নিল, এবং কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকল। দশ বারো দিনের মধ্যে তার আর দেখা নেই। এতদিন তার দেখা না পাওয়াতে আমার মনে কিছু সন্দেহের উদয় হল। আমি তখন বীটের কনস্টেবলদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম রাত্রে পাহারা দেবার সময় তারা কোনো পুলিসের গুপ্তচরের দেখা পেয়েছে কি না। একজন কনস্টেবল জানাল দুদিন আগে রাত্রে উডস্ট্রীটে তাকে দেখেছে। তখন আমি ওদের আদেশ দিলাম পরে তার দেখা পেলেই যেন তাকে থানায় ধরে আনা হয়। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না, আমার প্রিয় বন্ধুকে একদিন দেখি একজন অফিসার থানায় ধরে নিয়ে এসেছেন। এতদিনের অদর্শনের জন্য অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণ অনেকগুলো তার ঝোলায় প্রস্তুত ছিল, তারই সাহায্যে সে আমাদের ভুলিয়ে ফেলল এবং বলল, 'স্যার, মাত্র আর একটা দিন।'—এটাও তাকে মঞ্জুর করা হল। সে বলল, 'সব বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেছে আর একটা দিন পেলেই একেবারে হাতেনাতে।' বলে সে আবার নিরুদ্দেশ হল।

এর ঠিক পরদিনই ১৪ নম্বর ক্যামাক স্ট্রীটের মিস্টার পীটার জন থানায় এসে জানালেন, রাত্রে তাঁর বাড়িতে চোর প্রবেশ করে অনেক টাকার অলঙ্কারপত্র নিয়ে গেছে। তদন্তের জন্য আমি মিস্টার জনের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গেলাম। সিঁড়িতে উঠতে একটি জিনিস বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখলাম রক্তমাখা পায়ের ছাপ পড়েছে সিঁড়িতে, এবং ছাপের এক একটা বাদের যে ছাপ তাতে একটি আঙুলের চিহ্ন নেই। অর্থাৎ এক পায়ের ছাপে পাঁচটি আঙুলের চিহ্ন, অন্য পায়ের ছাপে চারটি। এ চিহ্ন যে ঘর থেকে চুরি হয়েছে সেই ঘর পর্যন্ত যেতে দেখা গেল। এই আবিষ্কারের পর আমি ক্ষণকাল চিন্তা করলাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঐ গুপ্তচর নামধারী লোকটার একটা পায়ে তো একটা আঙুল

নেই দেখেছি ! তখন মাথায় হাত দিয়ে সখেদে বলে উঠলাম, 'হায় ভগবান ! এ তো দেখছি ঐ গুপ্তচরটির কাজ।' কথাগুলো আমি ইচ্ছে করে বলি নি, আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল। হঠাৎ আবিষ্কারের বিস্ময় আর কি।

লোকটার চুরি করতে পা কেটেছে বোঝা গেল। মিস্টার পীটার জনের বাড়িতে ঢুকতে উঠোনের দেয়াল টপকাতে নিশ্চয় এই কাণ্ড ঘটেছে। কারণ দেয়ালের উপর ভাঙা কাঁচ সিমেণ্টের সাহায্যে আঁটা ছিল। একটি আঙুলের চিহ্ন না থাকাতে রাস্কালটাকে চেনা গেল। আরও তদন্ত করে দেখা গেল, পল্লীর যতগুলো বাড়িতে সম্প্রতি চুরি হয়েছে, সে সব বাড়িতেও ঠিক এক ভাবেই চুরি হয়েছে।

সামনের দরজায় কাঁচ লাগানো ছিল। দেখলাম হীরক দিয়ে সুন্দর ভাবে তা থেকে একটা প্যানেলের কাঁচ কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে তারপর হাত চালিয়ে খিল খোলা হয়েছে। সব বাড়ির চুরির চেহারা প্রায় এক হওয়াতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, সবগুলো চুরিই এক হাতের। এই আবিষ্কারে আমি যেন বিভীষিকা দেখলাম। ভাবলাম, আমি নিজে একজন ঝানু ডিটেকটিভ, আর আমাকেই কিনা লোকটা এভাবে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি এই বদমাশটাকে শুধু যে চোর ধরার কাজে লাগিয়েছি তাই নয়—তাকে বেতন দিচ্ছি তাকেই ধরার জন্য ! নিজেই হতাশভাবে বললাম, 'হায় রে ! এ কথা পুলিস বিভাগের লোকেরা শুনলে কি ভাববে ? তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না ?' —আমি গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম, আর আমার এ কাজে থাকা উচিত হয় না, আমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার এখনই এ কাজে ইস্তফা দেওয়া উচিত। অথবা কিছু দিনের জন্য ছুটি নেওয়া উচিত।

কিন্তু আমি কোনোটাই করলাম না। আমি আমার এই হীরক-কাটা-হীরককে গ্রেফতার করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম, এবং সেই দিনের মধ্যেই তাকে ধরে ফেললাম। এরপর আর কোনোদিন কোনো বৃত্তিধারী গুপ্তচরকে চোর ধরার কাজে লাগাই নি।

চোরব্রাহ্মণ কথা

১৭ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটে মিসেস ড্রুরি একটি বোর্ডিং হাউস চালাতেন। এই বোর্ডিং হাউসের বাসিন্দা মিস্টার এবেনেজার ফর্জ চেম্বার্স ১৮৭০ সালের ১৫ই অগস্ট তারিখে তাঁর সোনার চেনঘড়ি খুঁজে পান না। তিনি বললেন, সেদিন অপরাহ্নে তিনি নিচে খেতে নেমেছিলেন। তাঁর চেনসুদ্ধ ঘড়ি তিনি তাঁর ড্রেসিং রুমে ছেড়ে এসেছিলেন। ডিনারের সময় মনে পড়াতে তিনি তাঁর চাকরকে ঘড়িচেন আনতে উপরে পাঠান। চাকরটি প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরে এসে জানাল, ঘড়ি ও চেন সে কোথাও খুঁজে পেল না। একথা শুনে মিস্টার চেম্বার্স তৎক্ষণাৎ উপরে উঠে গেলেন, কিন্তু তিনিও ঘড়ির কোনো পাত্তা পেলেন না। ঘড়ি হারানো আবিষ্কার, এবং সে বিষয়ে থানায় খবর দেওয়া—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে সেখানকার কোনো চাকর বাইরে যায় নি। অতএব গেটে পাহারার ব্যবস্থা করা হল, উদ্দেশ্য—কোনো চাকর বাইরে গেলে তার দেহ-তল্লাশ করা। মিসেস ড্রুরির বোর্ডিং হাউসের কোনো বাসিন্দার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু মিস্টার চেম্বার্স-এর চাকরকে সন্দেহ করা হল। আমি তদন্তের সুবিধার জন্য অভিযোগকারীর সঙ্গে এসে একটা বন্দোবস্ত করলাম। বললাম একজন ছদ্মবেশী কনস্টেবল তাঁর অধীনে নিযুক্ত করা হবে, সে তাঁর চাকরের গতিবিধি লক্ষ করবে। পরদিন ছদ্মবেশী কনস্টেবলটি ১৭ নং ক্যামাক স্ট্রীটে এসে উপস্থিত হল। তার সঙ্গে ছ'খানা ক্যারাক্টার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। যেন সেগুলো পূর্ববর্তী নানা মুনিবের কাছ থেকে সংগ্রহ। সে যেন এইসব নিয়ে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিস্টার চেম্বার্স সে সব দেখে তাকে কাজে নিযুক্ত করলেন। বলা বাহুল্য এর সবটাই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং এতে নবনিযুক্ত লোকটি যে পুলিসের লোক এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ হল না। দিনের কাজ শেষ হলে ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ ও মিস্টার চেম্বার্সের চাকর দুজনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে ডিটেকটিভ ঐ চাকরটাকে বলল, চল না, জানবাজার স্ট্রীটের কফির দোকানে গিয়ে দু' পেয়ালা কফি খাওয়া যাক। ডিটেকটিভও তখন ছদ্মবেশে মিস্টার

চেম্বার্সের চাকর, কাজেই দুজনে পদমর্যাদায় সমান। তাই তাঁর নিজস্ব চাকরের মনে কোনো সন্দেহেরই উদয় হল না।

দুজনে বেশ মনের আনন্দে কফি পান করছে দোকানে বসে, আর সেই সঙ্গে মিস্টার চেম্বার্সের সিগার বাক্স থেকে সরানো দামী সিগারের ধূমপান করছে। এমনি অবস্থায় স্বভাবতই আলাপ আরম্ভ হল সাম্প্রতিক চুরির বিষয়ে। ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ সুযোগ বুঝে আর একটি ঠিক এই ধরনের সোনার চেন ও ঘড়ি চুরির কথা পাড়ল। বলল, সে যখন তার শেষ মনিবের অধীন কাজ করছিল, সেই সময় এই রকম একটি ঘড়ি চুরির ঘটনা ঘটে।

এই ছদ্মবেশী ডিটেকটিভের নিজের কথাই উদ্ধৃত করি—যে বাড়িতে আমি শেষবার কাজ করেছি সেই বাড়ির মেমসাহেবের সাজঘর থেকে একটা সোনার ঘড়ি চেনসুদ্ধ চুরি হয়। ঠিক মিস্টার চেম্বার্সের ঘড়ি যেমন চুরি হয়েছে।'—এইভাবে ডিটেকটিভ চাকরকে বলতে লাগল, এবং সেও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। সে বলল 'তারপর সে-ঘড়ি আবিষ্কার হল সে-বাড়ির বেয়ারার কাছ থেকে। সেই ওটি চুরি করেছিল। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ঘড়িটিকে বাগানের মধ্যে পুঁতে রেখেছিল। যেদিন চুরি হয় বেয়ারা আমাকে গোপনে বলল তার সঙ্গে আমাকে একবার হাওড়া যেতে হবে। কেন যেতে হবে? না, সেখানে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ গণৎকার আছেন তিনি গুণে সব বলে দিতে পারেন। আমার ভাগ্যে কি আছে তা তাঁর কাছে থেকে জানতে পারব। সে সময় সে কিন্তু আমাকে বলেনি যে সেই ঘড়িটি চুরি করেছে। কেউ তাকে চোর বলে সন্দেহও করে নি। গণৎকারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সেটি জানতে পেরেছিলাম।

আমি রাজি হয়ে গেলাম এবং দুজনে হাওড়া গিয়ে পৌছলাম। ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য তাঁকে বললাম। তিনি তখন মন্ত্র পড়তে পড়তে তাঁর চার ধারে কিছু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর আসনের পাশে অবস্থিত একটি পাথরে দেবমতির উপরেও ঐরকম জল ছিটিয়ে দিতে দিতে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। এটি শেষ হবার পর ব্রাহ্মণ আমাদের দুজনকে লক্ষ করে বলতে লাগলেন 'ব্রাহ্মণদের দেবতা আমাকে এ চুরির বৃত্তান্ত সব প্রকাশ করে বলেছেন, চোর এখনি আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।'—এ কথায় আমরা পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলাম, কিন্তু আমরা কোনো কথাই বললাম না! ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন এই চুরির ব্যাপারে

আমি দোষীর নাম প্রকাশে বিরত থাকব। যে দেবতারা আমাকে পরের মন পড়বার ক্ষমতা দিয়েছেন তাঁদেরই নির্দেশে আমি কাউকে লজ্জা পাওয়ানো থেকে বিরত থাকব। আমার জীবনের একমাত্র কর্তব্য হল মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করা।' এই পর্যন্ত বলবার পর ব্রাহ্মণ একটি পিতলের রেকাবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই চুরির অপরাধে যে অপরাধী সে দেবতাকে টাকা দিয়ে প্রণাম করুক। তা হলে সে জীবনে আর এ চুরির জন্য কোনো শাস্তি পাবে না।' ব্রাহ্মণের কথা শেষ হলে বেয়ারা পকেট থেকে একটা টাকা বার করে দেবতার সম্মুখস্থ সেই পিতলের রেকাবিতে রাখল এবং দেবতাকে প্রণাম করল। তখন ব্রাহ্মণ এক বোতল গঙ্গাজল মন্ত্রপুত করে তাকে দিয়ে বললেন, 'তুমি যেখানে ঘড়ি লুকিয়ে রেখেছ তার উপর গোপনে এই জল সন্ধ্যার পর ছিটিয়ে দেবে। এটা করা হলে'—ব্রাহ্মণ আশ্বাস দিয়ে বললেন—'পৃথিবীর কোনো পুলিস আর সেই ঘড়ি উদ্ধার করতে পারবে না, চোরকেও ধরতে পারবে না।'

ডিটেকটিভ এই পর্যন্ত বলার পর মিস্টার চেম্বার্সের বেয়ারা অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্রাহ্মণের কথা ফলেছিল?'

ছদ্মবেশী কনস্টেবল-ডিটেকটিভ তার উত্তরে বলল, 'ব্রাহ্মণের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। বেয়ারাকে পুলিস সন্দেহও করে নি, যদিও তারা অন্য অনেকগুলো চাকরকে চোর সন্দেহে গ্রেফতার করেছিল। তারপর যখন সব মিটে গেল, তখন আমরা মাটি খুঁড়ে ঘড়িটি বার করে রাধাবাজারে বিক্রি করে দিলাম, আর তাতে যা পাওয়া গেল আমরা দুজনে ভাগ করে নিলাম।' ডিটেকটিভ বলতে লাগল, 'আমরা যদি খুনও করতাম, তাহলেও সেই ব্রাহ্মণের কাছে যেতাম উপদেশ নিতে।'

'তাঁর কাছে আজই চল না কেন? গিয়ে তাঁর কাছ থেকে আমরা মনিবের ঘড়ি চুরি বিষয়ে সব বৃত্তান্ত জেনে আসি?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি এখুনি রাজি।'—ডিটেকটিভ বলল। তারপর দুজনে রওনা হল হাওড়ার উদ্দেশে। যখন তারা ব্রাহ্মণের সামনে গিয়ে হাজির হল, তখন ব্রাহ্মণ আগে যা যা করেছিলেন বলে বলা হয়েছে, তা সবই করলেন। আসলে একজন পুলিসের দারোগাকে আগে থাকতে ব্রাহ্মণ সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি মন্ত্র পড়লেন, জল ছেটালেন, এবং অপরাধীকে রক্ষার ভরসা দিয়ে টাকা চাইলেন। তারপর মিস্টার চেম্বার্সের বেয়ারাকে

এক বোতল পবিত্র গঙ্গাজল মন্ত্রপুত করে দেওয়া হল। বলে দেওয়া হল যেখানে ঘড়ি লুকোনো আছে, সেইখানে এই জল ছেটাতে হবে। অবহেলা করলে কিন্তু পুলিসে ধরে ফেলবে। ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এ কাজ করতে হবে এবং খুব গোপনে।

কাজ শেষে দুজনে নিজ নিজ বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল।

পরের দিন ছদ্মবেশধারী সেই কনস্টেবল-ডিটেকটিভটি শুভ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে তো জানে বেয়ারা ঐ জল ছেটাতে যাবে ঘড়ির উপর। সে দেখতে পেল বেয়ারা গোপনে বোতলটি নিয়ে বাগানের একটি অব্যবহার্য কোণের দিকে যাচ্ছে। তারপর সেখানে পৌছে সে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাইতে লাগল কেউ দেখছে কি না। কিন্তু না, কেউ দেখছে না। তখন সে তার কাজ আরম্ভ করল।

অবিলম্বে কনস্টেবলটি আমার কাছে এসে সব জানিয়ে দিল। আমিও তৎক্ষণাৎ মিস্টার চেম্বার্সের বাগানের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। তারপর মিস্টার চেম্বার্সকে এবং অন্যান্য আরও কয়েকজনকে সেখানে ডাকিয়ে ঘড়ি খুঁড়ে বার করা হল। চোরটিও সেখানে উপস্থিত ছিল। বেয়ারাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা হল, কিন্তু সে চুরি অস্বীকার করবার কোনো চেষ্টাই করল না, এমন কি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও না। কেস্‌টি হাইকোর্টে বিচারের জন্য পাঠানো হলে কিন্তু আসামী তার পূর্ব কথা সব অস্বীকার করে বলল, সে নিরপরাধ। সে যদি সেখানেও চুরি স্বীকার করত, তা হলে সাক্ষী-সাবুদের হাঙ্গামা না করে বিচারক তাকে তখনই দণ্ড দিতে পারতেন, কিন্তু অস্বীকার করাতে সবগুলো অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই যেতে হল। এবং এটি একটি ভারী মজার কেস বলে সবাই বেশ উপভোগ করতে লাগলেন। বিচারের সময় জজ, জুরি এবং দর্শকেরা মাঝে মাঝে হো হো করে হেসে উঠছিলেন।

প্রথম দর্শনেই প্রেম—এবং তার ফলাফল

মীরাট ট্রেজারির জালিয়াতি কেসের জন্য আমাকে কয়েক সপ্তাহ কলকাতার বাইরে কাটাতে হয়েছিল। আমি ফিরে আসবার পর একখানা রেজিস্টার্ড চিঠি পেলাম এক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে। তারিখ— ক্যাম্প চুঁচুড়া, ১২ জানুয়ারি ১৮৭৩। চিঠির উপরে লেখা আছে 'প্রাইভেট

অ্যাণ্ড কনফিডেনশ্যল।' চিঠিতে একটি প্রতারণার খবর আছে, সেটি এই—

প্রিয় মহাশয়, মীরাট ট্রেজারির উপর যে ব্যাপকভাবে প্রতারণা চলছিল তা ধরে ফেলতে আপনি যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার রিপোর্ট খবরের কাগজে পড়ামাত্র আমি এই চিঠিখানা আপনাকে লিখছি। আমার চিঠি লেখার উদ্দেশ্য, আমাকে যারা প্রতারণা করে ছ' হাজার টাকা মেরে দিয়েছে, সেই কুখ্যাত দলের সন্ধান করতে আপনাকে অনুরোধ জানানো। প্রায় দশ দিন আগে একখানি সুন্দর বজরা চুঁচুড়ার ঘাটে এসে ভেড়ে। আমি যেখানে ক্যাম্প করেছি, তার থেকে একশ গজ পরিমাণ দূরে হবে জায়গাটা। সন্ধ্যার সময় আমি আমার তাঁবুতে বসে ধূমপান করছি, এমন সময় ঐ বজরার দিক থেকে একজন ইহুদী আমার কাছে এসে সালাম জানালেন। তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় আমাকে কিছু গোপন কথা জানাবার অনুমতি চাইলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে আমার কৌতূহল জাগল, আমি পাইপটি ক্যাম্পের টেবিলে রেখে বললাম, 'আপনি আপনার কথা বলতে পারেন।'

তিনি আরম্ভ করলেন, 'সাহেব, ঐ বোটখানার মধ্যে আমার স্বজাতীয়া এক মহিলা আছেন'—বলে সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, 'মহিলাটি মেটিয়াবুরুজে অবস্থিত ভূতপূর্ব অযোধ্যা-রাজের বিরানব্বুইতম স্ত্রী হতে চলেছে। নবাবসাহেব তাঁকে প্রচুর টাকা দিয়েছেন তাঁকে নবাববাহাদুরের কাছে পৌঁছে দিতে। আমার পক্ষে এ কর্তব্য বড়ই অরুচিকর বোধ হচ্ছে। বেচারী নিরুপায়, তিনি তাঁর দুরবস্থা মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। নবাববাহাদুরের হারেমে তিনি চিরজীবন বন্দী হয়ে থাকবেন, এ কথা ভেবে তাঁর দুঃখের অন্ত নেই। তিনি বোটের মধ্যে আজ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এবং এ কথা জোরের সঙ্গে বলছেন যে তিনি রাজহারেমে কখনো জীবন থাকতে প্রবেশ করবেন না। আপনি সাহেব, যদি দয়া করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন, তা হলে আপনি হয়তো তাঁকে কোনো সদুপদেশ দিতে পারিবেন।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা করবেন?'

'নিশ্চয়—কারণ তিনি একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, তিনি নিজে যদি কোনো সাহেবের

সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, তা হলে তিনি নিশ্চয় এই বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারবেন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তাঁকে মুক্তি দিলে আপনি তার জন্য কি কৈফিয়ৎ দেবেন?'

ইহুদী ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় বললেন, 'সে অনেক রকম কৈফিয়ৎ দেওয়া চলতে পারে, যদি নবাবের অনুচরদের মুখবন্ধের কোনো ব্যবস্থা করতে পারি।'

'তার মানে, আপনি বলতে চান, টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করবেন?'

'সাহেব, আমি সেই কথাই বলছি।'

আমার মনে কৌতূহল জাগল। বন্দিনীর প্রতি সহানুভূতি জাগল আরও বেশি। অতএব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়ে গেলাম। যথাসময়ে তাঁর কামরায় প্রবেশ করতেই তিনি জালের মতন সূক্ষ্ম কাপড়ের ঘোমটা টেনে দিলেন মুখে। আমার মনে হল তিনি আমাকে দেখে কিঞ্চিৎ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আমিই প্রথম কথা বললাম। হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন?'

ভীরু কণ্ঠের জবাব—'হাঁ সাহেব।' তারপর একটু সঙ্কুচিতভাবে বলতে লাগলেন, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে আমার অভিভাবক মোজেসের সঙ্গে যদি আগে একটু আলোচনা করে নেন, তা হলে আমার দুঃখের কথা জানাবার কষ্ট থেকে আমি কিছু রেহাই পাই। তিনি আমার সব কথাই জানেন। সত্য কথা বলতে কি, আমার চেয়ে বেশিই জানেন, এবং তাঁর উপর আমার নির্ভরতা আন্তরিক।'

আমি বললাম, 'মোজেস আমাকে সবই জানিয়েছেন।'

'তিনি কি বলেছেন, আমাকে তিনি কোথায় নিয়ে চলেছেন? কি লজ্জাজনক জীবনে, কি অন্ধকার জীবনে, আমাকে নিক্ষেপ করতে নিয়ে চলেছেন তা কি বলেছেন তিনি? সে জীবন একজন ইহুদী মহিলার পক্ষে কি হীন তা কি তিনি বলেছেন?'

এর উত্তরে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম বলেছেন।

মহিলা দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। যেন ভবিষ্যতের সেই বেদনাময় জীবনটাকেই ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টির আড়ালে ঢেকে রাখলেন। তারপর বললেন, 'হায়! এই মুহূর্তে যদি আমার দুর্ভাগ্যের দুশ্চিন্তাকে চির বিস্মরণের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারতাম!'

তাঁর এই মনোবেদনায় আমার মনে সমবেদনা জাগল এবং আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর এই দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য করব। আমার এই কথায় তিনি মুহূর্তে মাথার ঘোমটা খুলে ফেলে জলভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'সাহেব, নবাবের হারেমের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার হাত থেকে এই অসহায়া ইহুদী কন্যাকে সত্যিই বাঁচিয়ে দেবেন ?'

মুহূর্তে আমার মনে মারাত্মক দুর্বলতা দেখা দিল, আমার বিচারশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি তাঁর কথায় রাজি হয়ে তাঁকে বোট থেকে উদ্ধার করে এনে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলাম।

ইহুদীকে এক হাজার টাকা দিলাম নবাবের অনুচরদের মুখ বন্ধ করতে। এক হাজার টাকা দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন, এ তো আশাতীত এবং এত টাকার দরকারও হবে না। মনে হল, টাকার চেয়েও আপাতত মহিলাটিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার গরজই তাঁর বেশি। আমার আরও মনে হল, ভদ্রলোক বাস্তবিকই মহিলাটির মঙ্গল চান, এবং সেজন্য আমার মন থেকে সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেল। তারপর মহিলাটির থাকবার ব্যবস্থা যখন একটা ঠিক হয়ে গেল তখন ইহুদী ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গের লোকজন সহ বিদায় হয়ে গেলেন। আমিও ক্যাম্পে ফিরে এসে একান্তে বসে ভবিষ্যতে আরও কি করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। আমি মনে মনে স্থির করলাম এই ইহুদী-কন্যার সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে, এখনও তার বয়স ষোল বছরের বেশি মনে হয় না। ভাবলাম তাকে বছর দুইয়ের জন্য কোনো বোর্ডিং স্কুলে রাখব, তারপর তাকে আমি বিয়ে করব। এইটি স্থির করার পর আমি শুয়ে পড়লাম। সকালে মনটা আরও স্ফূর্তিযুক্ত বোধ হল এবং তখনই বসে চন্দননগর কনভেন্টের অধ্যক্ষার কাছে ঐ ইহুদী-কন্যার ভর্তি করা বিষয়ে একখানা চিঠি লিখলাম। তাঁর উত্তর পাবার আগেই এক বৃদ্ধ ইহুদী আমার কাছে এলেন এবং ঐ কন্যার পিতা বলে পরিচয় দিলেন। তাঁর সঙ্গে এক বাঙালীবাবু ছিলেন, পোষাক দেখে মনে হল তিনি হাইকোর্টের উকিল। সঙ্গে আরও লোক ছিল, তারা শুনলাম ভূতপর্ব অযোধ্যা-রাজের অনুচরবৃন্দ। বাঙালীবাবুটি বললেন তিনি অযোধ্যা রাজের আইন-পরামর্শদাতা, তাঁর উপর হুকুম, তিনি আমার বিরুদ্ধে 'মেটেবুরুজের নবাবের বিবাহিতা পত্নীকে ভুলিয়ে নিয়ে নিজের রক্ষণাধীনে রাখার জন্য' আদালতে মামলা দায়ের করবেন।

এই অভিযোগ শুনে আমি তো স্তম্ভিত। মনে মনে ভয়ও পেলাম খুব। কারণ প্রকাশ্য আদালতে আমার নামে কলঙ্ক রটবে। জাল উকিল আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, কিছু টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেলুন, কিন্তু মেয়েটিকে তার বাবার হাতে ছেড়ে দিতেই হবে। তিনি মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে নিজে এসেছেন। আমি সব প্রস্তাবেই রাজি হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দিতে হবে ? কত দিলে আর গণ্ডগোল হবে না ?' উকিল বললেন, 'দশ হাজার টাকা।' তারপর অনেক বলেকয়ে অর্ধেকে রাজি করালাম। উকিলকে ঐ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়াতে সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কন্যাটিও চলে গেলেন। তাঁরা নৌকায় এসেছিলেন, নৌকাতেই ফিরে গেলেন, আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, যদিও এই প্রেমের খেলায় আমার ছ'হাজার টাকা জলে গেল !

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমি আবিষ্কার করি, ঐ ইহুদী মহিলা ভূতপূর্ব অযোধ্যা-রাজের স্ত্রীও নন বাগদত্তাও নন, তিনি একজন কুখ্যাত বারবনিতা, এবং তাঁর সাজানো পিতা এবং সাজানো উকিল এবং অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ—মস্ত বড় এক প্রতারকদলের লোক। যুবতী ইহুদী-কন্যা তাঁদের চুম্বকের কাজে নিযুক্ত। আমি প্রতারিত হয়েছি এ চিন্তা আমার মগজের ভিতর কণ্টকিত শায়কের মতন বিঁধে গেল। আমার মন তখন প্রতিহিংসার আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হয়ে উঠল। এই আবিষ্কারের পর তাদের শাস্তি পাওয়াতে আমার জীবনের যদি দশটি বছরও উৎসর্গ করতে হয়, তবে তাও আমি করতে রাজি এমন মনে হল।

মিস্টার রীড, আপনি কি আমাকে এ কাজে সাহায্য করতে পারবেন ? আপনার পছন্দমতো সময়ে ও স্থানে আমি দেখা করতে রাজি আছি। সুবিধা হলে আপনিও আমার চুঁচুড়ার ক্যাম্পে আসতে পারেন। দ্রুত উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

চিঠিখানা এইখানেই শেষ। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'কি মধুর রোমান্স রে বাবা !'

মিস্টার এন '—' আমার নির্দিষ্ট সময়ে লালবাজারে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, আমাদের সমস্ত আলোচনাই গোপনে শেষ হল। ঐ দলকে ধরতে হলে তাঁকে কি ভাবে আইনের আশ্রয় নিতে হবে সব বিস্তারিত বললাম। কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনে তিনি বড়ই নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। কারণ

আবার তো সেই আদালতের ব্যাপার— জানাজানির ব্যাপার। অতএব প্রতারকেরা স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করতে লাগল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁদের কথা কানে এলো।

এই ঘটনার এক মাসের মধ্যে দু'জন ধনী জমিদার এবং একজন রাজা কলকাতায় এলে এঁদের হাতে পড়েন এবং ঠিক একই কৌশলে এঁরা তাঁদের কাছে থেকে বহু টাকা ঠকিয়ে নিতে সমর্থ হন—ঠিক ঐ চুঁচুড়ার অফিসারের কাছ থেকে যেমন ভাবে নিয়েছিলেন।

ময়ূরপুচ্ছে কাক

কলকাতায় কত রকমের যে প্রতারক আছে তার সংখ্যা নেই। আমার বর্তমান কাহিনীর নায়ক প্রতারকরাজ ডানবার। তাঁর প্রতারণা সকল শ্রেণীর মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁব কৌশল পাকা শিল্পীর কৌশল। গ্রেফতার এড়াবার কৌশলও তাঁর এমন নৈপুণ্যপূর্ণ যে তাঁর কথা একটু বিস্তারিত করেই বলব।

ক্রিসমাস্-সন্ধ্যায় একদিন এক টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল হাওড়ার ওরিয়েণ্টাল হোটেলে। টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে রানীগঞ্জ থেকে। তাতে নির্দেশ ছিল দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্য আলো-হাওয়া যুক্ত বড় এবং উৎকৃষ্ট একখানা কামরা চাই। যাঁরা ঐ ঘর দখল করবেন, তাঁদের একজন পুরুষ আর একজন মহিলা। তারা ডাউন মেল ট্রেনে হাওড়া এসে পৌছচ্ছেন। মিস্টার ও মিসেস হল—তাঁরাই হোটেলের মালিক—খুবই উৎফুল্ল। প্রচুর মুনাফা করা যাবে এবারে এই দুজন ধনী অতিথির আগমনে। অতিথিদের আসবার আগে হোটেলের ভাল ঘরখানি চমৎকার সাজানো হল। কিন্তু হায়, মিস্টার ও মিসেস হল যদি জানতেন তাঁরা কে, তা হলে তাঁদের অভ্যর্থনার আয়োজনও ভিন্ন রকমের হত, বলা বাহুল্য। একথা কত সত্য যে, পুরুষ অথবা নারী মনে মনে যা চায় তা কত সহজে তারা বিশ্বাস করে। এবং যা তাদের অবাঞ্ছিত, তা তাদের বিশ্বাস করানো কত কঠিন। এক্ষেত্রে হোটেলের মালিকেরা চার্লস ডিকেন্সের 'গ্রেট এক্সপেকটেশনস'-এর মানুষদের সঙ্গেই তুলনীয়।

টেলিগ্রামে যেমন যেমন চাওয়া হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে ঘর সাজানো

হল, স্নানঘরে গরম জলের ব্যবস্থা হল, এবং যথাসময়ে ধনী অতিথিদ্বয় এসে পৌঁছলেন। দেখে মনে হল এঁরা স্বামী-স্ত্রী। লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর এবং তাঁর লেডির আগমনে যে রকম খাতির করা হত, এঁদেরও তেমনি খাতির করা হল। মিস্টার ও মিসেস হল-এর কি গদগদ ভাব! মুখে হাসি লেগেই আছে এবং এঁরা যেন তাঁদের কাছে বিনয়ের অবতার। আবার অতিথিরাও এমন ব্যবহার করলেন যেন এ খাতির তাঁদের স্বভাবতই প্রাপ্য। এবং যেন তা পাচ্ছেন তাঁদের চেয়ে মর্যাদায় খাটো লোকদের কাছ থেকে।

পরদিন সকালে (ক্রিসমাসের সকালে) ডানবার মিস্টার হলের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে সন্ধান নিচ্ছিলেন, ঘোড়া এবং উৎকৃষ্ট গাড়ি ভাড়া নেবার পক্ষে কলকাতার কোন্ প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে ভাল। তিনি ঠিক যে জিনিসটি চান তার সম্পর্কে তাঁকে বড়ই খুঁতখুঁতে মনে হল। ধনীর যেমন খেয়াল আর কি। 'বুঝতে পারলে, বুড়ো-ঘোড়া নয়, আর তোমার ঐ লক্কড় গাড়ি নয়, খুব জোরালো ঘোড়া এবং প্লেন অথচ সুন্দর গাড়ি চাই। কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?' —হাঁ, মিস্টার হল জানেন এসব কোথায় পাওয়া যায়। একটা প্রতিষ্ঠান তাঁর জানা আছে—সেখানে ঠিক মনের মতন জিনিসটি পাওয়া যাবে। চার ঘোড়ার গাড়ি থেকে বগী গাড়ি —সব সেখানে মিলবে। ডানবার বললেন, আমি মাত্র একখানা 'বারুশ' গাড়ি চাই। মাত্র! (তবে এর পর যে গাড়িতে তিনি চড়েছেন সেটি সরকারী গাড়ি এবং তার চেহারা খুব ভাল নয়, এবং যে ঘোড়া যে গাড়ি টেনেছে তাও সরকারি ঘোড়া—কিন্তু এটি প্রসঙ্গত বলা হল।) মিস্টার হল কি ডানবারকে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে? হাঁ, তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বৈকি। প্রতিষ্ঠানের নাম—মেসার্স ব্রাউন অ্যাণ্ড কো, ধর্মতলা স্ট্রীট। তাঁরা তো ডানবারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে খুবই ধন্য হয়ে গেলেন। এবং এই প্রতিষ্ঠানই ডানবারের তালিকার প্রথম শিকার।

বড়দিনের আমোদপ্রমোদের পর বিশ্রাম নিয়ে বেরোলেন তাঁদের ইচ্ছা পুরণ করতে। মিসেস ডানবার (কল্পিত অবশ্য) তাঁদের মনে যে কোনো অসদুদ্দেশ্য নেই তার প্রমাণ স্বরূপ সঙ্গে মিসেস হলকেও নিয়ে যেতে রাজি করালেন। তাঁরা মেসার্স ব্রাউন অ্যাণ্ড কো-র গাড়িতে চড়ে গেলেন মের্সাস জেলিকো অ্যাণ্ড কো-তে। তাঁরা কৃতার্থ হয়ে তাঁদের সমস্ত দামী জুয়েলারি সামনে মেলে ধরলেন। কিন্তু তাঁদের রুচিকে সহজে খুশি করা শক্ত। এটা

ভাল না, ওটার দাম এত হতেই পারে না ইত্যাদি। দামী পাথর দেখে মুখ বিকৃত করলেন। পাথর সেট করায় ত্রুটি খুঁজে বার করলেন। অবশেষে অনুগ্রহ করে হাজার টাকার রত্নালঙ্কার কিনলেন। জেলিকো অ্যাণ্ড কো একখানা চেক পেলেন এক হাজার টাকার মস্ত বড় ধনীর নামে (কেউ তাকে চেনে না)—নাম তাঁর লালা নন্দকিশোর সাহিব বাহাদুর দিল্লী সিটি।—অলঙ্কার প্রতিষ্ঠানটি যদি এর বদলে আউটরামের মর্মরমূর্তির নামে অথবা হাইকোর্টের নিকটস্থ ইডেন গার্ডেনের ঝর্ণার উপরে চেক পেতেন তা হলেও কোনো ইতরবিশেষ হত না। কারণ ঐ চেক দিল্লী অ্যাণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কের মারফৎ ভাঙানো যায় নি, কারণ ঐ বাহাদুর 'বিখ্যাত-অজ্ঞাত'-দের দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন মাত্র।

ডানবার-প্রতারণা-শিল্পের দ্বিতীয় পাঠ এইখানে সমাপ্ত হল। কিন্তু তাঁর উচ্চতর পাঠ দানের কাজ এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। চেক কাটার দিনেরই ঘটনা।

৩০শে ডিসেম্বর ডানবার হ্যামিলটন-এর দোকানে গিয়ে হাজির। এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি পৃষ্ঠপোষকতায় (ক্যাশ না দিয়ে) ধন্য করেছিলেন। সে হল ১৮৭২ সালের কথা। বিস্মৃতির দরুন এবং তা খুবই দৈবাৎ (অনেক কাজ কিনা, ভুল তো হতেই পারে)—তিনি আগের টাকা পরিশোধ করেন নি। কিন্তু সৎ পথে চলার একটা তাগিদ আছে তো? তাই তিনি এবারে সেই ক্ষতিপূরণ করতে এসেছেন। তিনি ভীষণ দুঃখিত যে এতদিনও বিলটি পড়ে আছে, কিন্তু আর নয় এবারে শোধ। তিনি আবার আউটরামের স্ট্যাচুর উপরে চেক দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হ্যামিলটন প্রতিষ্ঠান রাজি হলেন না। অতএব তিনি দুঃখের সঙ্গে বিদায় নিলেন। এবং তাঁর মহিলা সঙ্গিনীটিকে নিয়ে নতুন কোনো কর্ষণযোগ্য ভূমির সন্ধানে যাত্রা করলেন। হ্যামিলটনের হাতে কিছু ধাক্কা খেয়েও দমলেন না। অতঃপর ডানবার গেলেন মেসার্স নিউম্যান অ্যাণ্ড কো-র দোকানে, এবং সেখান থেকে ১২০ টাকার এঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি কিনে সেখানেও চেক দিলেন। তারপরের শিকার হলেন মেসার্স হালি অ্যাণ্ড কো। ডানবার লাহোর গীর্জা তৈরির কনট্রাক্ট পেয়েছেন কি না, তাই কিছু রঙ কিনলেন সেখান থেকে। পরবর্তী শিকার—মেসার্স বেকার অ্যাণ্ড ক্যাটলিফ, ও মেসার্স জেসফ অ্যাণ্ড কো। সে যা কিছু আনছে সব হোটেলে জমা করছে এবং হোটেলের বিলও

সেই পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত পাওনা হল ২০০ টাকা। মিস্টার হল টাকার দাবি করলেন। ডানবার যথারীতি চেক দিতে উদ্যত হলে মিস্টার হল হ্যামিলটনী (পূর্বোক্ত হ্যামিলটন অ্যাণ্ড কো) রীতিতে চেক প্রত্যাখান করলেন, বললেন, 'নগদ চাই।' তাতে ডানবার ভীষণ চটে গেলেন। মিস্টার হল কিন্তু অদ্ভুত সংযমের সঙ্গে বললেন, 'নগদ টাকা না পাঁওয়া পর্যন্ত আপনার কেনা জিনিসগুলো আমি আটকাব।'

একথায় ডানবার উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে গিয়ে একজন খ্যাতনামা ঋণদাতাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি চড়া-সুদে বিপন্ন লোককে টাকা ধার দিয়ে বাধিত করেন। তিনি ঐ জিনিসগুলি বন্ধক স্বরূপ নিয়ে হোটেলের বিল শোধ করে দিলেন, এবং উদ্বৃত্ত ৬০০ টাকা ডানবারকে দিলেন। অর্থাৎ মোট ৮০০ টাকা দিলেন। ডানবারও হোটেল থেকে সরে পড়লেন।

তারপর ১৮৭৫ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে ডানবারকে দেখা যায় গোয়ালনন্দ ডাকবাংলোয়। এখানে তিনি ব্রেভিট-মেজর অকল্যাণ্ড। এখানে এক হতভাগ্য টী-প্ল্যাণ্টারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর নাম মোজলি। তিনি রুগ্ন অবস্থায় স্বাস্থ্য লাভের জন্য ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দুজন দুই বিপরীত দিকের যাত্রী।

মিস্টার মোজলি ডাকবাংলো ত্যাগ করে কলকাতার দিকে যাবেন। তিনি খরচ মিটিয়ে দেবার জন্য ডাকবাংলোর খানসামাকে একশ টাকার নোট দিলেন ভাঙিয়ে দিতে। কিন্তু খানসামা নোট নিতে অস্বীকার করল। বলল, তার কাছে অত ভাঙানি হবে না। এইবার এলো ডানবারের সুযোগ। মিস্টার মোজলি যখন নোটখানা বার করছিলেন সে সময় ডানবার লক্ষ করেছেন তাঁর কাছে অনেক নোট আছে।

ডানবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, টাকা আমি দিচ্ছি। মিস্টার মোজলি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হলেন। তারপর এলো তাঁর বিদায়ের পালা। তিনি বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ ডানবারকে ব্রাণ্ডি ও সোডায় আপ্যায়িত করতে চাইলে ডানবার বললেন নিশ্চয়, আমাদের বন্ধুত্ব চিরস্মরণীয় হোক। কিন্তু কেনা জিনিস খেতে আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমার নিজের স্টক থেকে বার করছি। বলে এক বোতল শ্যাম্পেন বার করলেন এবং বললেন, এখানে যা বিক্রি হয় তা অত্যন্ত বাজে জিনিস, আমি তা কখনো খাই না।

দু'জনে শ্যাম্পেন দিয়ে বন্ধুত্ব পাকা করবার সময়, ডানবার হঠাৎ বললেন,

তিনি আসামে চলেছেন শিকার অভিযানে, কিন্তু এখন আবিষ্কার করলেন তাঁর কাছে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত খুচরো টাকা নেই। মিস্টার মোজলি যদি কয়েকশ টাকা দিয়ে তার বদলে কলকাতার ব্যাঙ্ক অভ বেঙ্গলের উপরে একখানি চেক নেন, তা হলে বড়ই উপকার হয়। অবশ্য কলকাতা পৌছনর আগে যতটা তিনি দিতে পারেন।

ইংল্যাণ্ড যাত্রীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মস্ত বড় সুযোগ। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়'—এবং সঙ্গে সঙ্গে নয়শত টাকার ন'খানা নোট ডানবারের হাতে গুণে দিয়ে নিজে কৃতার্থ বোধ করলেন। ডানবার চেকবই বার করে নয় শত টাকার চেক কেটে দিলেন ব্যাঙ্ক অভ বেঙ্গলের উপর।

বিভিন্ন বৃত্তির লোকের বিভিন্ন শ্রমে যে আর্থিক লাভালাভ ঘটে তা বিচিত্র। উপরের ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারছি কতক লোক এভাবে সামান্য পরিশ্রমেও বেশ সফলভাবে অর্থ উপার্জন করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, কবি সামান্য মানসিক শ্রমের দ্বারা মূল্যহীন একটুকরো কাগজকে মূল্যবান সম্পত্তিতে পরিণত করেন। একে বলা যেতে পারে প্রতিভার শক্তি। রথ্‌স্‌চাইল্ড এক শীট কাগজে সামান্য গোটাকত শব্দ লিখে তাকে কোটি টাকার সঙ্গে বিনিময়যোগ্য দলিলে পরিণত করতে পারেন। এ হচ্ছে মূলধনের শক্তি। কিন্তু আর্থিক মূল্যের দিক থেকে ডানবারের চাতুর্য কবির প্রতিভাকে অতিক্রম করে গেছে এবং তিনি যা করেছেন, তাতে রথ্‌স্‌চাইল্ড অবধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন। ডানবার দেখিয়েছেন, বিনা মানসিক পরিশ্রমে একখণ্ড বাজে কাগজকে মূল্যবান দলিলে পরিণত করা যায়। এবং কি ভাবে নিজে অর্থহীন হয়ে এবং ব্যাঙ্কে এক পয়সা না রেখেও তাঁর চেককে নগদ টাকার সমমূল্যে ভাঙনো যায়। অবশ্য এ কথাটি তাঁর হাতের শিকারেরা যথাসময়ে ভালভাবেই টের পেয়েছেন।

চোরদের নিজেদের মধ্যে একটা সততা থাকে, কিন্তু ডানবারের তাও নেই, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যে লোকটি তাঁর সবচেয়ে বেশি উপকার করেছে, তার উপরেই তিনি সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যে লোকটি তাঁর জাল চেক ছেপে দিয়েছে, তাকে তার কাগজের দাম ছাপার দাম কিছুই তিনি দেন নি, উপরন্তু তার আরও কিছু নগদ টাকা ঠকিয়ে নিয়েছেন। তিনি তার ৩৫ টাকার বিল শোধ করবার সময় এমন এক ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলেন, যে ব্যাঙ্কে তাঁর কোনো টাকাই ছিল

না। উপরন্তু চেক লেখবার সময় তিনি তাকে চলিয়াতি করে বললেন, 'আমি হিসাবের স্থবিধার জন্য খুচরা টাকার চেক বড় কাটি না। আমি তোমাকে ৫০ টাকার চেক দিচ্ছি, তুমি তোমার ৩৫ টাকা বাদে বাকি ১৫টি টাকা আমাকে নগদ দিয়ে দাও।' মুদ্রাকর এতে আপত্তির কোনো কারণ দেখতে পায় নি। অতএব তিনি পঞ্চাশ টাকার চেক লেখা শেষ করলেন এবং ঐসঙ্গে মুদ্রাকরকেও শেষ করলেন।

কিন্তু আমি মূল বিষয় ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করছি কেন। মোজলির প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ডানবার এবং তিনি গোয়ালনন্দ ডাকবাংলোয় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেন। যাবার সময় দুজনেই পরস্পরের প্রতি চিরবন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মোজলি কলকাতা গিয়েই চেক ব্যাঙ্কে জমা দেন নি। দীর্ঘ ভ্রমণে কিছু ক্লান্ত ছিলেন। পরদিন চেক ব্যাঙ্কে ভাঙাতে গিয়ে সবিস্ময়ে জানতে পারলেন মেজর অকল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে কোনো টাকা নেই, কাজেই চেক ডিজঅনার্ড হয়ে ফিরে এলো। রুগ্ন মোজলির মানসিক অবস্থা কি হল সহজেই অনুমেয়। ঐ টাকার মধ্যে তাঁর স্বদেশে ফেরবার ভাড়া ছিল, ঐ নয়শত টাকাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। ব্যাঙ্ক থেকে বলা হল ঘটনাটি পুলিসে জানানো কর্তব্য। অতএব তিনি সোজা লালবাজারে এসে রিপোর্ট করলেন। কলকাতার অন্যান্য ব্যবসায়িগণ রাম-প্রতারক ডানবারের হাতে কি ভাবে ঠকেছেন সে সংবাদ শহরের উপর যেন হঠাৎ একসঙ্গে বজ্রের মতন ধ্বনিত হয়ে উঠল। এবং তার কয়েক ঘণ্টা পরেই পাওয়া গেল মিস্টার মোজলির রিপোর্ট। সমস্ত খণ্ড খণ্ড ঘটনা একত্র জুড়ে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, ডানবার আর মেজর অকল্যাণ্ড একই ব্যক্তি। তৎক্ষণাৎ মেজর অকল্যাণ্ডকে গোয়ালনন্দ ডাকবাংলোয় গ্রেফ্তার করার জন্য তার পাঠানো হল। কিন্তু ডানবার ঘুঘু লোক, তাঁকে ধরা কি সহজ কথা? তিনি তো জানতেন মিস্টার মোজলি কলকাতা পৌছে চেক ভাঙাতে গেলেই সব প্রকাশ হয়ে পড়বে, কাজেই তিনি মোজলিকে রওনা করে দিয়েই ওখান থেকে পাততাড়ি গুটোবার বন্দোবস্ত করলেন। ডানবার ওরফে মেজর অকল্যাণ্ড আসামে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু তা না গিয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গের মহিলার জন্য কলকাতার দুখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে কলকাতা রওনা হলেন। রওনা হলেন বটে কিন্তু রামঘুঘু কলকাতা পর্যন্ত না এসে ব্যারাকপুরে

ব্রেকজার্নি করলেন। কারণ সোজা কলকাতা আসা মানে সিংহের মুখে প্রবেশ করা। তাই এই কৌশল। তিনি ব্যারাকপুরে নেমে গঙ্গার ঘাট পার হয়ে এলেন শ্রীরামপুরে। এখান থেকে প্রথম শ্রেণীর দুখানা টিকিট কিনলেন এলাহাবাদের। এই কৌশল খাটানোতে পুলিস তাঁদের অনুসরণ করার কোনো পথ পেল না। ইতিমধ্যে মিস্টার মোজলির দেওয়া দুখানা কারেন্সি নোট কারেন্সি অফিস এবং ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙানি দেওয়া বন্ধ হয়ে আমার হাতে এলো। [তখন একশ টাকার নোটের নম্বরের হিসাব রাখা হত।] এই সূত্র অবলম্বন করে আমি অবিলম্বে ডানবার ওরফে মেজর অকল্যাণ্ডের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। দুখানা নোটই শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে এসেছে জানতে পারা গেল। বুকিং ক্লার্ক টিকিট বিক্রির সময় দুখানা নোট পেয়ে দুখানা এলাহাবাদের প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিয়েছেন কর্নেল অ্যাবারক্রম্বি নামে পরিচয় দেওয়া একজন ভদ্রলোককে। এই খবর পেয়ে আমি টিকিট বিক্রির তারিখ ও নম্বর টুকে নিয়ে এলাহাবাদ রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে সবিস্ময়ে শুনলাম মেজর অকল্যাণ্ড ওরফে কর্নেল অ্যাবারক্রম্বি সেখানে রয়্যাল এঞ্জিনিয়ারের সামরিক পদাধিকারী লেফটেন্যান্ট ডাফ নামে পরিচয় দিয়েছিলেন। তখনই বুঝলাম এলাহাবাদ একটি মিলিটারি ঘাঁটি, সেখানে নিজের পদকে একটু খাটো করে না আনলে মুশকিলে পড়তে হত। কারণ মেজর পরিচয়ে সবার দৃষ্টি পড়ত তার উপর। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ ওস্তাদ। এলাহাবাদ সামরিক ঘাঁটি না হলে এই রামঘুঘু নিশ্চয় মেজর-জেনারেল কেউ রূপে পরিচয় দিতেন।

আমি জানতে পারলাম লেফটেন্যান্ট ও মিসেস ডাফ এলাহাবাদ স্টেশনের রেলওয়ে রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে প্রচুর আহারাদি করে খুব জোর গলায় প্রচার করলেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী মুজাফ্‌ফরনগরে যাচ্ছেন। অতএব রিফ্রেশমেণ্ট-রুমের ইউরোপীয়ান ম্যানজারের উপর আদেশ হল ঐ স্টেশনের জন্য দুখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট 'কিনে দিতে। কেনার পর কি হল সে বিষয়ে পরবর্তী সন্ধানের পরে যা জানা গেছে, তা বলছি। টিকিট দুখানা ডাফ প্ল্যাটফর্মে গিয়ে একজন সামরিক অফিসার ও তাঁর স্ত্রীকে বিক্রি করে দেন। তাঁরা রুরকি যাচ্ছিলেন। টিকিট তাঁদের কাছে কিছু কম দামে বিক্রি করা হল, কারণ তিনি টিকিট কেনার পর মুজাফ্‌ফরনগর যাওয়া বিষয়ে মত বদল করেছেন। রামঘুঘুটি রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে বসেই আবিষ্কার করেছিলেন যে

রুরকি যেতে হলে মুজাফ্‌ফরনগরের টিকিট কিনতে হবে, এবং উক্ত সামরিক অফিসার ও তাঁর স্ত্রী ঐ পথে রুরকি যাবেন। তাই টিকিট দুখানা তাঁদের কাছে বিক্রি করাও সহজ হল। যাঁরা কিনলেন তাঁরা ঘূণাক্ষরেও জানতে পারলেন না যে, বিক্রেতা পুলিসকে ভ্রান্তপথে চালনা করার জন্যই এ কাজ করলেন। এ সব পরিকল্পনা রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে বসে মগজের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে তৈরি হয়ে গেছে। পরবর্তী সন্ধানের পর এই দুই নিরপরাধ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে রুরকি পর্যন্ত গিয়ে তবে রামঘুঘুর জোচ্চুরিটা বুঝতে পারা গিয়েছিল। আমি টিকিটের সূত্র ধরে মুজাফ্‌ফরনগর গিয়ে স্টেশন-মাস্টারের কাছ থেকে জানতে পারলাম ১৪ই জানুয়ারি (১৮৭৫) রাত্রে যে ১৯৩ ও ১৯৪ নম্বরের দুখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কালেক্ট করা হয়েছিল তা এক মহিলা ও তাঁর স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া। ভদ্রলোক সামরিক অফিসার। তাঁরা স্টেশন থেকে সোজা ডাকবাংলোয় চলে গেছেন। ডাকবাংলোয় পৌছে আমি জানতে পারলাম তাঁরা একখানা ডাক গাড়ি ভাড়া করে রুরকি চলে গেছেন। তার আগে তাঁরা কিছু খাবার খেয়েছেন ওখানে। যে গাড়িতে তাঁরা গিয়েছিলেন সৌভাগ্যবশত সেখানাই আমি পেয়ে গেলাম, এবং তাতে করে রুরকি গিয়ে পৌছলাম। পৌছনোর পরে ডাক গাড়ির চালক আমার উদ্দিষ্ট দুজন যাত্রীকে যেখানে পৌছে দিয়েছে, সেইখানে নিয়ে গেল। কিন্তু হায়! আমি যাঁদের অনুসরণ করে এতটা পথ এলাম, এঁরা তো তাঁরা নন! পাঠক, আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝুন। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে সব বলাতে তবে এর মধ্যে যে চালাকিটি ছিল তা বুঝতে পারলাম। অর্থাৎ প্রতারক কি ভাবে ওঁদের কাছে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে টিকিট বিক্রি করেছিল জানতে পারামাত্র বুঝলাম, এ কাজ শুধু আমাকে জব্দ করাব জন্যই। রামঘুঘুটি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছে!

কিন্তু ডিটেকটিভরা এ ধরনের নৈরাশ্যে অল্পদিনেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাদের কাজে এ রকম কত হতাশার দেখা মেলে, এবং এমন অবস্থায় সবকিছু সহজে গ্রহণ করার অভ্যাসটাও হয়ে যায়। রুরকিতে আমি এঁদের আতিথ্যে দুটি দিন কাটালাম। তাঁরা আমাকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করলেন। আমি এঁদেরই ধরে কিনা বিজয়গর্বের সঙ্গে কলকাতা নিয়ে যাব, এমন আশা করেছিলাম!

কলকাতায় আমার ঠিকানা জানিয়ে তার পাঠিয়ে দিলাম, এবং পরবর্তী

নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। রুরকি আসার দ্বিতীয় দিনেই কলকাতা থেকে জরুরি তার পেলাম—জবলপুরের এক পার্সী ভদ্রলোক ও এক হোটেল মালিককে প্রতারণা করে কে একজন বহু টাকা নিয়ে সরেছে। এদের উপর কি ধরনের প্রতারণার জাল ফেলা হয়েছিল তা বিচার করে বোঝা গেল, ডানবার বেশি দূরে নেই। এলাহাবাদে ডানবার যে কৌশল খাটিয়েছিল তার উদ্দেশ্যও এতে স্পষ্ট বোঝা গেল। অর্থাৎ সে মুজাফ্‌ফরনগরে যাওয়ার ভান করে গিয়ে পৌঁছেছে জবলপুরে। আমিও তৎক্ষণাৎ জবলপুর অভিমুখে যাত্রা করলাম। এলাহাবাদ পৌঁছে আগে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে সন্ধান নিতে গেলাম, কলকাতা থেকে আমার নামে কোনো টেলিগ্রাম এসেছে কি না। শুনে স্তম্ভিত হলাম দুখানা টেলিগ্রাম মিস্টার রীডের নামে এসেছিল, কিন্তু মিস্টার রীড পূর্বদিন, কোনো তার এলে জবলপুরে ফেরৎ পাঠাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী সে তার তাঁরা জবলপুরে পাঠিয়েছেন।

হায় ভগবান! আবার সে আমাকে বিক্রি করল! আমি সিগন্যালারকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবে তা ফেরৎ দেওয়া হল। তিনি জানালেন, এবং খুবই অনিচ্ছার সঙ্গে যে, জবলপুর থেকে জরুরি তার এসেছিল, 'কলকাতার পুলিস থেকে মিস্টার রীডের নামে কোনো তার এসেছে কি না।' আমি জানিয়ে দিলাম 'দু'খানা এসেছে। তিনি জানালেন 'তা ফিরে পাঠাও।'

আমি সিগন্যালারকে জানালাম, আমিই রীড, আমারই নামে সে দুখানা তার এসেছিল, আমারই তা প্রাপ্য। আমাকে দেখান, কি লেখা ছিল তাতে। সিগন্যালার বলল, 'একজনের নামেই এসেছিল, এবং যাঁর নামে এসেছিল তাঁকেই সেইসব কথা পুনরায় টেলিগ্রাফ করে পাঠানো হয়েছে, অতএব দ্বিতীয় কোনো লোককে তা আমরা দেখাতে পারি না, সেটি আইন বিরুদ্ধ হবে।'—সিগন্যালার আমাকে সোজাসুজি বলল না যে সে আমাকে প্রতারক মনে করছে, কিন্তু তার হাবভাব দেখে বুঝলাম সে তাই মনে করেছে।

আমি খুবই বিচলিতভাবে টেলিগ্রাফ অফিস থেকে চলে এলাম। তারপর আমি স্টেশন প্লাটফর্মে এসে পায়চারি করছি আর ভাবছি, ডানবার বুঝল কি করে যে আমি তাকে অনুসরণ করছি, এমন সময় মনে পড়ল সে নিশ্চয় কলকাতার কাগজে তার কীর্তিকাহিনী পড়ে সব টের পেয়ে গেছে। কারণ

তখন কলকাতার সব কাগজে ডানবারের প্রতারণার কথা খুব ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। ডানবার নিশ্চয় আমার চালচলন লক্ষ করে চলেছে, এবং এখন যখন সে আমার নামের টেলিগ্রামগুলো কৌশলে হাত করে সব জেনে ফেলেছে, তখন তাকে ধরা শক্ত হবে। এইসব মনে মনে ভাবছি, আর ভাবছি আমার পরবর্তী চাল কি হবে, এমন সময়ে স্থানীয় ইউরোপীয় পুলিস ইন্সপেক্টর আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম ডানবার কি না।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'না, আমার নাম ডানবার নয়, আমাকে যদি তাঁর সঙ্গে এখনই কেউ দেখা করিয়ে দিতে পারেন, তা হলে তাঁকে আমি যথেষ্ট টাকা দিতে রাজি আছি।'

ইন্সপেক্টর বলতে লাগলেন, 'আমার একথা জিজ্ঞাসা করার হেতু এই যে টেলিগ্রাফ অফিস থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে আপনি টেলিগ্রাফ অফিস থেকে কলকাতার পুলিসের পাঠানো কিছু খবর বার করে নেবার চেষ্টা করেছেন। এবং যেহেতু ঐ খবরে একমাত্র ডানবার উপকৃত হতে পারে, সেই হেতু আপনাকেই আমরা ডানবার মনে করতে বাধ্য হচ্ছি। এলাহাবাদ এবং জবলপুর এই দুটি স্থানে একই সঙ্গে একজন মিস্টার রীড থাকতে পারেন না।' আমি তাঁকে বৃথাই বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমিই কলকাতা ডিটেকটিভ বিভাগের রীড। যে লোকটি জবলপুরে আমার নামে পরিচয় দিচ্ছে সেই লোকটিই প্রতারক, এবং আমি তাকেই ধরব বলে এতদূর এসেছি। অতএব আমাকে আটক রাখলে সে পালাবার সুবিধা পেয়ে যাবে। আমার সমস্ত অনুরোধ বৃথা হল। আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, এবং সেখানে আমার কপালে জুটল হাজত বাস। তারপর কলকাতায় খবর পাঠানো হল। ফলে একটি ট্রেন ধরতে পারলাম না। আমার শিকার, পালাবার জন্য অতিরিক্ত চব্বিশ ঘণ্টা সময় পেয়ে গেল।

খালাস পাবার পর যত শীঘ্র সম্ভব জবলপুরে চলে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি যা ভেবেছি তাই—পাখী উড়ে গেছে। এখানে এসে জানতে পারলাম ডানবার ও তাঁর সঙ্গিনী এখানে স্যার পীটার ও লেডি ডাফ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

এইখানে উক্ত মাননীয় ভদ্রমহোদয় ও তাঁর সঙ্গিনী স্থানীয় লোকদের নিজেদের জাঁকজমকে অভিভূত করে দিয়েছিলেন, অন্ততপক্ষে হোটেলের মালিকদের তো বটেই। যে হোটেলে উঠে স্যার পীটার সেই হোটেলকে ধন্য

করেছিলেন, তার কর্ত্রী ডিনারে টার্কি পাখীর মাংস পরিবেশন করতে পারেন নি, এবং প্রতি বোতল শ্যাম্পেনের জন্য ওদের কাছ থেকে মাত্র চার টাকা দাম নিয়েছিলেন। এই দাম দেখে সার পীটার লেডি ডাফকে বললেন, (এবং এত জোরে যাতে হোটেলের কর্ত্রী শুনতে পান) 'বিষ—বিষ খাচ্ছি—স্রেফ বিষ, আমি জীবনে ছ টাকার নিচে কোনো শ্যাম্পেনের বোতল কিনি নি।' লেডি ডাফ তার উত্তরে বললেন, 'এরা তো আমাদের রুচির সঙ্গে পরিচিত নয়, পদস্থ লোকদের কিভাবে মনোরঞ্জন করতে হয় তা জানে না। তাই সাধারণ লোকে যা পছন্দ করে তাই রাখে। তাই, যা পাওয়া যাচ্ছে আপাতত তাইতে খুশি থাক। কিন্তু বেশিদিন তো এভাবে থাকা যাবে না, কিংবা হোটেল বদল কর।'

এই সামান্য কথোপকথনের ফল ফলল আশানুরূপ। পরদিন তাঁদের টার্কি পাখীর মাংস পরিবেশন করা হল, এবং শ্যাম্পেনের স্বাদ ও গুণ বদল না হলেও তার দাম বদল হল। এবং এতে সার পীটার সন্তুষ্ট হলেন। তারপর হোটেলের বিল শোধ করে, বহু টাকা ঋণ সংগ্রহ করে মাননীয় ভ্রমণকারীগণ জবলপুর থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। যাঁরা টাকা ধার দিয়েছিলেন তাঁদের টাকা ফিরে পাওয়ার আশা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

তারপর ডানবারের খবর শোনা গেল, তিনি জবলপুর শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে মার্বল রকস-এ গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি হয়েছিলেন রুবি, এবং তাঁর পদ হয়েছিল সামরিক বিভাগের মেজরের। তিনিই যে ডানবার তা এখানকার ডাকবাংলোর খানসামার হাতের পান্না বসানো আংটি দেখেই বোঝা গেল। ওটা কলকাতার লুটের জিনিস। তিনি খানসামাকে ওটা বখ্‌শিস দিয়েছিলেন, কারণ ঐ খানসামা তাঁদের ভোপালে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সে পথ কঠিন পথ, তাই ঐ আংটিটি কৃতজ্ঞতার পুরস্কার।

স্থানীয় কাগজে ডানবারের কথা নিয়ে অনেক মজার খবর বেরিয়েছিল। সে সবই ডানবারের পলায়নের বিস্তারিত সংবাদ।

ডানবারের কথা এরপর শোনা যায় শাপুরে। সেখানে তিনি সেজেছিলেন স্কুল ইনসপেক্টর। তিনি এখানে আসবার পরে বাহন এবং পদপ্রদর্শক বদল করেছিলেন। এখানকার এক গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রয়োজনীয় সবই তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। ডানবার

স্কুলের ছাত্রদের ডাকিয়ে একত্র করে তাদের মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিলেন, এবং ভিজিটর্স বুক বা পরিদর্শকের খাতায় লেখা তাঁর মন্তব্য থেকে জানা যায় তিনি ছেলেদের বিদ্যা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখানে তিনি হয়েছিলেন মিস্টার লাভেট। তিনি লিখছেন—

"শাপুরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আমি এখানকার স্কুলপরিদর্শন করি। ছেলেদের উপস্থিতির সংখ্যা দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। ৪০ জনের বেশি ছাত্র উপস্থিত ছিল। উপরের ক্লাসের ছেলেদের ভূগোল ও ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তরে আমি খুব খুশি হয়েছি। ছোটরাও রীডিংএ ও শব্দের বানানে পারদর্শী। স্কুলের শিক্ষককে খুবই বুদ্ধিমান মনে হল, তিনি সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন এই স্কুলে। যখন আমি আবার এ পথে ফিরব, তখন আশা করছি ছেলেদের আরও ভালভাবে পরীক্ষার সুযোগ পাব। এই দূর অঞ্চলেও শিক্ষার এই প্রসার আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই এই স্কুলের বিষয় উত্থাপন করব।"

(স্বাক্ষর) এস. ই. লাভেট এম. এ.

স্কুলের শিক্ষক তো এই মন্তব্যে প্রায় নাচতে লাগলেন। এবারে তাঁর বেতন বৃদ্ধি ঠেকায় কে। কাজেই তিনি ঐ প্রতারককে যতভাবে পারেন সাহায্য করে কৃতার্থ হলেন। জবলপুরে ডানবার টাকা নিয়েছিলেন এক পার্সী মহাজনের কাছ থেকে। কঠিন মানুষের মনকেও যে ছলনা দিয়ে কাবু করে ফেলা যায় এটি তার একটি বড় প্রমাণ।

ডানবার ভোপালে পৌছেছিলেন বেগমের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হবার আগেই। তিনি সেখানে পি. অস্টিন. সি. ই.। সেখানে তাঁর কি খাতির! কি সম্মান! দু ঘোড়ার একখানা গাড়ি তাঁদের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। স্বয়ং বেগমের হুকুমেই শুধু এ সম্মান ইউরোপীয়ানরা পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাঁকে সমস্ত শহর ও দুর্গ দেখে বেড়াবার হুকুম দেওয়া হল।

তারপর ডানবার ধরা পড়ল কলকাতা ফেরবার পথে—জবলপুর স্টেশনে। সেখানে এই উপলক্ষে বিরাট ভিড় জমে গিয়েছিল।

এ কাহিনী শেষ করার আগে ই-আই ও জি-পি রেলওয়ের অফিসারগণ আমাকে ডানবারকে ধরার জন্য যে অবাধ সুযোগ দিয়েছিলেন যে-কোনো গাড়িতে, প্যাসেঞ্জার, মেল, মালগাড়িতে, এবং যথা ইচ্ছা নামা বা ওঠার যে ব্যবস্থা করেছিলেন, সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

‘গল্পের চেয়ে ঘটনা বেশি চমকপ্রদ’

ডিটেকটিভদের জীবনেও এমন এক একটা মুহূর্ত আসে যখন হত্যা চুরি জুয়াচুরি প্রতারণা জালিয়াতি প্রভৃতি দুষ্কার্যের নায়কদের পিছনে ধাওয়া করার চেয়ে মানুষের উজ্জ্বলতর দিকের চিন্তা করলে ঢের আরাম বোধ হয়। আমি এই দিকের একটি কাহিনী বলব। এটি বাস্তব ঘটনা। এতে একটি তরুণীর জীবনের একটি মহৎ দিকের পরিচয় পাওয়া যাবে। কি কষ্টসাধ্য পরীক্ষার ভিতর দিয়ে সে তাকে যেতে হয়েছিল, তা ভাবলে বিস্ময়ের চেয়েও মনে আনন্দ জাগে বেশি। আত্মত্যাগের এবং নিঃস্বার্থ চরিত্রের চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত এটি।

একটুখানি ভূমিকা: কলকাতার ইউরোপীয় বাসিন্দারা যাঁরা স্ট্র্যাণ্ডের দিকে সান্ধ্যভ্রমণে বেরুতেন, তাঁরা নিশ্চয় এবলানা নামক প্রকাণ্ড জাহাজ-খানার কথা মনে রেখেছেন। এখানি কয়েক বছর আগে ৮ নম্বর এসপ্ল্যানেড জেটিতে বাঁধা থাকত। বাঁধা থাকত প্রতিবছর ৭৬ দিনের সময়। [এই জাহাজের কথা স্নানের মাশুল ফাঁকি দেওয়ার কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে।]

এবলানার অধিনায়ক এ জাহাজের একজন অংশীদারও ছিলেন। বন্দরে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। কলকাতায় তিনি অনেককেই বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। তাঁর নাম ক্যাপটেন উইলসন। প্রাচীন যুগের ইংরেজ জেণ্টলম্যানদের তিনি এক মহৎ দৃষ্টান্ত। জাহাজে তিনি কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতেন। কিন্তু তিনি জাহাজের কর্মীদের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করতেন। তাঁর চেয়ে বেশি উদার অন্য কোনো জাহাজের কম্যাণ্ডার কখনো ছিলেন, এমন তো শোনা যায় না। কয়েক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বজায় ছিল। প্রিন্সেপ্‌স ঘাটে যখন আমি জলপুলিস ছিলাম, সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। জল ছেড়ে পুলিস কম্পাউণ্ডে উঠে এলেও আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। এমন কি তিনি বন্দরে এলে আমার সঙ্গেই প্রথম দেখা করতেন।

শেষবারের আগের বারে এবলানা তার প্রিয় কম্যাণ্ডারকে বহন করে

এসে ভিড়ল কলকাতার বন্দরে। ক্যাপটেন উইলসন সেদিন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করলেন। সেটি ডিসেম্বর মাস। সিঁড়ির গোড়ায় যে কনস্টেবল ডিউটিতে ছিল তার হাতে কার্ড পাঠালেন আমার কাছে। আমি ছুটে এলাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে, এবং উচ্ছ্বসিতভাবে করমর্দন সমাপ্ত করে তাঁকে উপরে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। সে সময়ে আমি একাই ছিলাম, স্ত্রী ও অন্যান্যরা সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছিল। একটুক্ষণ সাধারণ বিষয়ে আলাপ করার পরেই আমি আমার বন্ধুর হাবভাবে সামান্য একটু অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করলাম। মনে হল, তিনি কি যেন ভাবছেন এবং সে বিষয়ে আমাকে কিছু বলতে চান, কিন্তু হয় তো বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে হঠাৎ বলতে সঙ্কোচ বোধ করেছেন।

আমি এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করলাম। অর্থাৎ তাঁর মনের কথা যাতে তিনি সহজে প্রকাশ করতে পারেন এমনভাবে আলাপ আরম্ভ করলাম। বললাম, 'ক্যাপটেন উইলসন, আশা করি সমুদ্রপথটা বেশ নির্বিঘ্নেই পার হয়ে এসেছেন, এবং জাহাজের কর্মীরাও আপনাকে কোনো অসুবিধায় ফেলেনি?'

ক্যাপটেন উইলসন তার উত্তরে বললেন, 'সত্য কথা বলতে কি, মিস্টার রীড, সাধারণ ভাষায় যাকে বলে আরামের ভ্রমণ, ঠিক তা আমাদের হয় নি। আফ্রিকার দক্ষিণে আবহাওয়ার অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল, সেজন্য বেশ কিছু অসুবিধায় পড়েছিলাম। তার জন্য অবশ্য আমরা বেশ তাড়াতাড়িই আসতে পেরেছি। জাহাজে কোনো মদের চালান ছিল না, কাজেই তা থাকলে কর্মীদের হাতে পড়ে তা কিছু কিছু খালি হবার যে আশঙ্কা থাকত তাও ছিল না, অতএব সেদিক থেকে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও হয় নি। তা ভিন্ন তাদের বিচারক রবার্ট সম্পর্কে অনেক বলেছি, তাতেও তারা ভাল ব্যবহারের কিছু প্রেরণা পেয়েছে। ভাল কথা তিনি কি বেঁচে আছেন?'

আমি বললাম, 'বেঁচে আছেন এবং বেশ সুস্থ আছেন, তবে লালবাজার স্ট্রীটের বিচারালয়ে আর তাঁকে দেখা যাবে না।

ক্যাপটেন উইলসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

আমি বললাম, 'লেফটেনান্ট গবর্নর তাঁকে জজের আসন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।'

'তিনি এখন কি করছেন?'

আমি বললাম, 'বাকি জীবনের জন্য তিনি স্টেশনারি হয়েছেন।'

'তার মানে অনড় হয়েছেন, আর তাঁর উন্নতির কোনো আশা নেই ?'

'না তা ঠিক নয়। তিনি এখন স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি বিভাগের সুপারিনটেনডেণ্ট হয়েছেন।'

[ধ্বনির দিক দিয়ে Stationary (অচল) ও Stationery (লিখন সরঞ্জাম) এই দুটি শব্দ কানে একই রকম শোনায়, তাই এক্ষেত্রে রসিকতার একটি সুযোগ আছে।]

আমি জাজ্‌ রবার্টসের নিজের ব্যবহৃত রসিকতাটারই পুনরাবৃত্তি করলাম ক্যাপটেন উইলসনের কাছে। তারপর বললাম, 'কিন্তু আমি আলোচনাকে বোধ হয় আপনার আলোচ্য বিষয় থেকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে চলেছি। আপনার মুখের কিছু চিন্তাযুক্ত ভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে বিশেষ কোনো বিষয় জানাতে এসেছেন।'

'রীড! আশ্চর্য! এবারে আপনি ঠিক জায়গাটাতে ঘা মেরেছেন। আপনার কাছে একটি বিশেষ কথা বলব বলেই এই অসময়েও এসেছি। আর ভূমিকা না করে আমি এবারে সোজা সেই বিষয়টিই উত্থাপন করছি।'

লণ্ডন থেকে জাহাজ ছাড়বার আগে আমি এক যুবককে স্টুয়ার্ডরূপে জাহাজে নিযুক্ত করি। সে জোসেফ স্যাণ্ডস্‌ নামে স্বাক্ষর করেছে দলিলে। প্রথমে স্টুয়ার্ডের সমস্ত দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ছিল, সে আবেদন করেছিল স্টুয়ার্ডের সহকারীরূপে কাজ করবে বলে। তার চেহারাটি আমার বেশ পছন্দ হল, তাই তাকে বললাম, স্টুয়ার্ডের একজন সহকারী তো জাহাজে রয়েছে, একই পদে দুজনের দরকার নেই, তবে তুমি যদি টেবিলে খাবার পরিবেশন কর এবং ভাঁড়ারের হিসাবপত্র রাখ, তা হলে আমার পক্ষে খুব সুবিধাজনক হয়। আমাদের একজন ভাল পাচক আছে, সে বাকি কাজ করবে, টেবিল পরিষ্কার করা এবং ভাঁড়ার গুছিয়ে রাখা, জাহাজের অন্য কোনো ছোকরাকে দিয়ে অনায়াসে হতে পারবে। তাতে স্যাণ্ডস্‌ স্টুয়ার্ডের পুরো দায়িত্ব নিতে রাজি হল এবং স্টুয়ার্ডরূপেই খাতায় সই করল। কিন্তু কয়েক দিনের কাজের পর আমার মনে সন্দেহ জাগল এই জোসেফ স্যাণ্ডস্‌ আসলে একটি মেয়ে, পুরুষের পোষাকে আছে। সে মাঝে বুকের ভিতর হাত দিয়ে কার্ডে আঁটা ছোট্ট একখানি ফোটাগ্রাফ বার করে তাতে বারবার চুম্বন করে, এবং তার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তারপর আবার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এমনি অবস্থায় আমি তার কাছে এসে পড়াতে

সে চমকে উঠেছে। এ রকম একাধিকবার ঘটেছে। পরে আবিষ্কার করেছি ঐ ফটোগ্রাফখানা একটি তরুণ যুবকের। সে যদি নিজে পুরুষ হত তা হলে তার কাছে কোনো মেয়ের ফোটোগ্রাফ থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তা নয় কেন? এতেই আমার মনে সন্দেহ জেগেছে, কিন্তু আমি একথা গোপন রেখেছি, কাউকে বলি নি।

স্যাণ্ডস্ যেভাবে কাজ করছে তাতে আমার অসন্তুষ্ট হবার কোনো কারণই ঘটে নি। ইতিপূর্বে এমন কোনো স্টুয়ার্ড পাই নি যাকে এর চেয়ে বেশি কাজের বলতে পারি। হিসাবপত্র সে নির্ভুলভাবে রাখে, এবং ক্যাবিন ও ভঁাড়ার ছবির মতো সাজিয়েগুছিয়ে রাখে। অতএব তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, এবং সে যে মেয়ে পুরুষবেশে প্রতারণা করছে এমন কথাও বলছি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এর ভিতরে কোনো গভীর রহস্য আছে। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, স্যাণ্ডস্ শিক্ষিতসমাজের লোক। আমি তাকে ফরাসী ও জারমান বই পড়তে দেখেছি এবং সেই বইয়ের মার্জিনে নিজহাতে নোট লিখেছে তাও দেখেছি। কিন্তু সে হাতের লেখা তার হিসাব লেখার অক্ষরের সঙ্গে মেলে না। সাধারণত জাহাজের স্টুয়ার্ডদের আচার ব্যবহার যেমন হয়ে থাকে তাদের সঙ্গে এর আচার ব্যবহারের কোনো মিল নেই, তাতে মনে হয়, যে শ্রেণী থেকে তাদের রিক্রুট করা হয়, এর শ্রেণী তা থেকে আলাদা। অতএব মিস্টার রীড, আমি এ বিষয়ে কোনো কিছু উপায় চিন্তা করার আগে আপনাকে অনুরোধ জানাই, আপনি নিজে এসে একবার দেখুন ব্যাপার কি। কাল আপনি জাহাজে আসুন এবং আমার সঙ্গে ডিনার খান। তখন আপনি তাকে দেখার ভাল সুযোগ পাবেন।'

ক্যাপটেন উইলসনের কথা শেষ হলে আমি বললাম, 'এর চেয়ে লোভনীয় নিমন্ত্রণ আর আমি পাই নি কখনো।'

তারপর বললাম, 'স্যাণ্ডস্ সম্পর্কে আপনি যেটুকু আমাকে বললেন, তাতে আমি তার সম্পর্কে বিষম কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। কাল ঠিক সন্ধ্যা ৬টায় আপনার কাছে যাচ্ছি।'

'বন্দরে থাকলে আমি ঐ সময়ের কিছু পরে ডিনার খাই, যদিও অফিসারগণ একটার সময় খায়!'—এই কথা বলে ক্যাপটেন উইলসন বিদায় গ্রহণ করলেন। পরবর্তী সমস্তটা দিন স্যাণ্ডসের রহস্যের প্রতি একটা অদ্ভুত কৌতূহল অনুভব

করলাম। তারপর যথাসময়ে জাহাজে গিয়ে পৌঁছলাম: আমি যাবার কয়েক মিনিট পরেই খাবার টেবিলে ডাক পড়ল, তাই স্যাণ্ডস্ সম্পর্কে তার আগে আর কোনো আলোচনার বিশেষ সুযোগ ঘটল না। আমরা দুজনে খেতে বসেছি—স্যাণ্ডস্ পরিবেশন করছে। কাজেই তাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেলাম। তারপর যথাসময়ে টেবিল সাফ করা হল, এবং সেখানে আবার আমরা মাত্র দুজন রইলাম। ক্যাপটেন উইলসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার রীড, কি দেখলেন? কি বুঝলেন?'

'বুঝলাম যে স্যাণ্ডস পুরুষ নয়, নারী—বালিকাই বলা চলে, বয়স আঠারো কিংবা উনিশ, এবং এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই। আপনি আমি এখানে এই মুহূর্তে জাহাজে বসে আছি তা যেমন সত্য, স্যাণ্ডস্ যে একটি মেয়ে তাও তেমনি সত্য।'

একটুখানি নীরবতার পরে ক্যাপটেন উইলসন বললেন, 'এখন কর্তব্য কি?' আমি সঙ্কোচহীন ভাষায় বললাম, 'সোজা স্যাণ্ডস্‌কে বলুন, সে যে ছদ্মবেশে আছে তা আপনি জানেন, এবং সে কেন এভাবে জাহাজে চাকরি নিয়েছে তা যদি বলে তা হলে তার সব কথা গোপন রাখা হবে। সে সব প্রকাশ করে বললে তখন কি কর্তব্য, ভাবা যাবে।' এ প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য বোধ হওয়াতে স্যাণ্ডস্‌কে ক্যাবিনের মধ্যে ডেকে আনা হল।

ক্যাপটেন উইলসন অতঃপর তাকে এইভাবে বলতে লাগলেন,—'স্টুয়ার্ড, আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছ, তিনি এই কলকাতা শহরের ডিটেকটিভ। ডিনারের সময় তিনি তোমাকে লক্ষ করে দেখেছেন, এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তুমি তোমার যে পরিচয় দিয়েছ তা সত্য নয়।'

স্যাণ্ডস্ এ কথায় লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, এবং কথা শেষ হলে দেখলাম সে একেবারে শাদা হয়ে গেছে। কি ঘটতে যাচ্ছে আগেই অনুমান করে লাফিয়ে উঠে মেয়েটাকে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলাম। আমি তাকে বহন করে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম, ক্যাপটেন উইলসন ছুটলেন ওষুধঘরে মূর্ছাভাঙার ওষুধের জন্য। চেতনা ফিরে পাবার পর মেয়েটি যে দীর্ঘ বিবৃতিটি দিল তা এই—

'আমার আসল নাম অ্যালিস উইনফিল্ড। আমি স্বর্গগত রেকটর '—' এর কন্যা। আমি যখন শিশু, সেই সময় আমি আমার বাবা ও মা দুজনকেই হারাই। আমার পিতৃব্য আমার লালন ও শিক্ষার ভার নেন। আমি জর্জ

ওয়েস্ট নামক এক যুবককে বিয়ে করব স্থির হয়। জর্জ প্রায় এক বছর হল ভারতবর্ষে রওনা হয়ে গেছে। কয়েক বছর ধরে আমরা পরস্পর পরিচিত হয়েছি। আসলে সে আমাকে আমার শৈশব থেকেই জানে। জর্জ লণ্ডনের এক বণিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত। এই সময়ে আমাদের এনগেজমেণ্ট হয়। আমি এ সময় আমার পিতৃব্যের সঙ্গে পল্লীতে বাস করতাম। জর্জ প্রতি শনিবারে আসত এবং আমাদের সঙ্গে থেকে সোমবার সকালে চলে যেত। এই সময়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতাম। কবে আমাদের বিয়ে হবে, এবং আমরা অল্প আয়ে কিভাবে সংসার চালাব সে সব বিষয় আলোচনা করতাম। আমরা তখন শহর থেকে ছয় সাত মাইল দূরে ছোট্ট বাড়ি নিয়ে থাকব, এবং যতদূর সম্ভব কম খরচে সংসার চালাব। কারণ জর্জের আয় ছিল সামান্য। কিন্তু সব পরিকল্পনাই বৃথা হয়ে গেল। একদিন জর্জ খুব ব্যস্ত-সমস্তভাবে এসে হাজির, মনে হয় গুরুতর কিছু বলতে চায়। বললও তাই। তার মনিব তাকে অন্য একটা চাকরি নিতে বলছেন।

আমি বললাম, 'জর্জ, নিশ্চয় সেটা আরও সুবিধাজনক হবে?'

'তা হবে, বছরে ছয় শত পাউণ্ড পাব।'

'বল কি জর্জ! আমরা তো তা হলে রীতিমতো ধনী হব!'

জর্জ বলল, 'হাঁ, সে কথা ঠিক, কিন্তু'—এইখানে একটুখানি থেমে বলল, 'কিন্তু কিছু গণ্ডগোল আছে।'

'জর্জ! সে কিসের গণ্ডগোল?'

'দলিলে সই করতে হবে তাঁদের অধীন ছ' বছর চাকরি করতে হবে। এই হল সে চাকরির শর্ত।'

আমি বললাম, 'ভালই তো, এতে ভাববার কি আছে?'

'কিন্তু আমি তোমাকে বলি নি কোথায় আমাকে যেতে হবে।'

এ কথায় কেন যেন শিউরে উঠে বললাম, 'দেশের বাইরে নয় নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, অ্যালিস, দেশের বাইরে—ভারতবর্ষে।'

'কিন্তু জর্জ, এ চাকরি তুমি নিও না। ছয় বছর! উঃ ছয় বছর! তুমি যেয়ো না, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পাবে না'—এ কথা বলেই আমি নিজেকে সংযত করলাম। আমি স্বার্থপরের মতো এ কি বলছি? আমি জর্জের উন্নতির পথে বাধা হব?'

'অ্যালিস, তুমি কি আমাকে এ চাকরি না নিতে বল?'

'হ্যাঁ।—না না, জর্জ, প্রিয়তম, আমি স্বার্থপরের মতো কথা বলছি। তুমি এ চাকরি ছেড়ো না, তা হলে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। এতদিনের বিচ্ছেদ সহ্য করা কঠিন, কিন্তু আমাদের ধৈর্যশীল হওয়া দরকার।'—এরপর আর আমি কথা বলতে পারি নি, যে অশ্রু এতক্ষণ ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, তা আর কোনো বাধা মানল না। সে আমাকে বাহুবন্ধনে বেষ্টন করে ধরল, আমার হৃদয় তখন ঘন-স্পন্দনে আমাকে কাঁপিয়ে তুলছে। সে আমার কানে কানে বলল, 'অ্যালিস, আমরা ছয় বছর অপেক্ষা করব না।'

'আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, তার কথার অর্থ আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকল। সে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কথা দাও, আগামী বছর এই সময়ে তুমি আমার স্ত্রী হবে?' তার সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে আর তা দেখতে পেলাম না, আমার চোখে আনন্দের ধারা বয়ে চলেছে তখন। সংক্ষেপে বললাম, 'আমি কথা দিচ্ছি, জর্জ।' তারপর সে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আমাকে আদরের সঙ্গে চুম্বন করল। আমার মতো সুখী তখন আর কেউ নেই, আমি তখন এমন উচ্ছ্বসিত যে আমার পিতৃব্য ঘরে প্রবেশ করলে, আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলাম। জর্জ তখন তাঁকে বলল, 'এক বছরের মধ্যেই অ্যালিস আমার স্ত্রী হতে চলেছে।'—তারপর সে তার চাকরির পরিবর্তনের কথা সবই তাঁকে জানাল। পিতৃব্য জর্জের ডানহাতখানা স্নেহের সঙ্গে চেপে ধরলেন, আমার গালে হাত দিয়ে আদর করলেন। জর্জ এর দুদিন পর ভারত অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। আমার পিতৃব্য ও আমি ডকে গিয়ে তাকে বিদায় দিয়ে এলাম। জর্জ সে সময় আমাকে এই ফোটোগ্রাফখানা দিল (বুকের ভিতর থেকে সেখানা বার করে আমাদের সামনে ধরল)—এবং বিদায় চুম্বন দিয়ে জানাল, প্রতি মেলে সে আমাকে চিঠি লিখবে। প্রথম পাঁচ মাস সে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল, তারপর হঠাৎ তার চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে গেল। আমার পিতৃব্য কলকাতাবাসী তাঁর বন্ধুদের কাছে গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন জর্জ মদ খাওয়ায় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে এবং আনুষঙ্গিক অনেক কিছু অন্যায় কাজ করতে আরম্ভ করেছে, আর তার ফলে দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ খবর শুনে আমি যে কি পরিমাণ দুঃখ পেয়েছি তা বলা বাহুল্য মাত্র। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, হায়, একবার যদি তার দেখা পেতে পারতাম, তা হলে তাকে নিশ্চয় আমি তার কুপথ থেকে ফিরিয়ে

আনতে সক্ষম হতাম। পিতৃব্যকে অনুরোধ করলাম, দয়া করে আমাকে কলকাতায় আমার বাবার যে বন্ধুরা আছেন সেখানে পাঠিয়ে দাও। সেখানে গেলে তাঁরা অবশ্যই আমাকে স্থান দেবেন, কিন্তু তিনি আমার কথায় কান দিলেন না। তিনি বললেন, জর্জ জুয়া খেলতে আরম্ভ করেছে, ওকে আর ফেরানো কারো সাধ্য নয়।

'আমি কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু মনের কথা প্রকাশও করলাম না কিছু।

'আমার পিতৃব্যের সঙ্গে আমার ডিনারের সময় এ সব কথা হয়, এবং সেই রাত্রে যখন আমি আমার ঘরে শুতে যাই, তখন জর্জের কথা ভাবতে গিয়ে আমি যে কতক্ষণ কেঁদেছিলাম তা বলতে পারব না। কয়েক ঘণ্টা অবশ্যই। এই সময়েই আমি কাউকে না জানিয়ে কলকাতা যেতে মনস্থ করি, এবং যেতে হলে পুরুষের বেশে সহকারী স্টুয়ার্ড-রূপে যেতে হবে এ বিষয়েও একটি প্ল্যান করে ফেলি। আমার পিতৃব্যপুত্রের পোষাক আমার গায়ে ফিট করে। সে এখনও কলেজ ছাড়ে নি। তার পোষাকে আমি এর আগে ঘরোয়া থিয়েটারে অভিনয় করেছি। কিন্তু আমার মাথার চুলের দশা কি হবে সে হল এক দুশ্চিন্তা। আমার ব্রাউন রঙের রেশমী চুল জর্জের বড়ই প্রিয় ছিল, সেই চুল কাটতে হবে ভেবে আমার কান্না পেল।

'সন্ধ্যার পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেল স্টেশনের দিকে হাটতে লাগলাম। দূরত্ব সিকি মাইলের বেশি নয়। সেখানে গিয়ে লণ্ডনের টিকিট কিনলাম একখানা। পুরুষের পোষাক দিয়ে আমি একটি পুঁটলি বেঁধে নিয়েছিলাম। সেটা আমার হাতে ছিল। লণ্ডন পর্যন্ত পথে আমার কামরায় সৌভাগ্যবশত আর কোনো যাত্রী ছিল না। মনে ভাবলাম এই আমার ছদ্মবেশ ধারণের সুযোগ। তাড়াতাড়ি আমার ব্যাগ থেকে কাঁচি বার করে লম্বা চুল কেটে খাটো করে নিলাম, এবং কাটা চুল সযত্নে ভাঁজ করে ব্যাগে পুরলাম। এর পর আমি আমার পোষাক খুলে ফেলে ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজের সেই পোষাক ও অন্তর্বাস একখানা রুমালে বেঁধে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম।

'তারপর গাড়ি এসে লণ্ডনে পৌছলে গার্ড এসে আমার দরজা খুলে দিলেন। তাঁকে টিকিট দেবার সময় মনে হল তিনি যেন আমার দিকে কটমট করে চাইছেন। তখন আমার মনে পড়ল তিনি আমাকে '—' স্টেশনে

গাড়িতে উঠতে দেখেছেন তো! তখন আমি ছিলাম মেয়ে, আর এখন পুরুষ, এটি গার্ড নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। এ কথা মনে হওয়া মাত্র সমস্ত রক্ত আমার মুখে এসে জমল, মনে হল যেন আমার গাল দুটি আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম, ভয় হল প্ল্যাটফর্মে প্রহরা-রত কনস্টেবলকে গার্ড সব বলে না দেন। সৌভাগ্যবশত. সেখানে আলো খুবই কম ছিল এবং আমার অস্বস্তি কারো নজরে আসে নি। সে রাত্রে আমি ইসলিংটনের এক ভদ্র বাসস্থানে ঘুমিয়ে কাটালাম, এবং পরদিন জাহাজি অফিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। সেখানে সৌভাগ্য-বশত ক্যাপটেন উইলসন, আপনার সঙ্গে—'

মিস্ উইনফিল্ড এ পর্যন্ত বলে কাঁপতে কাঁপতে অস্থিরভাবে কেঁদে উঠল। ক্যাপটেন উইলসন তাকে তার নিজের ক্যাবিনে নিয়ে পৌছে দিলেন, এবং তার স্নায়ুকে ঠাণ্ডা করতে কিছু পানীয় তৈরি করে দিলেন। তিনি স্যালুনে ফিরে এলে, এখন কি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে লাগলাম। কিছু আলোচনার পর স্থির হল, অ্যালিসকে এর পর আর জাহাজে রাখা ঠিক হবে না, এবং সেই অনুসারে তাকে শহরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল।

আমি ক্যাপটেন উইলসনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কলকাতায় কি ওর কোনো বন্ধু বা আত্মীয় নেই? অ্যালিসকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, সে তার কোনো পরিচিতের বাড়িতে যেতে রাজি আছে কি না।' ক্যাপটেন উইলসন বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব, আমি ওর কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি।' তিনি পুনরায় অ্যালিসের কাছে উঠে গেলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে আমাকে জানালেন, 'মিসেস ও মিস্টার হেন্ডারসন অ্যালিসের পরিচিত। মিস্টার হেন্ডারসন '—' প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার। তাঁরা বাস করেন পার্ক স্ট্রীটে। সে সেখানেই যেতে চায়, কিন্তু তার বর্তমান ছদ্মবেশে নয়।' আমি বললাম, 'ভাল কথা, আমরা ওকে আমার বাসায় নিয়ে যাই, সেখানে আমার স্ত্রী ওকে এখনকার মতো সাজপোষাকে একরকম সাজিয়ে দেবেন।' আমরা তিনজনেই এ প্রস্তাবে রাজি হলাম এবং এর পনেরো মিনিট পরেই গাড়িতে লালবাজারের দিকে যাত্রা করলাম।

সেখানে পৌছে অ্যালিসকে আমার স্ত্রীর হাতে সঁপে দিলাম, এবং তাঁকে তখনই সব খুলে বললাম। তারপর দুজন নারী পোষাকঘরে প্রবেশ করলেন, আমরা দুজন বসবার ঘরে অপেক্ষা করে রইলাম। আমাদের আলোচনা

হচ্ছিল এ নাটকে আমাদের ভূমিকা বিষয়ে। কি আশ্চর্য সব যোগাযোগ! মেয়েটি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ সব করেছে, এতখানি ঝুঁকি সহ্য করেছে, তার জন্য তার সম্বন্ধে আমাদের সম্ভ্রম জাগল কম নয়। এবং তা আরও এ জন্য যে মেয়েটি শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং তরুণী। তার পক্ষে এতখানি দুঃখ সহ্য করেও তার ভালবাসার পাত্রকে ফিরিয়ে নেবার আশা করা স্বার্থত্যাগেরও একটি বড় দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া যেখানে তার অভিযান সফল হবার আশা খুবই কম, সেখানে এত বড় ঝুঁকি নেওয়া কম আত্মবিশ্বাসের পরিচয় নয়।

এই সব আলোচনা করছি এমন সময় আমাদের ড্রয়িং-রুমের দরজা খুলে গেল, ভিতরে প্রবেশ করলেন আমার স্ত্রী, আর সঙ্গে স্ববেশে মিস উইনফিল্ড। এ কি আশ্চর্য রূপান্তর!

ছদ্মবেশ না থাকায় অ্যালিসকে কেমন দেখতে হল, তার কিছু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব। আঠারো-উনিশ বছরের তরুণী, দীর্ঘাঙ্গিনী, সুন্দরী, দেহগঠন মনোরম, কালো বড় দুটো চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত ঘন কালো নেত্র-পক্ষ্মের নিচে তার মনের ভাব আশ্চর্য রকমে ফুটিয়ে তুলছে। ওষ্ঠাধর যেন ছাঁচে ঢালা, কথা বলবার সময় একটু একটু কাঁপছিল। তার খাটো চুলেও তাকে কি সুন্দর মানিয়েছে। তা তার বুদ্ধি-উজ্জ্বল প্রশস্ত ললাটের উপর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সুন্দর ভ্রূযুগল তাতে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

মিস্ উইনফিল্ডকে তার এই আশ্চর্য রূপান্তরের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে ক্যাপটেন উইলসনকে চুপেচুপে বললাম, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত মেয়েটি যেন বাইরে না যায়।

আমি পথে বেরিয়ে এসে একটা ঠিকে গাড়িতে লাফিয়ে উঠেই বললাম, 'ওয়াটারলু স্ট্রীট—তাড়াতাড়ি।' আমি সেখানে চলেছি জর্জ ওয়েস্টের খোঁজে। যেমন আশা করেছিলাম, ঠিক তাকে পাওয়া গেল একটা হোটেলের বিলিয়ার্ড টেবিলে। তখনও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় নি, কাজেই তাকে সুস্থ অবস্থাতেই পাওয়া গেল। এবং তাকে আমার সঙ্গে আসতে রাজি করাতেও আমায় কোনো বেগ পেতে হল না। আমরা দুজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। জর্জ সামান্য একটু অস্বস্তিকর সুরে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় চলেছি?' 'তোমাকে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তোমাকে ডেকে এনেছি। তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এর মধ্যে গণ্ডগোল

নেই কিছু।'—জর্জ গাড়িতে চুপচাপ হেলান দিয়ে বসে রইল, তার মুখে অবিশ্বাসের ছায়া।

বন্ধুটির পরিচয় দিলাম না, দেবার সময়ও ছিল না—পাঁচ মিনিটের তো পথ। আমরা থানা প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছলাম। এবং কাউকে কিছু আগে না জানিয়ে সোজা ড্রয়িং-রুমের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। তারপর যে কাণ্ড ঘটল তার যথাযথ বর্ণনা দেবার বৃথা চেষ্টা আমি করব না। জর্জকে দেখামাত্র অ্যালিস আসন থেকে তড়িৎ গতিতে উঠে পড়ে 'জর্জ!' বলে উচ্ছ্বসিতভাবে চিৎকার করে উঠল, আর জর্জ বিভ্রান্ত বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, 'অ্যালিস!'—এবং পরমুহূর্তে দুজন দুজনের আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। ঘর নিস্তব্ধ। একটি পিন পড়লে তার শব্দ শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধ। শুধু ওদের দুজনের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠার চাপা শব্দ। দৃশ্যটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক, আমার স্ত্রী তা সহ্য করতে না পেরে এ ঘর থেকে নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন। তাঁর চোখে জল ঝরছিল। ক্যাপটেন উইলসন এবং আমার অবস্থাও তথৈবচ। আমরাও সেখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। এক ঘণ্টা পরে জর্জ ড্রইং-রুম থেকে বেরিয়ে এসে চলে যেতে উদ্যত হল। এই এক ঘণ্টায় তারও রূপান্তর ঘটেছে। সে যখন চলে গেল তখন সে যেন আর এক ব্যক্তি। তার এ ক'মাসের কলঙ্কময় স্মৃতিটি মন থেকে মুছে ফেলতে সে এখন কি মূল্য না দিতে পারে। কিন্তু সে অ্যালিসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আজ থেকে তার নতুন জীবন আরম্ভ হল। অ্যালিস ঠিক সময়ে এসে তাকে ভয়ঙ্কর এক ভবিষ্যতের হাত থেকে উদ্ধার করল। সে অখ্যাতি অসম্মান এবং শোচনীয় এক পরিণামের দিকে ছুটে চলছিল, কিন্তু আজ তার জন্মান্তর ঘটল।

জর্জ চলে যাবার পর ক্যাপটেন উইলসন ও আমি অ্যালিসক সঙ্গে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটে তার পিতার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিলাম। তাঁরা তাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা জানালেন, এবং যখন সব শুনলেন তখন অ্যালিসকে তাঁরা আরও সম্ভ্রমের চোখে দেখলেন।

বলা বাহুল্য আমরা দুজনেও অনেক ধন্যবাদ লাভ করলাম। পরদিন মিস্টার উইনফিল্ডকে তার করে জানানো হল অ্যালিস নিরাপদে এসে পৌঁছেছে।

এর তিনমাস পরে জর্জ ও অ্যালিসের বিয়ে হল, এবং এর পর কয়েক

বছর তারা কলকাতাতেই ছিল। মাত্র ছয় বছর হল তারা কলকাতা ছেড়ে গেছে, সঙ্গে তিনটি শিশু। চীন দেশে অবস্থিত একটি শাখা অফিসের পরিচালনার ভার নিয়ে জর্জ সসন্তান সস্ত্রীক সেখানে চলে গেল।

পাঠকদের মধ্যে অনেকেরই হয় তো মনে আছে, বছর দশেক আগে লণ্ডনের 'টাইমস' কাগজে, চার্চ অভ ইংল্যাণ্ডের এক ক্লার্জিম্যানের এক অসাধারণ সুন্দরী কন্যার রহস্যজনক অন্তর্ধানের কথা ছাপা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল মেয়েটি লণ্ডন থেকে আট মাইল দূরে তার পিতৃব্যের সঙ্গে বাস করত। তারপর ঐ কাগজেই একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল নিরুদ্দিষ্টার কেউ সন্ধান দিতে পারলে তাকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যার কথা বলা হয়েছিল সেই আমাদের এই কাহিনীর নায়িকা—অ্যালিস উইনফিল্ড।

ব্যবসায়ী-চোর বনাম পুলিস

ব্যবসায়ী-চোরদের বিস্ময়কর চৌর্যকৌশল, ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং দুঃসাহস নিয়ে সকল সভ্যদেশের কথাশিল্পীরাই কাহিনী রচনা করেছেন। বিষয়টি ঘৃণ্য কিন্তু যাঁরা উত্তেজনাপূর্ণ গল্প পড়তে ভালবাসেন তাঁদের রুচিকে এসব কাহিনী খুশি করে। এদের বিষয় নিয়ে যাঁরা গল্প লেখেন তাঁরা জঘন্যতম অপরাধ, রোমাঞ্চকর ঘটনা, অবিশ্বাস্য রকমের পলায়ন প্রভৃতিকে পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারেন। কিন্তু আমি তাঁদের রীতি অনুসরণ করে কোনো গল্প রচনা করতে যাচ্ছি না। লেখকেরা তাঁদের নায়কদের আধা দৈবশক্তিসম্পন্ন করে চিত্রিত করেন, এবং বীভৎস সব অপরাধের ছবি উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলেন। আর তাতে মনে হয় যেন সে সব অবৈধ কাজগুলি বীরত্বের কাজ। আমার কাহিনী সে তুলনায় কম উত্তেজক হবে, কিন্তু যে সব ঘটনা বলব, তা সত্য ঘটনা এবং তা প্রতিদিনের জীবনেই ঘটছে, এবং তা সবই আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা।

ভারতবর্ষের ব্যবসায়ী-চোরেরা ইউরোপীয় চোরদের তুলনায় কম দুঃসাহসী এবং কম বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও কর্মোৎসাহ এবং হীন চাতুরিতে তাদের ছাড়িয়ে যাবে। ভারতের উত্তর অঞ্চলে কিন্তু ব্যবসায়ী-চোরদের দুঃসাহস এবং বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার অভ্যাস ইউরোপীয় চোরদের সমান বলা চলে। এবং

তারা শেষোক্তদের মতন দুঃসাহস-প্রিয়তার জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধের জীবনে আকৃষ্ট হয়।

বাংলা দেশে ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র। বাঙালী চোর চুরিকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে নিতান্তই অভাবে পড়ে। দুঃসাহসিক কাজের প্রতি তার টান নেই, এবং এড়াতে পারলে ইচ্ছে করে বিপদের সম্মুখীন হয় না। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাঙালী চোরেরা সবচেয়ে ভীরু এবং কুসংস্কার মেনে চলে। অথচ মজা এই যে দুঃসাহসিক চোরেরা যেখানে বিফল হয়, এরা সেখানে অনায়াসে সাফল্য লাভ করে। তার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা. হীন চাতুরি এবং চরম সতর্কতা, তার উদ্দেশ্য ভালভাবে সফল করে তোলে এবং অনেক ব্যাপারে উত্তর পশ্চিম ভারতের অতিদুর্ধর্ষ অপরাধীদের চেয়েও সে বেশি সফল হয়। বাঙালী পুলিসের লোকও প্রায় তাই। তারও দুঃসাহসিকতা কম, এবং তার জন্য শহরে তাদের দিয়ে পাহারা দেওয়ার কাজ ভাল হয় না। আমি একটি মজার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যদিও তাতে আমার মুল বক্তব্য থেকে কিছু সরে যেতে হবে।

কয়েক বছর আগে ১নং থিয়েটার রোডের বাড়িতে চুরি হয়। চোরেরা যখন প্রাচীর টপকে ভিতরে ঢুকে কর্তব্য করছে, তখন তাদের দলের একজন বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। এই লোকটা একটা ছাগলের চামড়া (শিং সমেত) গায়ে সুন্দরভাবে পরে নিয়ে ঠিক ছাগলের মতন চারপায়ে হাঁটছিল। এবং তার এই অভিনয় যে সুন্দর হয়েছিল, পরবর্তী ঘটনায় তা জানা যাবে। চোরেরা যে সময় চুরি করছিল, বীটের কনস্টেবল সে সময় ময়দানে একটা গাছের নিচে বসে ঘুমচ্ছিল। চোরেরা কার্যাদি সমাপনান্তে যখন পালাবে, তখন বাইরের ছাগলবেশী প্রহরী-চোর খুব সাবধানে কনস্টেবলের কাছে এগিয়ে এলো দেখতে যে সে সত্যিই ঘুমোচ্ছে, না ঘুমনোর ভান করছে। কারণ তাই বুঝে উপযুক্ত সঙ্কেতধ্বনি পাঠাবে। ছাগল যখন বুঝল কনস্টেবল ঘুমোচ্ছে, তখন সে তিনবার 'ম্যে-হেঁ-হেঁ-হেঁ', 'ম্যে-হেঁ-হেঁ-হেঁ', 'ম্যে-হেঁ-হেঁ-হেঁ' ডেকে উঠল। এর অর্থ—পথ পরিষ্কার, তুমি নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পার। (একবার ডাকলে বিপদ, দুবার ডাকলে সাবধান। তিনবার ডাকলে কোনো ভয় নেই, বেরিয়ে আসতে পার, এই ছিল পুর্বনির্দিষ্ট সঙ্কেতধ্বনি।) জীবন ও সম্পত্তির রক্ষক কনস্টেবল ছাগলের ডাকে ভয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠল, এবং অন্ধকারে সামনে এক কালো জানোয়ার দেখে ভাবল এ আবার কি রে

বাবা! মনে খুব সাহস সঞ্চয় করে সে তখন এক পা এক পা করে এগিয়ে এসেই বলে উঠল, ও রে শালা ছাগল, আমার এমন সুখের ঘুম তুই নষ্ট করলি, এর মজাটা আমি টের পাওয়াচ্ছি। বলে কনস্টেবল ছাগলের শিং ধরে টানতেই ছাগল কোনো রকম বাধা না দিয়ে তার সমান তালে এগোতে লাগল। কয়েক পা পরেই চৌরঙ্গী রোডের ময়দানের দিকের ড্রেন। তখন সেটি জলে ভরা ছিল। পার হতে হলে জুতো খুলতে হবে।

ছাগল দেখল, এই তার সুযোগ। কনস্টেবল যখন মাথা নিচু করে জুতো খুলছিল তখন ছাগল তাকে পিছন দিক থেকে শিং দিয়ে এমন এক গুঁতো মারল যে কনস্টেবল জলের ভিতর উল্টে পড়ে গেল। কিন্তু তবু তার কর্তব্যে ত্রুটি নেই, একহাতে তখনও সে ছাগলের শিং ধরে আছে! তারপর কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে দেখে ছাগল উধাও, শুধু তার চামড়াটা ফেলে গেছে! বেচারা কনস্টেবল এবারে ভয়ে রীতিমতো কাঁপতে লাগল। এবং হাত থেকে ছাগলের চামড়া ও লাঠি ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে থানায় ছুটে এলো। কিন্তু কি হয়েছে কিছুই বলতে পারে না! সে এমন ভয় পেয়ে গেছে যে যা দেখেছে তা সত্যি কি না তাও জোর করে বলতে পারছে না। তারপর যখন মুখে কথা ফিরল, তখন সে বলল, 'এক শয়তান হাতীর চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তাকে আমি আক্রমণ করে প্রায় মেরেই ফেলছিলাম, এমন সময় দেখি সে শূন্যে মিলিয়ে গেছে।'

পরদিন ড্রেনের ধারে কনস্টেবলের জুতো ও লাঠি আবিষ্কার হওয়াতে সবই বোঝা গেল। কোন্ শয়তান যে কার ভয়ে পালিয়েছে তার সাক্ষী ঐ জিনিসগুলো। এরপর বেচারা কনস্টেবল কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে সে আর ফেরে নি। অতিরিক্ত ভয় পেয়েই তার এই মারাত্মক জ্বর, তারই ফলে প্রাণটিও গেল।

ব্যবসায়ী-চোরদের কথায় ফিরে যাই। আমি যাদের কথা এখন বলতে যাচ্ছি তারা ছেলেবেলা থেকেই চুরিবিদ্যায় বিশেষ শিক্ষা পেয়েছে এবং চুরি ভিন্ন তাদের অন্য কোনো বৃত্তি নেই। চুরিতে পাকা হয়ে উঠলে নিজের সম্পর্কে তার প্রত্যয় বাড়ে; অনেক সময় দুঃসাহসিক চুরিতেও লিপ্ত হয়। এবং সফলতা লাভ করলে নিজেদের দলের মোড়ল হয়ে ওঠে। এই জাতীয় অপরাধীর সঙ্গে পুলিস সহজে পেরে ওঠে না।

এটা সবারই জানা যে, পুলিস যত কর্মতৎপর এবং পাকা হবে, চোর তত

তৎপর এবং ধূর্ত হবে। একজনের ধূর্তামি আর একজনের বুদ্ধিকে ধারালো করে তোলে। ইংল্যাণ্ডে মফস্বলের কনস্টেবলকে লণ্ডন শহরে আনলে সেখানে তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না ; মফস্বলের পুলিসকে কলকাতা শহরে আনলেও ঠিক তাই হবে।

এবারে আমি ব্যবসায়ী-চোরদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি। বিপদের মুহূর্তে সে কি ভাবে বুদ্ধি খাটায় তাও দেখা যাক।

বড় বড় চুরিতে চোরেরা অকারণ কোনো ঝুঁকি নেয় না। এবং পাকা চোর অনিশ্চিত বস্তুর সন্ধানে কোনো বাড়িতে ঢোকে না। বাড়ির কোথায় কি আছে তা সে ভাল করে জেনে নেয়। কোন্ মূল্যবান জিনিসটি পাওয়া যাবে, এবং ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে সকল খবর সে তন্ন তন্ন করে জেনে নেয়। নানা উপায়ে সে এ সব খবর জানতে পারে। কলকাতার উত্তরাঞ্চলে চোর দিনের বেলা ফেরিওয়ালা রূপে দেখা দেয়। এতে তাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করতে পারে না। যে বাড়িতে সে চুরি করতে চায়, সে বাড়িতে কজন লোক থাকে, কোন ঘরে কে ঘুমোয়, সে-সব সে কৌশলে জেনে নেয়। সে বাড়িতে সে খুব শস্তায় জিনিস বিক্রি করে। সে লক্ষ করে, টাকা কোন্ ঘর থেকে এনে দেওয়া হল, কিংবা কোন্ বাক্স বা আলমারি বা ড্রয়ার থেকে দেওয়া হল। এ সব জানবার পর সুযোগ মতো সে অন্ধকার রাত্রে চুরি করতে আসে। চাঁদের আলোয় সে চুরি করতে বেরোয় না। শহরের ইউরোপীয় পাড়ায় চোর বাড়ির অসাধু চাকরের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে। চোরাই জিনিসের ভাগ সে পায়। ছোটখাটো চুরি ধরা পড়ার ফলে যদি কোনো চাকরকে বরখাস্ত করা হয়ে থাকে, তবে সে মনিবের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঘরের খবর চোরকে জানিয়ে দেয়। যে চুরি সে নিজে করতে সাহস পায় নি, সে চুরি ব্যবসায়ী-চোরকে দিয়ে করায়।

এ সব কাহিনী থেকে সবার সতর্ক হতে শিক্ষা করা উচিত। কখনও কোনো দামী জিনিস বেশি সময় এক জায়গায় রাখবেন না। সোনার ঘড়ি টেবিলে এক রাত্রি থাকতে পারে, কিন্তু পরদিন রাত্রে আর সেখানে রাখবেন না। হয়তো একরাত্রি সেটি বালিশের নিচে রাখলেন। তারপর ড্রয়ারে রাখলেন। এবং একই ড্রয়ারে রাখবেন না। বড় এবং ভারী জিনিস চোরেরা প্রায় নিতে চায় না পথে ধরা পড়ার ভয়ে।

একবার রমজান নামক এক চোরের দেখা পেয়েছিলাম। তার মতো অভিজ্ঞ এবং চতুর চোর আমি আর জীবনে দেখি নি। তার অনেকগুলি ছদ্মনাম ছিল। বর্তমানে সে জেল খাটছে। তার চুরির একমাত্র লক্ষ ছিল ঘরে ঢুকে মেয়েদের গা থেকে গয়না খুলে নেওয়া। তার অগম্য কোনো ঘর ছিল না।

রমজানের পদ্ধতি ছিল এই—তার হাতে একটি সরু মাঝারি আকারের বাঁশের লাঠি থাকত, আর তার ভিতরটা ফাঁপা করে তার মধ্যে সে ভরে রাখত কয়েকটি নিদ্রা আকর্ষণকারী ঔষধের মিশ্রণ। সে যে কি বস্তু তা রহস্য রয়ে গেছে। যাই হোক, এই অস্ত্র হাতে নিয়ে রমজান কোনো ধনী মহিলার ঘরে প্রবেশ করে চুরুটের মতো তার একদিকে মুখ লাগিয়ে অন্যদিকটা তার নাকের কাছে ধরত। আগুন ধরিয়ে দিলে যে ধোঁয়া তা থেকে বেরুত তা নাকে টানলে স্নায়ু ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শ্বাসগ্রহণকারীকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার আর তখন জেগে উঠে কোনোরকম চিৎকার করা বা বাধা দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকে না, সে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যায়। একদিন এক বাড়িতে সে এক মহিলার উপর তার এই বিদ্যা খাটাচ্ছিল, তখন ঘরের অপর নিদ্রিত ব্যক্তি জেগে ওঠাতে তার কিছু অসুবিধা হল। সে কেবলমাত্র অচেতনকরা মহিলার হাতের দামী ব্রেসলেটটি খুলে নিতে পেরেছে, এমন অবস্থায় কর্তব্য অসমাপ্ত রেখে তাকে পালাতে হয়। পরদিন পুলিসে খবর দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—অন্দরের চুরির খবর খুব কমই পুলিসকে জানানো হয়। স্ত্রীর গয়না চুরি হলে তাকে আদালতে হাজির হতে হবে, সেই ভয়ে স্বামী চুরির ক্ষতি নীরবে হজম করে।

যাই হোক, উপরের ঐ চুরির খবর থানায় এলে ইন্সপেক্টর কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পাড়ার বহু লোক এসে ভিড় করল সেখানে। সেই কৌতূহলী জনতার মধ্যে স্বয়ং রমজানও এসে দেখছিল পুলিস কি করে চোর ধরে এবং চোরাই সম্পত্তি উদ্ধার করে। সে দেখল পুলিস চুরির কোনো সূত্রই খুঁজে পেল না। কিন্তু রমজান এই উপলক্ষে জানতে পারল, যে ব্রেসলেটটি সে চুরি করেছে ঠিক তেমনি আর একটি ঐ মহিলার অন্য হাতে ছিল। এই অতিরিক্ত জ্ঞানটি তার লাভ হল, অতএব ওটা কি করে হাত করা যায় ভাবতে লাগল। ভেবে একটা ভাল উপায়ই সে বার করল। সে এবার স্বয়ং পুলিস জমাদার সেজে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির

হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বাড়ির কর্তাকে বলল, 'বাবু, আমি থানা থেকে আসছি। ইন্সপেক্টর সাহেব আমাকে পাঠালেন আপনাদের কাছে, চুরি-যাওয়া ব্রেসলেটের যে জুড়ি আর একটা আছে সেইটে তাঁর দরকার। চোর তো ব্রেসলেট বিক্রি করতে যাবেই, সেজন্য পোদ্দারদের যদি আগে দেখিয়ে রাখা রাখা যায় এই চেহারার ব্রেসলেট চুরি গেছে, তাহলে চোরাই মাল দেখলেই তারা চিনতে পারবে, এবং চোরকেও ধরে ফেলতে পারবে।'

ছদ্মবেশী রমজানের কথায় বাবু বিশ্বাস করে বাকি ব্রেসলেটটি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে চেয়ে এনে চোরের হাতেই তুলে দিলেন। এর কয়েকদিন পরে ঐ বাবুর সঙ্গে পুলিস ইন্সপেক্টরের দেখা। বাবু তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্রেসলেটের কাজ হয়ে গেছে কি? এখন সেটা ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে কি? ইন্সপেক্টর তো স্তম্ভিত। তারপর সব শুনে বললেন, তিনি কখনও কোনো জমাদারকে ব্রেসলেট আনতে পাঠান নি। এবং সে কথা প্রমাণের জন্য তিনি থানার সমস্ত জমাদারকে ডাকিয়ে এনে একত্র দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, সনাক্ত করুন। কিন্তু বাবু কাউকে সনাক্ত করতে পারলেন না। তিনি এখন বুঝতে পারলেন তিনি চোরের হাতে দ্বিতীয়বার ঠকেছেন।

বুদ্ধিমান পাঠক উপরের এই কেস্ থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, পুলিস তার তদন্তে কোথায় ভুল করেছে? এবং চোর কেমন করে তার সুযোগ গ্রহণ করেছে? চোর এক্ষেত্রে পুলিসের ত্রুটি যে শুধু নিজের সুবিধার জন্যই কাজে লাগিয়েছে তাই নয়, অন্য ব্রেসলেটটি সরিয়ে চুরি-যাওয়া ব্রেসলেটের বিবরণ অন্যান্য পুলিস অফিসে জানানোর পথও বন্ধ করেছে, এবং নিজের ধরা পড়ার ঝুঁকি কমিয়ে ফেলেছে।

আরও একটা ঘটনার কথা বলি। ব্যবসায়ী-চোরদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির খেলা এতেও খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে। উপস্থিত বুদ্ধির যা পরিচয় এতে আছে তা চমকপ্রদ। গত শীতকালে কলকাতার একটি ক্রিকেট ক্লাব, ময়দানে নিজেদের জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিল। তার মধ্যে ক্রিকেটের যাবতীয় সরঞ্জামই শুধু নয়, শেরি, পোর্ট, শ্যাম্পেন এবং ব্র্যাণ্ডিরও একটি বড় স্টক রাখা হয়েছিল। এই ভাণ্ডারের রক্ষকরূপে একজন দরোয়ান সেখানে রাত্রে শুয়ে থাকত। ভবানীপুরের চতুর একদল চোর এই জায়গায় এসে একদিন রাত্রে হানা দেবে স্থির করল। তারপর একটি সুবিধামতো অন্ধকার রাত দেখে ওরা তাঁবুর দিকে এগিয়ে চলল। আগেই বলেছি, জ্যোৎস্না-রাত্রে

ওরা এসব কাজ করে না। যাই হোক, তারা তাঁবুর দিকে এগিয়ে বুঝতে পারল একজন কনেস্টবল ঐ তাঁবুর চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। যে ক্লাবের তাঁবু ওটা, সেই ক্লাবের পরদিন একটা ম্যাচ খেলা হবে, সেজন্য সেদিন শহর থেকে মদের বড় স্টক ওখানে এনে মজুত করে রাখা হয়েছিল। দরোয়ানের ঘুম একটু গভীর, সেজন্য সে-ই ঐ কনস্টেবলকে এই অঞ্চলটা সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দেবার জন্য বলে রেখেছিল।

চোরেরা এই নতুন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই তো কি করা যায়? তারা একটা গাছের নিচে বসে পরামর্শ করতে লাগল কি করা যায়। এমন একটা কৌশল করতে হবে যাতে কনস্টেবলকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা যায়। কিছুক্ষণ পরামর্শের পর তারা যা স্থির করল তা পরবর্তী ঘটনায় প্রকাশ।

ওদের একজন ওখান থেকে উঠে পথের মাঝখানে শুয়ে পড়ে মাতালের অভিনয় করতে লাগল, এবং অন্য একজন ছুটে গিয়ে কনস্টেবলকে জানাল একটি লোক পথের মাঝখানে মরে পড়ে আছে, কিংবা এখনই হয় তো মরে যাবে। এখন যদি ও-পথে কোনো গাড়ি যায় তাহলে ঘোড়ার পায়ের নিচে, না হয় গাড়ির চাকার নিচে, পড়ে যাবে। কনস্টেবল তা শুনে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটে গেল এবং লোকটাকে তোলবার নানা চেষ্টা করল, দু একটা গুঁতোও মারল তার পাঁজরে, কিন্তু কোনো ফল হল না। বুঝতে পারল লোকটা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। তখন দ্বিতীয় চোর তাকে বলল, 'ভাই, তুমি যদি থানায় ছুটে গিয়ে একখানা স্ট্রেচার নিয়ে আসতে পার, তাহলে লোকটাকে রাত্রের জন্য হাজতে পুরে রাখা যেতে পারে, আমি এর কাছে বসছি ততক্ষণ।'

কনস্টেবল থানায় ছুটে গিয়ে চারজন লোক সহ স্ট্রেচার নিয়ে এসে দেখে সেখানে মাতালটাও নেই, এবং পরোপকারী সে বন্ধুটিও নেই। কেউ নেই দেখে স্ট্রেচার বাহকেরা তো কনস্টেবলের উপর রেগে আগুন। বলল, 'মিথ্যা বলে তুমি আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে রাত্রের বিশ্রামটা নষ্ট করলে।'

পুলিসদের এই গোলমালে তাঁবুর ভিতরের দরোয়ানের ঘুম ভেঙে গেল, এবং সে উঠে আবিষ্কার করল ভাণ্ডার লুট হয়ে গেছে। হায় হায় করতে করতে সে ছুটে এলো সেই কোলাহল লক্ষ করে। সে এসে প্রহরারত কনস্টেবলকে চুরির কথা জানাতেই কোলাহল থেমে গেল, স্ট্রেচার বাহকেরা

বুঝতে পারল চোরেরা কনস্টেবলকে ঠকাবার জন্যই এ ষড়যন্ত্র করেছে। তখন তারা শান্ত হল।

কিন্তু চোরদের অ্যাডভেনচার এইখানেই শেষ নয়। তাদের পালাবার পথে আর এক বাধা। পথটি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের চৌরঙ্গী-মুখী- গেটের বিপরীত দিকে অবস্থিত গুমটির পাশ দিয়ে। সেখানে দেখে আর এক প্রহরী। সর্বনাশ! একেও কোনো কৌশলে সরাতে হবে এখন।

গোপন পরামর্শের পর একটা উপায় পাওয়া গেল। চোরেরা সংখ্যায় ছিল মোট পাঁচজন। তাবু থেকে প্রত্যেকে একটা করে কেস্ সরিয়েছিল এবং পরে ময়দানের একটা গাছের নিচে বসে ওরা পরীক্ষা করে দেখেছিল—দুটো কেস্ শ্যাম্পেনের, একটা কেস্ ব্র্যাণ্ডির, একটা কেস্ শেরীর, এবং পঞ্চম কেসটি সোডাওয়াটারের। এই কেসটি কষ্ট করে বয়ে নেওয়ার কোনো মানে হয় না, তাই ওটাকে তারা গাছের নিচেই ফেলে এসেছিল। এখন ঐ কেস্টাই তাদের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন হল।

যে চোরটার ঘাড়ে কোনো মোট ছিল না, তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কনস্টেবলের কাছে। সে গিয়ে বলল, ঐ গাছের নিচে কিসের যেন একটা বাক্স পড়ে আছে। পথে আসতে দেখলাম। যদি দরকার মনে কর তাহলে জমাদার সাহেব ওটি দেখে আসতে পার। আমি আমার কর্তব্য করলাম।

কনস্টেবল ভেবে দেখল, এটি ওখান থেকে তুলে এনে থানায় জমা দেওয়া তার কর্তব্য। মনে মনে ভাবল এতে তার কৃতিত্বও প্রকাশ পাবে। খবরটা যে উদ্দেশ্যমূলক তা সে কি করে ভাববে? সে ওটাকে আনার উদ্দেশ্যে গুমটি থেকে বেরিয়ে গেল, সেই মুহূর্তে সবাই মিলে তার গুমটির মধ্যে ঢুকে তার খাটিয়াখানা বার করে আনল এবং তার উপর চারটি কেস্ রেখে একখানা শাদা চাদর দিয়ে সবটা ঢেকে দিল, এবং খাটিয়া ঘাড়ে করে তারা ভবানীপুরের পথে পা চালিয়ে দিল। পথে মাঝে মাঝে ধ্বনি দিতে লাগল—বল হরি, হরি বোল।

আর ওদের ভয় নেই, মৃতদেহ সৎকার করতে যাচ্ছে, কেউ আর পথে ওদের বিরক্ত করবে না।

কিন্তু ওদের ভাগ্য সেদিন নিতান্তই খারাপ ছিল। ওরা যখন খাটিয়া ঘাড়ে নিয়ে বিরজিতলা থানার বিপরীত দিকে এসেছে ঠিক সেই সময় খাটিয়ার একটা পাশ ভেঙে বোতলসমেত কেস্গুলো মাটিতে পড়ে এমন সশব্দে ভেঙে

গেল যে, সে শব্দ শুনে থানার সমস্ত লোক একসঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এলো। চোরেরা ছুটে পালাল, কিন্তু পুলিসের লোকেরা তাদের পিছু ধাওয়া করে তিনজনকে ধরে ফেলল।

পাঠক বলবেন, এ ক্ষেত্রে ওরা ধরা পড়ল নিতান্তই দৈবাৎ, পুলিসের সতর্কতায় নয়।

• এই লেখকেরও তাই মত।

নকল রানী

কয়েক বছর আগে কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ জুয়েলার এক আশ্চর্য রকমের সাহসী এবং চতুর প্রতারকের হাতে কি ভাবে ঠকেছিল এবারে সেই চমকপ্রদ উপন্যাসসুলভ কাহিনীটি বিবৃত করছি।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে আব্বাস খাঁ ও নয়ামুদ্দীন জমাদার নামক দুজন লোক কলকাতা এসে নিজেদের এক রানীর ব্যক্তিগত ভৃত্য পরিচয়ে নিজেদের এক মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যাত্রা করল। তারা তাদের রাজ্যের রানীর জন্য একখানা উপযুক্ত বাড়ি খুঁজতে এসেছে, কারণ রানী স্বয়ং এ শহরে এসে শহরকে ধন্য করতে চান।

মনের মতন একখানা বাড়ি পাওয়া গেল কটন স্ট্রীটে। রানীর উপযুক্ত সাজানো বাড়ি। বাড়ির ব্যবস্থা তো হল, এইবারে রানীর শুভাগমনের পালা। ওদের একজন রওনা হয়ে গেল রানীকে আনতে।

তিনচার দিন পরে আব্বাস খাঁ ফিরল, আর তার সঙ্গে দেখা গেল সোনার-কাজকরা-পরদায়-ঢাকা একখানা পাল্কী। এই পাল্কী বহন করে আনছে চারজন লাল কোট পরা বাহক। তাদের কোটগুলিও সোনার লেস্ লাগানো। সঙ্গে প্রকাণ্ড এক রূপার আসাশোঁটা জাতীয় দণ্ড-বাহক। তারও পোষাক জমকালো।

পাল্কীর ভিতর আছেন রানীসাহেবা। পাল্কী মহা আড়ম্বরের সঙ্গে নতুন বাড়ির অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করল। সেখান থেকে রানী তাঁর প্রাইভেট রুমে গিয়ে উঠলেন। পরদানশীন রানী, বাইরের কাউকে সহজে দেখা দেন না। পাল্কীর ভিতর থেকে ঘরে প্রবেশ করার সময় বাহকদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এবারে দ্বিতীয় পর্যায়। এটি হল প্রচার বিভাগের ব্যাপার। পাড়ায় গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হল রানী বড়ই দয়ালু, গরিবদুঃখীর সেবা করতে ভালবাসেন। পরদিন দেখা গেল প্রায় পাঁচ শত ভিখারী তাঁর দরজায় এসে হাজির হয়েছে। পয়সা আর চাল বিলি করা হল তাদের মধ্যে, তারা রানীমায়ের দয়ার কথা বলতে বলতে গেল সবাইকে। পরদিন প্রচার করা হল রানী দুপুরে নিকটস্থ কোনো জুয়েলারের দোকানকে ধন্য করতে বেরুবেন। কিন্তু পথে ভীষণ ভিড় জমে যাবে, অতএব কৌতূহলী দর্শকদের হাত থেকে রানীকে বাঁচানোর জন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাই ওরা নিকটস্থ থানা থেকে দুজন পুলিস কনস্টেবলকে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত করল। ব্যবস্থা শেষ করে তারা এসে পৌঁছল রানীর কাছে। বেলা ঠিক বারোটায় দুজন কনস্টেবলও এসে পৌঁছল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই রানী পাল্কীতে চড়ে আগের মতনই রাজদণ্ড-বাহককে সঙ্গে নিয়ে জুয়েলারের দোকান অভিমুখে রওনা হলেন। একটু পিছনে চলল আব্বাস ও নয়ামুদ্দীন। পাল্কীর দু পাশে চলল দুজন কনস্টেবল। তারা ভিড় ঠেকাতে ঠেকাতে চলল। পাল্কী এগিয়ে চলল রাজকীয় ভঙ্গিতে।

বলা বাহুল্য জুয়েলারের প্রতিষ্ঠানকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে রানী আসবেন, অতএব তাঁরা যেন সবচেয়ে দামী অলঙ্কারসমূহ হাতের কাছে রাখেন যাতে তাঁর বাছাই করার সুবিধা হয়। দোকানের কাছে এসে পৌঁছনোর পর এই নাটকের পূর্বোক্ত দুজন পরিচালকের নির্দেশে পাল্কী দোকানের বারান্দায় এনে রাখা হল। এ বারান্দা বড় রাস্তার উপরে। কনস্টেবল দুজন এবং পাল্কীবাহকেরা ও রাজদণ্ড-বাহক ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল, এবং তারা দোকানের সামনে এমন একটি লাইন গঠন করল যাতে বাইরের লোকের কাছে তা একটি দর্শনীয় ব্যাপার হয়। এই রকম পোষাকপরা পাল্কীবাহক, এমন সাজানো পাল্কী এমনভাবে পুলিসের প্রহরাতে দেখলে কে না মুগ্ধ হবে? কারোর মনেই এতে কোনো সন্দেহ জাগবার কথা নয়।

আগেই তো বলা আছে রানী পরদানশীন, পাল্কী থেকে সবার সামনে বেরুবেন না। কাজেই অলঙ্কারপত্র সবই রানীর কাছে পাল্কীর ভিতরে এনে তাঁর পছন্দ করানো হবে। জুয়েলার অলঙ্কার আনতে লাগলেন এবং আব্বাস খাঁ পাল্কীর পাশে দাঁড়িয়ে সেই সব অলঙ্কার পরদাঢাকা পাল্কীর ভিতরে চালান করতে লাগল। যে অলঙ্কার রানীর পছন্দ তা রেখে তিনি অপছন্দ অলঙ্কার

ফেরৎ দিতে লাগলেন। এইভাবে ৮০,০০০ (আশী হাজার) টাকার অলঙ্কার রানী পছন্দ করলেন। তখন আব্বাস খাঁ জুয়েলারকে জানাল, রানীর নিজের কিছু পুরনো ফ্যাশনের গয়না আছে, সেগুলো তিনি বেচে দিতে চান। এবং তিনি যে নতুন অলঙ্কার কিনলেন, পুরনো গয়নার দামে তারও কিছু দাম শোধ হয়ে যাবে। এতে কি তাঁর আপত্তি আছে ?

জুয়েলার ভাবলেন, এইবার তিনি আর একটা দাঁও মারতে পারবেন। বললেন, বিলক্ষণ! আপত্তি থাকবে কেন ? সেই সেকেলে গয়না আমি নিশ্চয় কিনব। আব্বাস খাঁ পাল্কীর পরদার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে এই আনন্দের খবরটি রানীকে জানিয়ে দিল, এবং সেই পুরনো অলঙ্কার আনতে রওনা হবে এমন সময় রানীর তৃষ্ণা জেগে উঠল, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ঐ সঙ্গে তাঁর রূপোর সরাইতে করে কিছু সরবত যেন নিয়ে আসে আব্বাস। আব্বাস যথাদিষ্ট পাল্কী থেকে সরাই নিয়ে তার সঙ্গী নয়ামুদ্দীনের হাতে দিয়ে তাকে রানীর জন্য এক সরাই ক্লান্তিনিবারক সরবত নিয়ে আসতে বলল। অতএব দুজনেই রওনা হল, একজন পুরনো অলঙ্কার আনতে, অন্যজন ক্লান্তিনিবারক সরবত আনতে। রানীসাহেবার বাসাবাড়ি বেশি দূরে নয়, কাজেই আব্বাসের পুরানো অলঙ্কার নিয়ে ফিরে আসতে দেরি হবে না। বলা বাহুল্য তাদের দুজনের কেউ আর ফিরল না।

জুয়েলার বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন দেখলেন ওদের কেউ ফিরে এলো না, তখন তাঁর মনে নানা সন্দেহের উদয় হতে লাগল। শুধু সান্ত্বনা রাজকীয় ভঙ্গিতে সাজানো পাল্কী, চারজন সোনার লেস্ লাগানো লাল কোটধারী বাহক, একজন রাজদণ্ডধারী ও দুজন পুলিস কনস্টেবল। আর পাল্কীর ভিতরে ? রানী না হলেও নিশ্চয় কোনো ধনী মহিলা। তাঁর মনে কিছু বিশ্বাস ফিরে এলো।

তারপর আরও একঘণ্টা গেল। এখনও তারা ফিরল না। তখন জুয়েলারের লোকেরা পাল্কীবাহকদের কাছে জিজ্ঞাসা করল, তারা কতদিন রানীর অধীন কাজ করছে, এবং রানী কোথাকার রানী, এবং ভারতের কোন্ অংশে তাঁর রাজত্ব ? পাল্কীবাহকেরা বলল তারা মাত্র পূর্বদিন নিযুক্ত হয়েছে, তারা সবাই কলকাতার লোক অতএব তারা রানী সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা এ খবর জুয়েলারকে জানিয়ে দেবামাত্র তিনি পুলিস ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে রানীকে জেরা করতে শুরু করলেন। বুদ্বুদ বিদীর্ণ

হল! একেবারে ফেটে গেল! জুয়েলার হায় হায় করছেন আর জিজ্ঞাসা করছেন আমার এত দামের অলঙ্কারপত্র কোথায় গেল? নকল রানী বলল, আব্বাস খাঁ সেগুলো রূপোর সরাইতে করে নিয়ে গেছে। এ কথা শুনে জুয়েলার মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, তাঁকে ধরাধরি করে ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। নকল রানী ও তার যাবতীয় লোক পাল্কীসমেত থানায় নিয়ে যাওয়া হল।

নকল রানী তার বিবৃতিতে বলল—আমি বৃত্তিতে বেশ্যা। আব্বাস খাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি কলকাতার শহরতলী চিৎপুরে বাস করতাম। প্রায় পনেরো দিন আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলাম সেইখানে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। সে আমাকে অনুসরণ করে আমার বাড়ি পর্যন্ত আসে, এবং আমার ঘরে আসার অনুমতি চায়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে অনুসরণ করেছ কেন?' সে বলল, 'তোমার রূপ আমাকে যাদু করেছে।' এ কথা শুনে মনে মনে খুশি হয়ে তাকে ঘরে আসতে বললাম। তাকে আমি কিছু জলযোগ করে যেতে বললাম, সেও তাতে রাজি হয়ে সামান্য কিছু খেয়ে চলে গেল, যাবার সময় বলে গেল সন্ধ্যায় আবার আসবে। সে ফিরে এলো সন্ধ্যা ৭টায়। সে সঙ্গে এনেছিল আমার গায়ে এখন যে গয়না দেখছেন এইগুলো নিয়ে। সে আমাকে এগুলো পরতে দিল। আমি প্রথমে রাজি হই নি, কিন্তু সে বলল তার এত টাকা আছে যা দিয়ে সে সরকারের কারখানা কিনতে পারে। এ কারখানা হচ্ছে সরকারের কাশীপুরের বন্দুক তৈরির কারখানা। তখন আমি তার দেওয়া গয়না পরতে রাজি হলাম। সে আমার প্রতি খুবই ভালবাসা দেখাল, আমার রূপের প্রসঙ্গে বলল, 'তোমার সৌন্দর্য একমাত্র রাজার প্রাসাদেই মানায়, আমি তোমাকে রানীর পদে বসাব। তার বদলে আমি চাই তোমার শুধু ভালবাসা, আর চাই সব বিষয়ে আমার পুরো বশ্যতা। এইভাবে সে আমাকে তার সঙ্গে গিয়ে সম্পদ ভোগ করতে বলল। তার এত টাকা। আমি তারই অংশীদার হব। আমি রাজি হয়ে গেলাম। আমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে চলে গেল এবং আরও অনেক রকম উপহার নিয়ে এলো আমার জন্য। তারপর কয়েকদিন ধরে সে আমার কাছে এলো এবং প্রত্যেকবার তার ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ আরও বেশি বেশি উপহার আনতে লাগল—দামী শাড়ী, দামী গয়না।

'তিন দিন আগে সে আমার কাছে এসে বলল, আমি তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত কি না। আমি বললাম অবশ্যই প্রস্তুত। অতঃপর সে আমাকে এনটালিতে অবস্থিত এক বাগানবাড়িতে নিয়ে তুলল। সেইখানে তার সঙ্গে আমি একরাত্রি কাটাই। পরদিন সে এই পাল্কী নিয়ে এসে পাল্কীবাহক ও পাল্কীকে তার মনের মতন করে সাজাল। তারপর সে আমাকে পাল্কীতে উঠতে বলল, এবং বাহকদের নির্দেশ দিল কটন স্ট্রীটের একটি বাড়িতে নিয়ে পৌছে দিতে। সেখানে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে তোলা হল, এবং আব্বাস বাহকদের সেখান থেকে সরে যেতে আদেশ দিল। অত.পর আব্বাস আমাকে বলল, ভবিষ্যতে আমাকে বড ঘরের মহিলাদের রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। আর সেজন্য গোপনেই থাকতে হবে। আমি তার সমস্ত কথাই মানতে রাজি হলাম। রাজি আগেই তো হয়েছিলাম।

'এর পর সে আমাকে জানাল, আমাকে সে আমার পদমর্যাদার উপযুক্ত অলঙ্কারে সাজাবে, সেজন্য সে আমাকে বড় অলঙ্কারের দোকানে নিয়ে যাবে। এই অলঙ্কার ধারণ করলে আমি সম্রান্ত মহিলার মর্যাদা লাভ করব। অন্য সকল দিক থেকেই সে আমাকে তার কুবেরের ধন দিয়ে বড় করেছে। অলঙ্কারেও করবে। এ কথায় তার আন্তরিকতা বিষয়ে আর আমার কোনো সন্দেহই রইল না। এর পর সে আমাকে জুয়েলারের দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাকে কি করতে হবে সমস্ত নির্দেশ দিল। কি করে অলঙ্কার পছন্দ করতে হবে তার নির্দেশ হল এই যে, সে যখন কোনো অলঙ্কারের দাম উচ্চারণ করবে, সেইটে আমাকে রাখতে হবে, যেটার দাম উচ্চারণ করবে না, সেটা আমি তাকে ফিরিয়ে দেব, তাতে বোঝা যাবে সেটা আমার পছন্দ নয়। তারপর কি ভাবে সেই পছন্দকরা অলঙ্কার সরাইয়ের মধ্যে ঢোকাতে হবে, এবং তারপর সরবত খাইতে চাইব, এবং আব্বাসকে সরাইটা বার করে দিতে হবে—সব সে শিখিয়ে দিল। সে আমাকে বোঝাল এই সবই হচ্ছে উচ্চবংশের মহিলাদের দস্তুর। আমি সত্যিই তার কথা বিশ্বাস করে এ কাজ করেছি। আমার এত ঐশ্বর্য হচ্ছে, আমি রানী হতে চলেছি কাজেই সে যা বলছে তাই শুনেছি। আব্বাস খাঁ যে একজন জুয়াচোর তা আমি কখনো সন্দেহ করি নি।

পাল্কীবাহকেরা বলল, তারা এনটালির বাসিন্দা। তাদের আগের দিন বলা হয়েছিল শহরতলীর এক বাগানবাড়ি থেকে এক রানীকে নিয়ে

বড়বাজারে কটন স্ট্রীটের একটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। (পরে এই বাহকেরা কটন স্ট্রীটের বাড়িটি সনাক্ত করেছিল।) পাল্কীর ঢাকনা, বাহকদের পোষাক, সবই আব্বাস খাঁ দিয়েছিল। তাদের ভাল মজুরি দেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে এই ছিল শর্ত।

দণ্ডবাহককেও ঐ পাড়া থেকেই নিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং সেও বাগানবাড়ি থেকে তার পোষাক ইত্যাদি পেয়েছিল।

পুলিস পরে বাগানবাড়ির মালিককে জেরা করে, কিন্তু তিনিও ঐ পাল্কীবাহকদের চেয়ে বেশি কিছু জানেন না। আব্বাস খাঁয়ের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় নেই, বাগানবাড়ি সে ভাড়া নিয়েছিল মাত্র।

আব্বাস খাঁ ও নয়ামুদ্দীনের নামে এর পর যথারীতি পরওয়ানা বার করা হয়েছিল, এবং তাদের ধরতে পারলে বড় রকমের পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু পরওয়ানায় কোনো ফল হয় নি, এবং পুরস্কারেরও কেউ দাবী জানাতে আসে নি।

পুলিসদের বিষয়ে কিছু মন্তব্য

লর্ড লিটনের কয়েকটি কথা আগে স্মরণ করি। তিনি বলেছেন, 'যখনই আপনি কোনো বইতে কোনো উচ্চসাফল্যলাভকারী মহৎ ব্যক্তির জীবনকথা পড়বেন, তখনই আপনি তাঁর মধ্যে সেই সব গুণ দেখতে পাবেন, যা মাঝারি রকমের একজন দুশ্চরিত্র লোককে গড়ে তুলেছে। সুতরাং দুর্ভাগ্যবশত যদি আপনি সমাজের সাধারণ স্তরে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা হলে খুব যত্ন করে আপনি মহৎ লোকদের জীবনী পড়বেন, কারণ তা হলে আপনি এক সফল দুশ্চরিত্র লোক হতে পারবেন। আর আপনি যদি সমাজের উচ্চস্তরে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা হলে দুশ্চরিত্র লোকদের জীবন খুব যত্নের সঙ্গে অনুশীলন করবেন, কারণ তা হলে আপনি একজন বিখ্যাত লোক হতে পারবেন।'

ডিটেকটিভের বৃত্তি গ্রহণের পর আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, মিস্টার উয়াউচোপ এবং সার স্টুয়ার্ট হগ—এই দুজন পুলিস অফিসারের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি গুণী? এ বিষয়ে কোনো ব্যক্তিগত মত প্রকাশ

'তিন দিন আগে সে আমার কাছে এসে বলল, আমি তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত কি না। আমি বললাম অবশ্যই প্রস্তুত। অতঃপর সে আমাকে এনটালিতে অবস্থিত এক বাগানবাড়িতে নিয়ে তুলল। সেইখানে তার সঙ্গে আমি একরাত্রি কাটাই। পরদিন সে এই পাল্কী নিয়ে এসে পাল্কীবাহক ও পাল্কীকে তার মনের মতন করে সাজাল। তারপর সে আমাকে পাল্কীতে উঠতে বলল, এবং বাহকদের নির্দেশ দিল কটন স্ট্রীটের একটি বাড়িতে নিয়ে পৌঁছে দিতে। সেখানে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে তোলা হল, এবং আব্বাস বাহকদের সেখান থেকে সবে যেতে আদেশ দিল। অত:পর আব্বাস আমাকে বলল, ভবিষ্যতে আমাকে বড় ঘরের মহিলাদের রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। আর সেজন্য গোপনেই থাকতে হবে। আমি তার সমস্ত কথাই মানতে রাজি হলাম। রাজি আগেই তো হয়েছিলাম।

'এর পর সে আমাকে জানাল, আমাকে সে আমার পদমর্যাদার উপযুক্ত অলঙ্কারে সাজাবে, সেজন্য সে আমাকে বড় অলঙ্কারের দোকানে নিয়ে যাবে। এই অলঙ্কার ধারণ করলে আমি সম্ভ্রান্ত মহিলার মর্যাদা লাভ করব। অন্য সকল দিক থেকেই সে আমাকে তার কুবেরের ধন দিয়ে বড় করেছে। অলঙ্কারেও করবে। এ কথায় তার আন্তরিকতা বিষয়ে আর আমার কোনো সন্দেহই রইল না। এর পর সে আমাকে জুয়েলারের দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাকে কি করতে হবে সমস্ত নির্দেশ দিল। কি করে অলঙ্কার পছন্দ করতে হবে তার নির্দেশ হল এই যে, সে যখন কোনো অলঙ্কারের দাম উচ্চারণ করবে, সেইটে আমাকে রাখতে হবে, যেটার দাম উচ্চারণ করবে না, সেটা আমি তাকে ফিরিয়ে দেব, তাতে বোঝা যাবে সেটা আমার পছন্দ নয়। তারপর কি ভাবে সেই পছন্দকরা অলঙ্কার সরাইয়ের মধ্যে ঢোকাতে হবে, এবং তারপর সরবত খাইতে চাইব, এবং আব্বাসকে সরাইটা বার করে দিতে হবে—সব সে শিখিয়ে দিল। সে আমাকে বোঝাল এই সবই হচ্ছে উচ্চবংশের মহিলাদের দস্তুর। আমি সত্যিই তার কথা বিশ্বাস করে এ কাজ করেছি। আমার এত ঐশ্বর্য হচ্ছে, আমি রানী হতে চলেছি কাজেই সে যা বলছে তাই শুনেছি। আব্বাস খাঁ যে একজন জুয়াচোর তা আমি কখনো সন্দেহ করি নি।

পাল্কীবাহকেরা বলল, তারা এনটালির বাসিন্দা। তাদের আগের দিন বলা হয়েছিল শহরতলার এক বাগানবাড়ি থেকে এক রানীকে নিয়ে

বড়বাজারে কটন স্ট্রীটের একটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। (পরে এই বাহকেরা কটন স্ট্রীটের বাড়িটি সনাক্ত করেছিল।) পাল্কীর ঢাকনা, বাহকদের পোষাক, সবই আব্বাস খাঁ দিয়েছিল। তাদের ভাল মজুরি দেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে এই ছিল শর্ত।

দণ্ডবাহককেও ঐ পাড়া থেকেই নিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং সেও বাগানবাড়ি থেকে তার পোষাক ইত্যাদি পেয়েছিল।

পুলিস পরে বাগানবাড়ির মালিককে জেরা করে, কিন্তু তিনিও ঐ পাল্কীবাহকদের চেয়ে বেশি কিছু জানেন না। আব্বাস খাঁয়ের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় নেই, বাগানবাড়ি সে ভাড়া নিয়েছিল মাত্র।

আব্বাস খাঁ ও নয়ামুদ্দীনের নামে এর পর যথারীতি পরওয়ানা বার করা হয়েছিল, এবং তাদের ধরতে পারলে বড় রকমের পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু পরওয়ানায় কোনো ফল হয় নি, এবং পুরস্কারেরও কেউ দাবী জানাতে আসে নি।

পুলিসদের বিষয়ে কিছু মন্তব্য

লর্ড লিটনের কয়েকটি কথা আগে স্মরণ করি। তিনি বলেছেন, 'যখনই আপনি কোনো বইতে কোনো উচ্চসাফল্যলাভকারী মহৎ ব্যক্তির জীবনকথা পড়বেন, তখনই আপনি তাঁর মধ্যে সেই সব গুণ দেখতে পাবেন, যা মাঝারি রকমের একজন দুশ্চরিত্র লোককে গড়ে তুলেছে। সুতরাং দুর্ভাগ্যবশত যদি আপনি সমাজের সাধারণ স্তরে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা হলে খুব যত্ন করে আপনি মহৎ লোকদের জীবনী পড়বেন, কারণ তা হলে আপনি এক সফল দুশ্চরিত্র লোক হতে পারবেন। আর আপনি যদি সমাজের উচ্চস্তরে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা হলে দুশ্চরিত্র লোকদের জীবন খুব যত্নের সঙ্গে অনুশীলন করবেন, কারণ তা হলে আপনি একজন বিখ্যাত লোক হতে পারবেন।'

ডিটেকটিভের বৃত্তি গ্রহণের পর আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, মিস্টার উয়াউচোপ এবং সার স্টুয়ার্ট হগ—এই দুজন পুলিস অফিসারের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি গুণী? এ বিষয়ে কোনো ব্যক্তিগত মত প্রকাশ

না করে আমি তাঁদের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দেব, পাঠকেরাই তা থেকে বুঝতে পারবেন, কে বেশি গুণী।

প্রথমোক্ত জন গভীরভাবে চিন্তা করতে জানেন, এবং কথা বলেন কম। ডিটেকটিভ হিসাবে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। দ্বিতীয়োক্ত জন ডিটেকটিভ নন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাশক্তি অতি প্রবল, এবং শাসন ক্ষমতা অসাধারণ। মিস্টার উয়াটচোপ অধীন কর্মীদের কোনো বিষয়ে ভাবতেই দেন না, সব চিন্তার ভার নিজের উপরে রাখেন। সার স্টুয়ার্ট অধীন কর্মীদের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ দেন। যদি তাদের মধ্যে কোনো সুপ্ত ডিটেকটিভ শক্তির সন্ধান পান, তাহলে সার স্টুয়ার্ট তা জাগিয়ে তুলতে উৎসাহী হন। মিস্টার উয়াউচোপ এ রকম আভাসমাত্র পেলে তার উপর জল ঢালেন। কোনো অধীন কর্মী তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছে জানলে তিনি তাকে ক্ষমা করেন না। সার স্টুয়ার্ট অধীন কর্মীর আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ দেন।

আমি একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, তা থেকে দুই অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুলিস অফিসারের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর তাতে কলকাতা পুলিসবাহিনীর পরিচালনার উপর এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিক্রিয়া কি, কোথায় সুবিধা, কোথায় অসুবিধা, তাও বোঝা যাবে।

একদিন কলকাতা স্মল কজ কোর্টের একজন বেলিফ এক ঠিকাগাড়িতে করে দেনার দায়ে অভিযুক্ত এক আসামীকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িখানা যখন ময়দানের একটি নির্জন অংশ পার হয়ে এগিয়ে এসেছে, সেই সময় ঐ আসামী বেলিফকে এক ধাক্কায় গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। লোকটির গায়ে খুবই শক্তি ছিল, কাজেই তার পক্ষে এ কাজটি কঠিন হয় নি। বেলিফকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার একখানা হাত ভীষণভাবে ভেঙে গেছে।

ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই আদালতের প্রথম জজের কাছে খবর এসে পৌছলে তিনি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। আমার কাছে খবর আসামাত্র আমি হাওড়া ও শিয়ালদহ—এই দুটি স্টেশনেই লোক পাঠিয়ে দিলাম—যদি লোকটিকে কোনো একটা স্টেশনে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। কিন্তু তখন অত্যন্ত দেরি হয়ে গিয়েছিল। লোকটি সব বুঝতে পেরে আগেই চন্দননগরে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম ফরাসী সরকার কোনো

ইউরোপীয় আসামীকে গ্রেফতার করায় আমাকে কোনো সাহায্যই করবে না, কারণ বিদেশী সরকারের হাতে নিজের দেশ থেকে কোনো অপরাধীকে সমর্পণ করতে বিশেষ পরোয়ানা দরকার হয়। এই এক্সট্র্যাডিশন ওয়ারান্ট ভিন্ন আমি কিছুই করতে পারি না। কাজেই আমি ঐ লোকটাকে কোনো রকমে প্রলুব্ধ করে ফরাসী সীমানার বাইরে এনে ফেলব স্থির করলাম। এতে আর আমাকে দুই সরকারের কাছে আবেদন করার হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না।

আমি ফরসাইথ নামক এক তরুণ কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে আসামীর উদ্দেশে যাত্রা করলাম। ফরসাইথকে নেওয়ার উদ্দেশ্য, সে অল্পদিন হল পুলিসে যোগ দিয়েছে, তাই এখনও সে অনেকখানি অপরিচিতই আছে, আর এটাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক। সহজে কেউ তাকে চিনতে পারবে না। আসামীরও সে অপরিচিত।

চন্দননগরে পৌঁছে আসামীকে খুঁজে বার করতে আমার দেরি হল না। তার নেশা আমি জানতাম—মদ্যপান এবং বিলিয়ার্ড খেলা। তার এই নেশার পথেই তাকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলতে হবে। ফরসাইথকে তার ডিনার টেবিলে যোগ দিতে নির্দেশ দিলাম। আমরা যখন হোটেলে গিয়ে পৌঁছলাম সেই সময় ডিনার পরিবেশন করা হচ্ছিল। ফরসাইথ আমার নির্দেশ অনুযায়ী আসামীর সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলল। ডিনার শেষ হলে ফরসাইথ ওর সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলার প্রস্তাব করবে, এবং আসামীকে মুক্ত হস্তে মদ খাওয়াবে নির্দেশ দেওয়া হল। কনস্টেবলকে বললাম, রাত দশটা আন্দাজ সময়ে লোকটা তোমার প্রেমে পড়ে যাবে, এবং তখন তুমি ওকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। ঐ সময়ে চাঁদও উঠবে, এবং মদই প্রধান হয়ে ওঠাতে বিলিয়ার্ডস আর তখন ভাল লাগবে না। সেই সময়ে ওকে বলবে, চল না বন্ধু, শুতে যাওয়ার আগে একবার চাঁদের আলোয় কিছু বেড়ানো যাক। এইভাবে তাকে ফরাসী সীমানা পার করিয়ে আনবে। তারপর একবার তাকে সীমানার বাইরে আনতে পারলে তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে ফেলব। এই চাতুরিতে কাজ হল, এবং পলাতক পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই কলকাতার হাজতে বন্দী হল। সব কাহিনী শুনে সার স্টুয়ার্ট হগ অত্যন্ত খুশি হলেন, এবং তিনি এই ঘটনাটি যে-কোনো উপলক্ষে বন্ধুদের কাছে বলতেন। কিন্তু এই রকম একটি কাজ বিনা অর্ডারে করলে মিস্টার উয়াউচোপ খুশি হতেন

না, তিনি তিরস্কার বর্ষণ করতেন। কাজের সাফল্য তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যেত, তিনি শুধু দেখতেন বিনা আদেশে করা হল কেন।

কয়েক বছর আগে ম্যাঙ্গো লেন থানায় একজন পুলিস অফিসার এসেছিলেন। তিনি একটু খামখেয়ালি ধরনের লোক হলেও খুব উপযুক্ত অফিসার ছিলেন। ঐ অঞ্চলে একটা বিশেষ ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠিত হত। তিনি এই অপরাধ দমন কাজে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। এবং সেই বিশেষ ধরনের অপরাধও লুপ্ত হল। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন, তিনি অন্তত একটি অপরাধও ধরতে পারেন নি, তাঁর সে ক্ষমতাও ছিল না। অথচ পূর্ব অফিসারের প্রাপ্য প্রশংসা তিনিই পেলেন।

একজন খুব উপযুক্ত অফিসারকে তাঁর উপরওয়ালা বলতেন, জান, আমি কোনো থানার ভার না পাওয়া পর্যন্ত সেই এলাকায় একটা বিশেষ ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে দেখি না। যেন অপরাধীরা তাঁর উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই এ রকম করে, এবং তিনি বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেলে তারা আবার সাধু হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলি। কিছুদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মিস্টার রীড, এ কেমন কথা যে এখন আর আগের মতন সব মজার কেস পাই না, সেই সব অন্যের হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার কেস্, উত্তরপত্রের জালিয়াতির কেস্? আপনি পুলিস বিভাগ ছেড়ে যাবার পর এসব আর দেখি না কেন?' আমি বললাম, 'ছাত্রেরা সম্ভবত গত কয়েক বছরে নীতিশিক্ষায় অনেকটা এগিয়ে গেছে, যেমন তারা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় এগিয়েছে।'—ব্যারিস্টার আমার এ ব্যাখ্যায় আমার প্রতি সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং মাথা নেড়ে জানালেন, তিনি এ কথা বিশ্বাস করেন না।

অপরাধের হ্রাসপ্রাপ্তি বা আধিক্য দেখে সব সময় বিচার ঠিক হয় না। রিপোর্টিং ঠিক মতন না হলে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন।

এমন ঘটা স্বাভাবিক যে, কোনো বিভাগে যে সব অপরাধ ঘটে তা কর্তৃপক্ষের কাছে বিবৃত হয় না, বা প্রকাশ করা হয় না। অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কি হচ্ছে না, তার হিসাব অনেক সময় আবার বিশেষ পুলিস অফিসারের উপর নির্ভর করে। যিনি দৃষ্টি সজাগ রেখে বহু অপরাধ সাফল্যের সঙ্গে তদন্ত

করতে পারেন এবং অপরাধীদের ধরতে পারেন, তাঁর এলাকায় স্বভাবতই অপরাধ বেশি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বোধ হবে। আবার যে এলাকার অফিসার তদন্তে খুব পটু নন, অথবা যাঁর কাছে রিপোর্ট আসে না, তাঁর এলাকায় অপরাধ কমে গেছে বোধ হবে। কাজেই অফিসার-বদলে, কেস্ কমল বা বাড়ল কেন তার হিসাব অন্য দিক থেকে করতে হবে। কলকাতার আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কিত আইন যেভাবে কার্যকর হয়, তা থেকে আমার কথার সত্যতা আরও বেশি প্রমাণিত হবে। ডিটেকটিভ বিভাগের কাজ ছাড়াও প্রায় চার বছর আগ্নেয়াস্ত্র আইনের যাবতীয় ভার ছিল আমার উপর, এবং এই অল্পকালের মধ্যে আমি যত চোরাই আগ্নেয়াস্ত্র কেস ধরেছি, এবং এই সম্পর্কের যত অপরাধীকে গ্রেফতার করেছি, আমার আগের পনেরো বছরে তত হয় নি। এর পরে আরও ছ বছর কেটেছে আমার পরবর্তী অফিসারকে সব বুঝে পড়ে দিতে। কলকাতা পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট পরীক্ষা করলেই আমার বিবরণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কেস্-এর কথা উল্লেখ করি। এটি ব্রিটিশ রানী বনাম সাজাওয়ে মগ্ ও ওয়াজাওয়ে মগ্। এরা 'মারহাট্টা' ও 'বুশায়ার' নামক দুখানা জাহাজে কাটা কাপড় ও মলমলের নামে বুক করা বাক্সসমূহে বর্মায় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ চালান দিচ্ছিল। এতে প্রমাণ হয় কত সহজে ১৮৬০ সালের ৩১ নং আইনের ধারাগুলি এড়িয়ে চলা সম্ভব, এবং দোকানীরা কত সহজে ক্রেতার হাতের খেলনা হয়ে আধা ডজন কাল্পনিক নামে বিক্রির পরিমাণ বাড়িয়ে দেখাতে পারে।

এমন কথা বলা চলে যে অস্ত্র গুলিবারুদ বিক্রেতাদের আমার প্রতি বিদ্বেষ ছিল তাই এইভাবে আইন ভঙ্গ করে আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করেছে। অবশ্য একটা কেস্-এ এ রকমই মনে হবে। যেন সত্যিই আমার উপর তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই তারা আইন ভঙ্গ করেছিল। ঘটনাটা বলি।

একজন বন্দুক বিক্রেতার কাছ থেকে একখানা আবেদন এলো তাকে একটি গুদামে বারুদ রাখার লাইসেন্স দেওয়া হোক। তার কারবার ছিল চাঁদনি চকে। গুদামটাও কাছাকাছি জায়গায়। আমি ঘোড়ায় চেপে ঐ বাড়িটি এবং স্থানটি বিস্ফোরক পদার্থ রাখার উপযুক্ত কি না তদন্ত করতে গেলাম। বাড়ির মালিক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, এবং আমার সঙ্গে আমার সহিস না থাকাতে সেই এগিয়ে এসে ঘোড়াটা ধরতে চাইল, আমিও

খুশি মনে রাজি হলাম। যে ঘরে বারুদ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে সেটি উপর তলায়। বাইরে থেকে সিঁড়িতে সেখানে ওঠা যায়। আমি একা উঠে গিয়ে ঘরটি দেখলাম। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে আমি জানালাম ও ঘরে বারুদ রাখা চলবে না, ঘরটি তার উপযুক্ত নয়। বাড়ির মালিক তা শুনে বলল, 'আমি আর একটা গুদাম দেখাচ্ছি।' আমি সেটা দেখতে যাব উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় চাপতে যাচ্ছি এমন সময় লক্ষ করলাম, যে ঘরটি দেখলাম, তার নিচের তলার ঘরটি বাইরে থেকে তালা বন্ধ আছে। আমি তখন খোঁজ নিলাম ঐ ঘরটায় কি আছে। জানা গেল, ওটা খালি পড়ে আছে। আমি ভিতরটা দেখতে চাইলে মালিক জানাল ও ঘরের তালার চাবিটা হারিয়ে গেছে, খোলা যাবে না। আমি বললাম, 'ঘর যদি খালি থেকে থাকে তবে ঐ চাবিহীন তালাটার কি বা দাম?' বলে পাশের দোকান থেকে একটি হাতুড়ি চেয়ে নিয়ে যে গোঁজটার সঙ্গে তালা লাগানো ছিল সেটা ভাঙতে উদ্যত হওয়া মাত্র মালিক হাতের ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি অবলম্বন করল, তাকে আর দেখা গেল না।

দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখি দেশী বারুদ ভরা একটি খোলা পিপে রয়েছে সেই ঘরে। তারপর দেখি একটি দড়ি ঐ পিপে থেকে দরজার বাইরে পর্যন্ত পাতা আছে, এবং দড়ির বইরের অংশে আধপোড়া একটি দেশলাইয়ের কাঠি পড়ে আছে। আমি যখন উপরে তদন্ত করছিলাম, সেই সময় আমাকে এইভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মেরে ফেলবার আয়োজন করেছিল, কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হল। মালিককে পরে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করা গেল না। শুধু সে যে, ঘরের জন্য লাইসেন্স না নিয়ে বারুদ গুদামজাত করেছিল, এবং আইনসঙ্গতভাবে যতটা বারুদ সে রাখতে পারে তার চেয়ে বেশি রেখেছিল এই অপরাধ ভিন্ন আর কিছু প্রমাণ হল না।

এ সব দৃষ্টান্ত থেকে পুলিস অফিসারদের একটি জিনিস শেখা উচিত—সে হচ্ছে সব সময় সতর্ক থাকা, সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং কোনো মুহূর্তের জন্যও শিথিলতা না দেখানো। আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। এতেও বোঝা যাবে অপরাধ সংঘটিত হলে সে বিষয়ে রিপোর্ট করলে তবেই তাতে কিছু লাভ হয়।

আপনি ধরুন র‍্যালি ব্রাদার্সে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ছোটখাটো চুরিতে তাঁদের বছরে কত টাকার ক্ষতি হয়। প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা হয়তো

বলবেন, প্রায় এক লাখ টাকা। আপনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কটা কেস্ ধরা পড়ে এবং ক'জনের শাস্তি হয়? তাঁরা বলবেন, মাসে গড়ে একটা। দেখা যাবে চুরিতে বছরে যত টাকা লোকসান হয়, সে পরিমাণ লোকসানে দৈনিক পঁচিশ থেকে ত্রিশটি চুরি দরকার হয়। এঁদের প্রতিষ্ঠানে চুরি বন্ধের জন্য খুব চটপটে একজন পুলিস অফিসারকে নিয়োগ করুন, তিনি মাসে দুটো একটা না ধরে দৈনিক অন্তত পাঁচটা চোরকে ধরবেন। তা হলে দেখবেন, এতে যে শুধু ঐ ধৃত চোরগুলিই সেখান থেকে কমে যাবে তাই নয়, যারা অপেক্ষাকৃত ভীরু তারাও চুরি বন্ধ করে দেবে। এবং স্থানটি নিরাপদ নয় মনে করে অন্যত্র চলে যাবে। শুধু দুঃসাহসী চোরেরাই থেকে যাবে। তারপর তাদের দিকেও যখন পুলিসের দৃষ্টি পড়বে, তখন তারাও ভাগবে।

উচ্চস্তরের প্রতারণা কৌশল

'অ্যাঁ! শেষকালে কি না এক দেশী ভদ্রলোক আমাকে ঠকিয়ে গেল! আমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে গেল! আমি এমন বর্বর? আমার নিজের বেয়ারা অথবা খানসামা আমাকে ঠকায় তার মানে বুঝি. কিন্তু একজন চতুর ধূর্ত খল প্রকৃতির বাঙালী আমাকে ঠকিয়ে গেল? এবং সেও দু'চার টাকা নয়, আটশ' আশি টাকা। আমার গলায় এর চেয়ে দড়ি—'

মিস্টার প্যারকিন্‌স এই ধরনের স্বগতোক্তি কতক্ষণ চালাতেন জানি না, কিন্তু তাঁর দরজায় টোকা পড়ল এবং তাঁর বন্ধু সাইমণ্ডস ভিতরে প্রবেশ করাতে তাঁর আত্মচিন্তায় বাধা পড়ল।

সাইমণ্ডস প্রবেশ করেই বললেন, 'এই যে, গুড মর্নিং মিস্টার প্যারকিন্‌স, আমি মনে করেছিলাম ঘরে অন্য কেউ রয়েছে তাই দরজায় টোকা দিয়েছি আগে। কিন্তু এখন দেখছি আপনি একা। তবে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?'

প্যারকিন্‌স নিবে যাওয়া সিগারের শেষ অংশটুকু সজোরে একটা পাত্রে নিক্ষেপ করে বললেন, 'আর কেউ নেই, আমি একা রয়েছি। আমি নিজে নিজেই কথা বলছিলাম। যখন মানসিক অবস্থা খারাপ থাকে তখন সেই বিচলিত অবস্থায় এই ভাবে কথা বলে মনটাকে হাল্কা করার

চেষ্টা করি। ভাল কথা, সাইমণ্ডস, আপনি তো একজন ভাল আইনজীবী, তাই না?'

প্রশংসাবাক্যে গর্বিত বোধ করে সাইমণ্ডস বললেন, 'দেওয়ানি আর ফৌজদারি আইনে আমার কিছু জ্ঞান আছে, লোকে বলে। কিন্তু বন্ধুরা প্রায়ই দেখি শস্তায় আমার উপদেশ পেতে চায়। কিন্তু বন্ধু, আপনার কি হয়েছে? কোনো বিপদে পড়েছেন? আশা করি তা নয়?'

'ঠিক বিপদ নয়, কিন্তু আপনি আমার বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার কথা তো জানেন। সম্ভবত আপনাকে বলেওছি যে আমার এই বর্তমান সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কয়েক হাজার টাকা ধার সংগ্রহের চেষ্টা করছি। সেদিন কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম, সহজ শর্তে টাকা ধার দেওয়া হয়। আমি সেই লোন অফিসের মালিককে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম, বারো মাসের জন্য কি শর্তে আমি আট থেকে দশ হাজার টাকা ধার পেতে পারি। পরদিন এক বাবু এসে বলল সে ঐ লোন অফিসের ম্যানেজারের নির্দেশে জানতে এসেছে আমি ঐ ঋণের জন্য কি বন্ধক রাখতে রাজি আছি। আমার পরিচয় শুনে সে বলল আমাকে অন্য কোনো বন্ধক দিতে হবে না, ব্যক্তিগত জামিনে শুধু হ্যাণ্ড নোটেই ঐ টাকা দেওয়া যেতে পারবে। আমি খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম বারো মাসে আট হাজার টাকার জন্য কত সুদ দিতে হবে। বাবু বলল, শতকরা দশ ও দালালি শতকরা দু টাকা পেলে কাল সকালেই পুরো টাকার চেক দেওয়া হবে। আমি রাজি হলাম। সে আমাকে আমার বিশেষ পরিচিত আরও অনেককে এই শর্তে টাকা ধার দিয়েছে তার দলিল দেখাল। আমি তাকে সুদ ও দালালির জন্য মোট আটশ' আশি টাকা তার হাতে দিলাম। তার কথা অবিশ্বাস করার মতন কোনো কারণ ছিল না। সে আমাকে, যে টাকা দিলাম তার জন্য রসিদ দিল এবং তাদের বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের অফিসের নম্বর বলল। পরদিন কিন্তু তার দেখা পেলাম না। মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আজ তার খোঁজে বেরিয়েছিলাম, এবং তার দেওয়া ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে দেখি সেটা একটা কফিন তৈরির কারখানা। এরা মৃতদেহ সৎকার করে। এরপর আমার মনের অবস্থা কি হল তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। এখানকার মালিক আমার বিব্রত অবস্থা দেখে আমার কাছে ছুটে এলো। সে ভেবেছিল আমার কোনো আত্মীয় মারা গেছে, তার সৎকারের ব্যবস্থার জন্য এসেছি। সে

অনেকগুলো নক্সা এনে আমাকে দেখাল। তাতে নানা জাতীয় ফলক এবং মনুমেণ্টের ছবি আছে। কোনোটার উপরে মার্বেলের ক্রন্দনরতা পরীদের ছবি। সে এগুলি আমার বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করল, এর মধ্যে কোনোটা আমার পছন্দ কি না। যেটা পছন্দ করব, তারা আমার আত্মীয়ের সমাধির উপর সেই ফলক বা মনুমেণ্ট গড়ে দেবে। আরও জানাল, অর্ডার পাওয়া মাত্র তারা কাজ শেষ করে দেবে। এবং একথাও দুঃখের সঙ্গে জানাল যে, সার স্টুয়ার্ট হগ শহরে ভাল জল সরবরাহ এবং উন্নত ড্রেন পদ্ধতি প্রচলিত করাতে তাদের ব্যবসা কিছু মন্দা চলছে। এখন আর আগের মতন অর্ডার পাওয়া যাচ্ছে না।

আমার ধৈর্য ভেঙে গেল, আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এখানে ভোলাচাঁদ ধর নামে কোনো দালাল থাকে?'—ভোলাচাঁদ ধর, এই নামই সে আমার টাকা পেয়ে রসিদের উপর সই করেছিল। কফিন কারখানার মালিক 'না' বলাতে আমি কোচম্যানকে ম্যাঙ্গো লেনে গাড়ি চালাতে বললাম। আমার উদ্দেশ্য, সেখানে লোন অফিসের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে ভোলাচাঁদ ধর সম্পর্কে সন্ধান নেব। কিন্তু এখানেও তার সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারল না। লোন অফিসের মালিক স্বীকার করল যে আমার চিঠি পেয়েছে, কিন্তু কোনো এজেণ্ট বা দালালকে ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পাঠানো হয় নি। কথাটা সত্যও হতে পারে, কিন্তু আমার মন বলল, এ লোকটি গভীর জলের মাছ, এবং সে নিশ্চয় সব জানে। নইলে আমি যে লোন অফিসে চিঠি লিখেছি তা ভোলাচাঁদ ধর টের পেল কি করে? আমি এই লোকটাকে আমার মনের কথা বলে ফেলেছিলাম আর কি, কিন্তু সৌভাগ্যবশত ঠিক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলাম। এবং আর কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। আপনি বুঝতে পারছেন মিস্টার সাইমণ্ডস যে আমি কি রকম সমস্যার মধ্যে পড়েছি?'

সাইমণ্ডস আমার কাহিনী শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। কফিনের কারখানার ঘটনাটা তাঁর কাছে বড়ই কৌতুকপ্রদ বোধ হয়েছিল। বললেন, 'রাস্ক্যালটাকে ধরিয়ে দিতেই হবে।'

'বলা তো সোজা, বন্ধু, কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কোথায়?'

'আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে গ্রেফতারি পরোয়ানার জন্য আবেদন করুন।'

'কিন্তু আমি এই দুর্ভাগ্যের কথা সবাইকে জানাতে চাই না। কেস আদালতে উঠলে জানাজানি হয়ে যাবে যে। আর তার ফলে অন্তত বছর খানেক ধরে এ নিয়ে যে আলোচনা আর হাসাহাসি হবে, আমি হব তার লক্ষ্য। তাতে আমাকে কিছু অপদস্থ হতে হবে, তাই ও-পথে যেতে চাই না।'

সাইমণ্ডস বললেন, 'পাঁচজন যাতে না জানে তাই করতে হবে। আমাদের বন্ধু মিস্টার জে বি রবার্টসের সঙ্গে তো আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, তাই না? তিনি নিশ্চয় প্রয়োজনীয় কাজ গোপনেই সমাধা করে দেবেন।'

প্যারকিন্‌স তার উত্তরে বললেন, 'লালবাজারের এই বিচারকের চরিত্র আপনি জানেন না। তিনি কখনও তা করবেন না। ক্লাবের জে বি রবার্টস্ আর পুলিস আদালতের জে বি রবার্টস্ আকাশ পাতাল তফাৎ। তাঁর পিতার খাতিরেও তিনি বিচারকের বাঁধা পথ থেকে একচুলও এদিক ওদিক নড়বেন না।'

মিস্টার সাইমণ্ডস বললেন, 'কখনো পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

'কি যে বলেন! কি বিপদে পড়েছিলাম বলি। অল্প কিছুদিন আগে আমার একজন চাকরকে চুরির দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর জন্য আমাকে আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছিল। পূর্বদিন সন্ধ্যায় এক বন্ধুর বাড়িতে রবার্টসের সঙ্গে আমার দেখা হয়। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমরা করমর্দন করি। আমি তাঁকে বলি, 'কাল আমি আপনার সঙ্গে আদালতে দেখা করছি।' তিনি বললেন, 'আপনার জন্য যা করতে পারি করব।' তিনি তাঁর বিনম্রী ব্যবহারে আমাকে মুগ্ধ করলেন। পরদিন যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হলে আমার কেসটি উঠল এবং আমার ডাক পড়ল। আমি তাঁকে উদ্দেশ করে আমার কথা বিস্তারিত করে বলতে আরম্ভ করা মাত্র তিনি আমাকে হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'মিস্টার প্যারকিনস্, এটি বক্তৃতার জায়গা নয়। যদি আপনার আসামী সম্পর্কে কিছু বলবার থাকে, তবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করুন।' এই তিরস্কারে আমি চমকে গেলাম, এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম, তিনি আমাকে ভুল করে অন্য লোক মনে করেন নি তো? কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গে আমার দৃষ্টি-বিনিময় হল তখনই তাঁর দৃষ্টিতে তাঁর ভাষাটি পড়তে পারলাম—'মিস্টার প্যারকিন্‌স, আমরা এখানে সামনে সামনে মিলেছি এমন কথা ভাববেন না।'

যাই হোক সাক্ষীর কাঠগড়ার গিয়ে যথারীতি শপথ গ্রহণ করলাম। তারপর বিচারক মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার প্যারকিন্‌স, আপনার পুরো নাম কি?—আপনি কি করেন?'—প্রশ্ন শুনে মনে হল তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। যাই হোক, যথারীতি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম, তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কেস্ সম্পর্কে আপনি কি জানেন?' আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি—' এইখানে তিনি আবার বাধা দিয়ে বললেন, 'চুলোয় যাক আপনার স্ত্রীর কাছে কি শুনেছেন। আমি জানতে চাই আপনি নিজে কি জানেন।' আমি বললাম, 'ধর্মাবতার, আমার স্ত্রী আমাকে যা বলেছেন তা ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।' তিনি বললেন, 'একে সাক্ষ্য বলে না। আপনি যেতে পারেন মিস্টার প্যারকিনস্, কেস ডিসমিস।—এর পরে যখন আপনি আবার আমার কাছে সাক্ষী দিতে আসবেন, তখন কেস প্রমাণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবেন।' বিশ্বাস করুন, মিস্টার সাইমণ্ডস, আমি এ কথায় যে পরিমান ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, এমন আর কখনও হই নি। সম্ভবত কফিন প্রস্তুতকারকের সঙ্গে দেখা হওয়াতেও প্রায় এই রকমই হয়েছিলাম।'

ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মিস্টার প্যারকিন্‌সের এই মোলাকাতের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে মিস্টার সাইমণ্ডস অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ করলেন মিস্টার প্যারকিন্‌স তাঁর তামাকের ক্লে-পাইপটি কামড়ে ভেঙে ফেলেছেন।

মিস্টার সাইমণ্ডস জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার প্যারকিন্‌স, এখন আপনি কি করতে চান?'

'আমার ইচ্ছা একবার পার্ক স্ট্রীট থানায় গিয়ে রীডের হাতে কেস্‌টির তদন্তের ভার তুলে দিই।'

মিস্টার সাইমণ্ডস বললেন, 'এ তো সবচেয়ে ভাল প্রস্তাব। যদি এ কেসের কেউ কোনো কিনারা করতে পারেন, তবে একমাত্র তিনিই পারবেন। রীড সম্পর্কে সেদিন আমি যে কাহিনীটি শুনেছি, আপনাকে বলি। মিডলটন রোডে অবস্থিত মিসেস ওকস-এর বোর্ডিং হাউসে দুজন ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। একদিন দুজনের একজন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে অন্যকে বললেন, 'ভাই, আড়াইশ' টাকা আমার এখুনি বড় দরকার, তুমি যদি অল্প ক'দিনের জন্য টাকাটা ধার দিতে পার তো

বড় উপকার হয়।' টাকাটা তাঁকে তখনি দিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু এর জন্য কোনো রসিদ চাওয়াও হয় নি, দেওয়াও হয় নি। অনেকদিন কেটে যাওয়ার পরেও টাকাটা ফেরত দেওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তখন ঋণদাতা ভাবলেন, তাঁর বন্ধু হয়তো ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছেন। তাই তিনি একদিন তাঁকে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, ভাই জিম, এক মাসের উপর হল তুমি যে আড়াইশ' টাকা আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলে সেটা ফেরৎ পাই নি।

এঁরা দুজনে তখন ক্রিকেট গ্রাউণ্ড থেকে ফিরছিলেন। টাকার কথা শুনে বন্ধু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন 'কোন্ আড়াইশ' টাকার কথা বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো কখনো তোমার কাছ থেকে টাকা ধার করি নি। রসিদ আছে? সাক্ষী আছে কেউ?'

ঋণদাতার অবশ্য সাক্ষীও ছিল না, রসিদও ছিল না। তিনি অবশেষে রীডের কাছে গিয়ে সব জানালেন। রীড কিছুক্ষণ চিন্তা করে তাঁকে বললেন, আপনি বাড়ি গিয়ে বন্ধুর কাছে এই মর্মে একখানা চিঠি লিখুন যে, 'আমি আপনার কাছে যে পাঁচশ' টাকা পাই, সেটা অবিলম্বে চাই। আপনি ঐ টাকা অমুক তারিখে আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন। আমার চাকর তার সাক্ষী আছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কিন্তু টাকা দেওয়ার সময় সেখানে কেউ ছিল না, আর পাঁচশ টাকা সে নেয় নি।' রীড বললেন, 'ও কথা ভুলে যান, যা বলি তাই করুন। আরও লিখুন যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে আদালতে নালিশ করা হবে।'

তিনি ফিরে গিয়ে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তেমনি ভাবে চিঠি দিলেন বন্ধুর কাছে। বন্ধু চিঠি পেয়ে পার্ক স্ট্রীট থানায় ছুটে এলেন এবং খুব বিচলিত-ভাবে বললেন, তিনি ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চান। রীড উপস্থিত হলে তিনি এক প্রতারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন। প্রতারক তাঁর কাছ থেকে পাঁচশ' টাকা ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। রীড বললেন, 'তাই না কি? কি ব্যাপার খুলে বলুন তো।' অভিযোগকারী তখন বললেন, 'যাকে তিনি বন্ধু ভেবেছিলেন, তার এই কাজ। তার কাছ থেকে তিনি মাত্র আড়াইশ' টাকা ধার নিয়েছিলেন অথচ চিঠিতে লিখেছে পাঁচশ'

টাকা।' চিঠিখানা তিনি রীডের হাতে দিলেন। রীড বললেন, 'চিঠিতে দেখছি টাকা যে দেওয়া হয়েছে তার সাক্ষী আছে। হুঁ! দাবী খুবই জোরালো।' আগন্তুক বললেন, 'সেই কথাই তো বলতে এসেছি। তখন সাক্ষী কেউ উপস্থিত ছিল না।' রীড বললেন, 'তাহলে আপনি বলতে চান, ঋণদাতা মাত্র আড়াইশ' টাকা আপনাকে দিয়েছেন, অথচ মিথ্যা করে দাবী করছেন পাঁচশ' টাকা?' আগন্তুক বললেন, 'সেটাই আমার অভিযোগ।' 'তাহলে অভিযোগ লিখে সই করে দিন।—রীড তাঁর সামনে কেস্-বুক এগিয়ে দিলেন।

পরদিন রীড ঋণদাতাকে জানালেন 'আপনি এবারে আদালতে আপনার বন্ধুর বিরুদ্ধে আড়াইশ' টাকার দাবীতে কেস্ করতে পারেন। তিনি থানা কেস্ বুকে আড়াইশ' টাকার ঋণ স্বীকার করে সই করে গেছেন।' কিন্তু তা আর দরকার হয় নি, কারণ দেনদার ফাঁদে পড়েছে পবে বুঝতে পেরে বিনা হাঙ্গামায় টাকাটা শোধ করে দিয়েছিলেন। রীড ডিটেকটিভ হিসাবে খুবই চতুর, এবং দেখা যায় তিনি তাঁর পদ্ধতির মধ্যে কৌতুক সৃষ্টিরও সুযোগ তৈরি করেন মাঝে মাঝে। তাতে সব যেন গল্পের মতন মনে হয়। আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুকাল আগে এক যুবক ও যুবতী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হঠাৎ বিয়ে করে বসল। কিন্তু কয়েক মাস কাটতে না কাটতে তারা বুঝতে পারল, ভুল করেছে। স্বামীটি বদরাগী এবং বৌটিও কম যায় না। দুজনে ভীষণ কলহ। শেষ পর্যন্ত বৌটি তার বাপের বাড়ি গিয়ে উঠল। স্বামীর বিরুদ্ধে তার হাজার নালিশ। ওদের নিজেদের সুখশান্তি তো মিটেই গেছে, মেয়ের বুড়ো বাপটির মনেও শান্তি নেই। মেয়েটি বাপের কাছে শেষ-বারের মতো এসে বলল, সে আর তার স্বামীর কাছে ফিরে যাবে না। বলল, এর জন্য আদালতে যেতে হয় তাতেও সে রাজি।

বাপটি নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ। আদালতের ব্যাপার তাঁর দু চোখের বিষ। তাই তিনি গেলেন রীডের কাছে। আলোচনা-প্রসঙ্গে রীড জানতে পারলেন ভদ্রলোকের ভাল সম্পত্তি আছে, এবং সে সম্পত্তি তিনি তাঁর দুটি মেয়ের নামে উইল করে দিয়েছেন। বৃদ্ধ বললেন, 'টাকার কথা বা সম্পত্তির কথা না উঠতেই যখন এমন গণ্ডগোল, তাঁর মৃত্যুর পর যখন সম্পত্তির কথা ওরা জানতে পারবে তখন না জানি আরও কত কি হবে।' রীড জিজ্ঞাসা করলেন, 'উইলের কথা কি মেয়েরা জানে?' বৃদ্ধ বললেন, 'কিছুই জানে না,

এমন কি আমার যে এত সম্পত্তি আছে তাও জানে না!' রীড বললেন, 'খুব ভাল কথা। আপনি আপনার মেয়েকে তার স্বামীর কাছে নিয়ে যান। এবং সেখানে গিয়ে দুজনকে ডেকে বলুন, আপনার এত সম্পত্তি আছে যা তাদের ধারণার বাইরে। আপনি সম্পত্তি আপনার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিয়েছেন আপনার উইলে। তারপর বলুন, যদি তোমাদের মধ্যে কোনো কলহ থাকে তাহলে আমি আমার উইল বাতিল করে অন্য মেয়েকে সব দিয়ে দেব, কারণ সে তার স্বামীর সঙ্গে শান্তিতে বাস করে।' বৃদ্ধ রীডের এই উপদেশে খুশি হয়ে চলে গেলেন, এবং তিনি যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৃদ্ধ ঠিক সেইভাবে মেয়ে-জামাইকে বললেন। কিছুদিন পরে ধর্মতলা স্ট্রীটে মহরমের শোভাযাত্রায় রীডের সঙ্গে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দেখা। তিনি রীডকে বহুত ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আপনার ওষুধে আশ্চর্য ফল ফলেছে। উইল বদলাবার কথা শুনেই জামাই খুব ভাল ব্যবহার করছে তাঁর মেয়ের সঙ্গে। অতএব বন্ধু, আপনি যে মিস্টার রীডের হাতে আপনার সমস্যা মীমাংসার ভার তুলে দিতে মনস্থ করেছেন, এটা ঠিকই হয়েছে। এতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। আপনার সাফল্য কামনা করি।'—দুই বন্ধু পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু দিকে রওনা হলেন। একজন তাঁর অফিসের দিকে অন্যজন থানার দিকে।

ঘটনা চক্রে ঠিক সময়ে আমাদের সেই লোন অফিসের প্রতারক ভোলা-চাঁদের আরও দুজন শিকার মিস্টার রীডের কাছে একই রকমের অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন।

ভোলাচাঁদ ধরকে কোথায় পাওয়া যাবে? সে নিরুদ্দেশ। কিন্তু তার সন্ধান পেতে দেরি হল না। সে ফরাসী চন্দননগরে তার এক আত্মীয়বাড়িতে বাস করছে খবর পাওয়া গেল। অন্য রাষ্ট্র থেকে তাকে গ্রেফতার করাতে যে পরোয়ানা দরকার হয়- তা বার করতে কিছু হাঙ্গামা আছে, সময়ও লাগে। কিন্তু রীডের কৌশল তাঁর নিজস্ব। তাঁর পরিচয় আরও এক পলাতককে চন্দননগর থেকে বার করে আনায় পেয়েছি, এবারের ব্যবস্থা আরও চমকপ্রদ।

বাবুঘাট থেকেই একখানা সুদৃশ্য বজরা ভাড়া নিয়ে তাতে এক ধনী জমিদার চড়লেন। তার সঙ্গে রইল দুইজন বাইজি ও দুজন বাদক। জমিদার হুগলী নদীর বুকে কিছু স্ফূর্তি করতে বেরিয়েছেন। বলা বাহুল্য উক্ত ধনী

জমিদার আর কেউ নন, একজ বাঙালী পুলিস সার্জেণ্ট। তাঁকেই জমিদার সাজানো হয়েছিল। নৌকোয় গানবাজনা চলছে অবিরাম। অবশেষে সন্ধ্যার মুখেই সেখানা এসে ভিড়ল চন্দননগরের এক ঘাটে। ভোলাচাঁদ যেখানে বাস করছিল, সে ঘাট তারই কাছে। গানের সুর কানে যাওয়াতে সে বাড়ির সবাই বেরিয়ে এলো বজরার কাছে। তারা সবাই তামাসা দেখতে এসেছে। তার মধ্যে ভোলাচাঁদও ছিল। তারা সবাই দর্শক। মিষ্টি খাওয়ানো হল, পান দেওয়া হল। এদিকে নাচগানও চলল খুব উৎসাহের সঙ্গে। 'জমিদার' তাঁর ভূমিকা আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে চললেন। যারাই এলো তাদেরই অভ্যর্থনা জানানো হল। জমিদারের বড় হুঁকা থেকে সবাই ধূমপান করতে লাগলেন। মশলা দেওয়া তামাক, তার সঙ্গে কিছু আফিঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে তামাক খাওয়া একটু আরামের মনে হল। ভোলাচাঁদ তো নেশায় মশগুল হয়ে নীরবে নর্তকীদের পায়ের দিকে চেয়ে স্বর্গীয় সঙ্গীত ঝঙ্কার উপভোগ করছে। এমন সময় তাদের মধ্যেকার কে একজন হঠাৎ আবিষ্কার করল, বজরা যে জোয়ারে ভেসে চলল! তারা চিৎকার করে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে রীড ও প্যারকিনস্ নৌকোয় লাফিয়ে উঠে পড়লেন। তাঁরা অন্য নৌকোয় শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। ভোলাচাঁদ এঁদের চিনতে পারামাত্র লাফিয়ে উঠে নৌকা থেকে নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হতেই তাকে ধরে ফেলা হল। তারপর ভোলাচাঁদকে 'জমিদার' বাইজি এবং বাদকদের পুলিস বোটে চালান করে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হল, জমিদারের বাকি অতিথিদের তাদের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে বজরা বাবুঘাটে ফিরে গেল।

চন্দননগরে এই গ্রেফ্তার নিয়ে মহা হৈ-চৈ। এই গ্রেফ্তার আইন-সঙ্গত হয়েছে কি না সে বিষয়ে 'কমিসারী বুরোয়া'র মনে কিছু সন্দেহ ছিল। তিনি এ বিষয়ে ফ্রান্সে ল অফিসারদের কাছে পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। তাঁরা বললেন, ভোলাচাঁদের গ্রেফ্তারের সময় বোট যদি চন্দননগরের ঘাটে বাঁধা থাকত তাহলে ফরাসী আইনে গ্রেফতার বেআইনী হত। কিন্তু গ্রেফতারের সময় বোট ফরাসী সীমানার বাইরে ভাসমান অবস্থায় ছিল, অতএব গ্রেফতার সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ হয়েছে।

কলকাতা অপরাধ জীবনের কয়েকটি কৌতুকের দিক

চোর ও স্বয়ংক্রিয় বাদ্যযন্ত্র

ওয়েলেসলি স্কয়ারের এক বাড়িতে রাত্রে চোর ঢুকে মূল্যবান যা হাতের কাছে পেয়েছে, নিয়ে পালাবার সময় অন্ধকারে একটা বাক্সের সঙ্গে পায়ে গুঁতো লাগল। সেই বাক্সটি আসলে একটি স্বয়ংক্রিয় বাজনার বাক্স। অর্থাৎ তার ডালা খুললেই তা থেকে যন্ত্রসঙ্গীত বাজতে থাকে। চোর ভাবল বাক্সে নিশ্চয় দামী অলঙ্কার আছে, অতএব সেটাকেও সে তুলে নিল। ওজন এবং চেহারা দেখে দামী কিছু আছে একথা মনে হওয়ায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাক্সটি বগলদাবা করে বাড়ি থেকে নিরাপদে বেরিয়ে চোর ঢুকল গিয়ে স্কয়ারের ভিতর, এবং সেখানে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে বসে তালা খোলা যন্ত্র দিয়ে শুভকার্য আরম্ভ করল। খুললেই দামী সম্পত্তি পাবে তার জন্য বুক দুরু দুরু। কিন্তু সে আনন্দ তার বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ খুলতে গিয়ে একটা স্প্রিং-এ চাপ লেগে ভিতরের যন্ত্র চলতে আরম্ভ করল, এবং হঠাৎ তার 'জুয়েলের বাক্স' থেকে গানের সুর বেজে উঠল। যে সুরে যন্ত্রটি বাঁধা ছিল সেটি একটি পরিচিত আইরিশ গানের সুর, গানের প্রথম লাইন হচ্ছে, 'The wind that shakes the barley.' এ-গানের সুরে যে বেদনাময় সুললিত হার্মনি ছিল, তাতে সে মুগ্ধ হওয়া দূরের কথা, আতঙ্কে বাক্স ফেলে দিয়ে 'চাচা আপন বাঁচা' রীতি অনুসরণ করে, 'বাপ রে!' বলে এক লাফে উঠে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। এদিকে বাগানের রক্ষক তার ছুটে পালানোর শব্দে জেগে উঠে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। কিন্তু তার কপালেও সেদিন দুঃখ ছিল। সেও শুনতে পেল ঝোপের মধ্যে বাজনা বাজছে। একি অলৌকিক কাণ্ড! কোনো লোক নেই অথচ বাজনা বাজছে। সেও প্রাণভয়ে ভূত ভূত বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে খবর দিতে। মিস্টার বার্টলেটকে সে গিয়ে বলল, ভূতেরা বাগান দখল করে ঝোপের মধ্যে মুজরা আরম্ভ করে দিয়েছে। তিনি তার কথায় কিছুই বুঝতে পারলেন না, তবে অনুমান করলেন, কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। অতএব তিনি পার্ক স্ট্রীট থানার ইনসপেক্টরের সাহায্য চাইতে গেলেন। তাঁরা দুজনে বাগানের মালিকে সঙ্গে নিয়ে

সঙ্গীতের স্থানে এসে পৌছলেন। তাঁরা এসে ঝোপের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগলেন, কারণ বাজনা ততক্ষণে থেমে গেছে। তাঁরা দেখলেন সেখানে একটি স্বয়ংক্রিয় বাদ্যযন্ত্রের বাক্স ও তালা খোলার যন্ত্র পড়ে আছে। এতক্ষণে তাঁরা অপার্থিব সঙ্গীতের উৎসের সন্ধান পেলেন। কিন্তু মালির অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে উঠল। মিস্টার বার্টলেটের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে আর তার বাগানের ঘরে ফিরে যেতে রাজি হল না। কারণ সে জানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভৌতিক। দাবাগ্নির মতন ওয়েলেসলি স্কয়ারের ভূতের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এবং মুখে মুখে গুজব অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করল। শেষে এমন হল, সন্ধ্যার পর কেউ আর ঐ ভূতের গানের বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটত না। কারণ তারা জানে বাগান এখন ভূতের দখলে। লোকের মনে এ বিশ্বাস এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হল যে, কাছাকাছি কোনো বাড়িতে যা কিছু দুর্ঘটনা ঘটুক, সবই ঐ ভূতের কীর্তি বলে তারা প্রচার করতে লাগল।

কোনো শনিবারে বা মঙ্গলবারে হিন্দু পরিবারের কোনো ব্যক্তি মারা গেলে বোঝা যাবে সে জীবিত অবস্থায় কোনো ভূতের মনে দুঃখ দিয়েছে। কারণ ঐ দিন মৃত্যু হলে তার আত্মা পৃথিবী ছেড়ে বাইরে যেতে পারে না। তাই মৃত্যুর পক্ষে ঐ দুটি দিন অশুভ। যদি কোনো স্ত্রীলোকের পেটের সন্তান নষ্ট হয়, তার মূলে ঐ ভূত। সব পাড়াতেই বিশেষ বিশেষ ভূত থাকে, প্রত্যেক গ্রামে বা বস্তীতে পৃথক চরিত্রের ভূতেরা বাস করে। তারা নিজ নিজ এলাকায় ভয়ের রাজত্ব গড়ে তোলে। কোনো গাছে যদি ভূত থাকে বলে লোকের বিশ্বাস হয়, তবে রাত্রে কোনো পথিক বরং এক মাইল পথ ঘুরে যাবে, তবু সেই গাছের নিচে দিয়ে হাঁটবে না। ছোট হোক বা বয়স্ক হোক সবাই ভূতকে সমানভাবে মান্য করে চলে।

এক চতুর ব্রাহ্মণ লোকের কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে রটিয়ে বেড়াতে লাগল যে ওয়েলেসলি স্কয়ারের ভূত তার নিয়ন্ত্রণাধীন। এবং সে ইচ্ছা করলে সেই ভূতকে তুষ্ট করতে পারে অথবা রুষ্ট করতে পারে। ভূতকে তাতিয়ে দিলে সে ভীষণ হিংস্র হয়ে ওঠে, এবং লোকের উপর প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করে। এ কথা শোনার পর পাড়ার সবাই ব্রাহ্মণকে গিয়ে ধরল যাতে সে তাদের পাড়ায় বাস করে ভূতকে শান্ত রাখে। কারণ ভূতের কাছাকাছি বাস করলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রের সাহায্যে ভূতকে বশে রাখতে

পারবে। অনিষ্টকারী কুখ্যাত ভূত ভারতীয় ব্রাহ্মণদের পক্ষে এক একটি রত্নখনি বিশেষ। পাশ্চাত্ত্য দেশের ডেভিল যেমন সেখানকার ধর্মীয় যাজকদের অর্থের আকর। এর যে কোনো একটি বাদ দিন, দেখবেন 'ওথেলো' বেকার হয়ে পড়েছে।

দেশী ভৃত্যদের সম্পর্কে নবাগত ইউরোপীয়দের অভিজ্ঞতা

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একটা বড় মাথাব্যথার কারণ হচ্ছে দেশী চাকরদের অসৎ প্রবৃত্তি। চৌর্যজীবীদের হাত থেকে বাঁচবার অনেক উপায় আছে, কিন্তু আপনার নিজের চাকর আপনাকে অগ্রাহ্য করে চুরি করবে, এর কি প্রতিকার? প্রতিকার নেই, কারণ আপনি যদি তাকে শাসন করতে যান তা হলে আপনার কাজ আর করবে না, কাজ ছেড়ে চলে যাবে। যেখানে চুরির সুযোগ নেই, সেখানে দেশী চাকর থাকে না।

পার্ক স্ট্রীট থানায় থাকতে আমার কাছে একটি মনোহর চুরির অভিযোগ এসেছিল। এটি প্রকাশ করছি এই উদ্দেশ্যে যে, এ থেকে প্রশ্রয়দাতা মনিবেরা কিছু শিক্ষালাভ করতে পারবেন।

এ-ক্ষেত্রে ভৃত্যটি হচ্ছে কোচম্যান। মিডলটন স্ট্রীটবাসী এক সামরিক বিভাগের ভদ্রলোক তাকে নিযুক্ত করেছিলেন। লোকটি বেশ ঝুঁকি নিয়েই দুষ্কার্য চালিয়ে যাচ্ছিল। সে তার মনিবের ঘোড়ার জন্য বিচালি সরবরাহ করত এবং তার জন্য তাকে নিয়মিত টাকা দেওয়া হত। একদিন বিচালির দাম বাবদ তাকে দুই টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা পরে এসে জানায়, সে ঐ টাকা তার কোটের পকেটে রেখে কোটটি আস্তাবলে পিনে ঝুলিয়ে রেখেছিল, সেখান থেকে সেই দুটি টাকা চুরি হয়ে গেছে। মনিব ইউরোপ থেকে নবাগত, তিনি এদেশী চাকরদের হালচাল কিছুই জানেন না, কাজেই তার কথা সহজে বিশ্বাস করলেন, এবং পুনরায় তাকে দুটো টাকা দিয়ে দিলেন। আরও কিছুদিন পরে ঐ কোচম্যান বিচালির দাম স্বরূপ পাঁচ টাকা পেল এবং কিছুক্ষণ পরেই এসে জানাল সে ঐ টাকা তার ক্যাশবাক্সে রেখেছিল, সেখান থেকে চুরি হয়ে গেছে। আর শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে তার এক মাসের মাইনে ছিল সেটাও গেছে। মাইনেটা সে পূর্বদিন পেয়েছিল। মনিব শুনে খুব দুঃখিত হয়ে এবারেও তার ক্ষতিপূরণ

করে দিলেন। অর্থাৎ তার বেতন না দিলেও, বিচালির দাম পাঁচ টাকা দিলেন। কোচম্যান আশা করেছিল সবটাই পাবে। অতএব সে কিছু হতাশ হল। মাসের শেষে হিসাব করে দেখা গেল উক্ত কোচম্যান তার মনিবের কাছে পঁয়তাল্লিশ টাকা পায়। এ-টাকাও তাকে দেওয়া হল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় দেখা গেল সে কাঁদতে কাঁদতে এসে তার মনিবকে জানাচ্ছে, সকালের পাওয়া তার সেই পঁয়তাল্লিশ টাকা তার বাক্স থেকে চুরি হয়ে গেছে। সে যখন বাজারে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে চুরি হয়েছে। সে বাজারে যাবার আগে দুটি তালা লাগিয়ে গিয়েছিল তার বাক্সে। কিন্তু এসে দেখে তালা দুটি ভাঙা। এবং সেই ভাঙা তালা দুটি সে সঙ্গে করেই এনেছে।

মনিব ভাবলেন, আর নয়, এবারে তাঁর চাকরটিকে চোরের হাত থেকে বাঁচানো দরকার, তাই তিনি পুলিসে খবর দিলেন। কিন্তু কোচম্যান এতে চমকে গেল, সে এসব পুলিসের হাঙ্গামা পছন্দ করে না। তাই সে বলল, পুলিসে কি করবে? টাকা পেলেও তা কার টাকা সে তো আর বোঝা যাবে না? মনিব বললেন, 'তা না গেলেও পুলিস এলে চোর ভয় পেয়ে যাবে, এবং চুরিও থেমে যাবে।'—কিন্তু কোচম্যান এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল। কিন্তু তবু পুলিসে খবর দেওয়া হল। একজন দেশী অফিসার সহ পুলিস ইনসপেক্টর এসে কোথায় কিভাবে চুরি হয়েছে দেখলেন। তদন্তে জানা গেল কোচম্যানের এক ভাই পাশের বাড়িতে কাজ করে এবং কোচম্যান তার সঙ্গে খায় এবং অবসর যাপন করে। ইনসপেক্টর বললেন, 'ঐ লোকটার কাছেই টাকা পাওয়া যাবে।' 'তাহলে টাকা চুরি গেছে একথা আপনি বিশ্বাস করেন না?'—মনিব সবিস্ময়ে ইনসপেক্টরকে এই প্রশ্ন করলেন। তিনি ভাবলেন এ রকম একজন নিরীহ গরীব লোকও আবার এমন কাজ করতে পারে না কি? এমন অতুলনীয় কৌশলের প্রতারণা?

ইনসপেক্টর বললেন, 'চলুন আমার সঙ্গে, দেখবেন।'

তারপর কোচম্যানকে সঙ্গের অফিসারের জিম্মায় রেখে ইনসপেক্টর তার ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি আগে গিয়ে তার পরিচয় নিলেন এবং জানতে পারলেন সে কোচম্যানের ভাই হয়। তারপরেই বললেন, 'কোচম্যান তোমার কাছে যে টাকা রাখতে দিয়েছে সেই টাকা আমি চাই।' লোকটি কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্তভাবে কাটাল। ইনসপেক্টর বললেন, 'নাও নাও, ভাববার কিছু নেই, আমি জানি টাকা কোথায় আছে, যদি

দিতে অস্বীকার কর, তাহলে চোরাই টাকা রাখার অপরাধে গ্রেফ্‌তার করা হবে।'

আর বেশি কিছু বলতে হল না। লোকটি তার ভাইয়ের রাখা আশি টাকা বার করে নিয়ে এলো, এবং বলল, এর মধ্যেকার পঁয়তাল্লিশ টাকা সে আজ সকালে পেয়েছে।

টাকাটা সে বার করল রান্নাঘরের মেঝে খুঁড়ে। ভদ্রলোক তো সব দেখে-শুনে অবাক! তিনি ইনসপেক্টরকে বললেন, 'আমি আজ এমন একটা শিক্ষা পেলাম যা জীবনে ভুলব না।'

ইনসপেক্টর কোচম্যানের কাছে ফিরে এসে সব বললেন। তখন কোচম্যান বলল, 'কি আর বলি সায়েব, কাল বাজারে গিয়ে এক টান আফিঙের ধোঁয়া টেনে এসেছিলাম। তারপর থেকে ঝিমুচ্ছিলাম। নেশার ঘোরে আমি স্বপ্ন দেখলাম কে যেন আমার বাক্স ভেঙে টাকা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। জেগে উঠে দেখি সত্যিই তাই, এবং তখনই আমি চুরির কথা মনিবকে জানিয়েছি।'

ইনসপেক্টর মনিবকে বললেন, 'দেখলেন তো, এদেশী চোরের ছলের অভাব হয় না।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'মিস্টার ইনসপেক্টর, আমি এ চাকরকে ছাড়িয়ে দেব?'

'কাজ করে কেমন?'

'অদ্ভুত ভাল।'

'তবে যতদিন সে থাকে থাকুক। অবশ্য বেশিদিন সে নিজেই থাকবে না, কারণ একবার ধরা পড়েছে, দ্বিতীয়বার তার চুরির সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল।'

পরদিনই সে নোটিস দিল, তার পিতামহের মৃত্যু হয়েছে, অতএব সে আর এখানে থাকবে না।

প্রতারণার আর এক কৌশল

রেলগাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে পার্সেল উধাও হবার কথা পূর্বে একটা অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এবার আর এক ধরনের প্রতারণার কথা বলছি। এই প্রতারণাও রেল স্টেশনের ব্যাপার। বড় শহরের বাইরের কোনো স্টেশনে এই প্রতারণা চলবার সুযোগ বেশি।

স্টেশনের টেলিগ্রাফ সিগন্যালার এর নায়ক, এবং ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী তার শিকার। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী মফস্বলের বাজার থেকে মাল কিনে কলকাতায় চালান দেবে। কাজেই কলকাতার কোন ব্যবসায়ী কখন কোন্ মাল চেয়ে পাঠাবে সেই মর্মে অনেক টেলিগ্রাম আদান-প্রদান হয়। এইসব টেলিগ্রামে কলকাতা থেকে কোন্ মাল কি পরিমাণ চাই বা কিভাবে কার নামে পাঠাতে হবে তার নির্দেশ আসে। এই সব মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা ইংরেজী জানে না, দু চারজন বলতে পারলেও লিখতে বা পড়তে জানে না। আর ঠিক এই কারণেই এই প্রতারণা খাটানো সহজ হয়।

স্টেশন সিগন্যালার কলকাতার জাঠমল হাজারীমলের কাছ থেকে ঐ কারবারের এজেন্টের ঠিকানায় এই মর্মে একখানা টেলিগ্রাম পেল—

Purchase three thousand drums of A-1 Jute at three rupees eight annas per maund, to complete a shipping order, dispatch by rail sharp.

(জাহাজী অর্ডার পরিপূরণের জন্য তিন হাজার বাণ্ডিল প্রথম শ্রেণীর পাট সাড়ে তিন টাকা মোন দরে কেন, অবিলম্বে রেলযোগে পাঠাও)।

সিগন্যালার টেলিগ্রাম পেয়ে অন্য একখানা ফর্মে এর প্রত্যেকটি কথা নকল করল, কিন্তু কথাগুলো এমন ওলটপালট করে সাজাল যাতে তার কোনোই অর্থ হয় না। এটি করার পর সে আসলখানা লুকিয়ে রেখে ঐ অর্থহীন নকলখানা খামে পুরে প্রাপকের কাছে পাঠিয়ে দিল।

জীবন মল এই টেলিগ্রাম পেয়ে নিকটস্থ কোনো ইংরেজীজানা বাবুর কাছে পাঠোদ্ধারের জন্য নিয়ে গেল। বাবু পাঁচ সাত মিনিট ধরে চেষ্টা করেও কোনো অর্থ বুঝতে পারল না। জীবনমল তখন সেখানা নিয়ে আরও এক ইংরেজীজানা বাবুর কাছে গেল, এ বাবু আগের জনের চেয়ে একটু বেশি ইংরেজী জানা। কিন্তু এখানেও কোনো ফল হল না। শেষ পর্যন্ত জীবন-মল টেলিগ্রামখানা স্টেশনের সিগন্যালারের কাছেই ফেরৎ নিয়ে গেল। সিগন্যালার তো জানতই যে তার কাছে শেষ পর্যন্ত আসতেই হবে। এবং আসবে বলেই তো এই ফাঁদ পাতা। কাজেই সে এতে কিছুমাত্র বিস্মিত হল না। সিগন্যালার জীবনমলের হাত থেকে ঐ টেলিগ্রামখানা নিয়ে কিছুক্ষণ সেখানার দিকে চেয়ে রইল, যেন সে পাঠোদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তারপর যখন কোনো অর্থই সেও বুঝতে পারল না (এই ভাবই

ফুটিয়ে তুলল তার মুখে) তখন সে জীবনমলকে বলল, তোমাদের কলকাতার লোকেরা বড়ই খারাপ ইংরেজী লেখে।' জীবন মল একথা স্বীকার করল এবং বলল, 'এখন তবে কি করা যায় ? বড্ড জরুরি ব্যাপার। কি লিখেছে না পড়তে পারলে অনেক লোকসান।

সিগন্যালার একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল অন্য কেউ তার কথা শুনতে পাচ্ছে কি না। দেখল কাছে কেউ নেই, তখন সে জীবন-মলকে বলল, ফের এই টেলিগ্রামখানা নতুন করে আনাতে তিন টাকা পড়বে। পাঠানোর সময় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। অথবা যে লিখেছে সে ভুল করেছে। যাই হোক তিন টাকাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে তুমি যদি দুটাকা খরচ করতে রাজি থাক এবং টাকার জন্য রসিদ না চাও তবে আমি একটু ঘোরা পথে তোমার কাজ উদ্ধার করে দিতে পারি। আমার বন্ধু আছে তারের আর এক প্রান্তে, তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে তোমার টেলিগ্রাম সংশোধন করিয়ে আনব, রাজি ?'

ভারতীয় শাইলক একটি টাকা বাঁচাবার জন্য কি না করতে পারে। সে সহজেই সিগন্যালারের ফাঁদে পা দিল। সিগন্যালার দুটি টাকা পেয়ে বলল এবারে বাড়ি যাও, সংশোধিত টেলিগ্রাম তোমার ঠিকানায় বসেই পেয়ে যাবে। মাড়োয়ারী এজেন্টটি সরকারের একটি টাকা ঠকিয়েছে এই ভেবে আনন্দে গদগদ। কারণ সে মনে করল এ তার নিজের বুদ্ধিতেই সম্ভব হয়েছে। সে কল্পনাও করতে পারল না যে, তার যত ধূর্ততাই থাক, ঐ বাঙালীবাবুর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

হীরে দিয়ে হীরে কাটা

কলকাতার অনেক বণিক প্রতিষ্ঠান অনেক সময় বুঝে উঠতে পারেন না— কি করে তাঁদের জিনিস তাঁদের হাত এড়িয়ে বাজারে গিয়ে উপস্থিত হয়, এবং সেখানে তা অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ দামে বিক্রি হয়। এইরকম একটি কেস্ আমার হাতে আসে, এবং আমি ডিটেকটিভের সাহায্যে কিভাবে এ রহস্য ভেদ করি তা বলছি।

টি ই টমসন অ্যাণ্ড কোঃ একদা আবিষ্কার করেন যে, তাঁদের আমদানি করা ছুরি, কাঁচি, প্লেট-করা চামচে ইত্যাদি পথের ফেরিওয়ালারা শস্তায়

বিক্রি করছে। এই সব জিনিস তাঁরা ভিন্ন এ দেশে আর কেউ আমদানি করে না। ভারতের একমাত্র আমদানিকারক তাঁরাই। মিস্টার নিউম্যান এটি আবিষ্কার করেন, এমন অবস্থায় সাধারণত লোকে যা করে থাকে তা করলেন না। অর্থাৎ তিনি ফেরিওয়ালাকে পুলিসে না দিয়ে নিজে তার কাছ থেকে নিজেদেরই কিছু জিনিস কিনে নিলেন। তাকে জিজ্ঞাসাও করলেন না যে এ জিনিস সে কোথায় পেয়েছে। তিনি সোজা সেই জিনিসগুলি নিয়ে আমার কাছে চলে এলেন এবং জানতে চাইলেন এ জিনিস তাঁদের হাত এড়িয়ে বাজারে কি করে যায়।

এ রকম কেস্-এর রহস্য সন্ধানে বড়ই কুশলতা দরকার, খুব সতর্কতা দরকার। ফেরিওয়ালাদের মারফৎ এর মূল সূত্র সন্ধান করতে গেলে ফল বিপরীত হবারই সম্ভাবনা বেশি। কারণ তা হলে শত্রুপক্ষ গা ঢাকা দেবে, তাদের ধরা কঠিন হয়ে উঠবে।

অতএব আমি যে পথ অবলম্বন করলাম তা হচ্ছে এই।—আমি সবচেয়ে চতুর একজন ডিটেকটিভকে ফেরিওয়ালা সাজিয়ে পথে পথে ফেরি করে বেড়ানোর কাজে নিযুক্ত করলাম। তাকে নির্দেশ দেওয়া হল, সে যেন খুব সাবধানে কাজ করে, কোনো মতে কেউ যেন টের না পায় এবং অন্যান্য ওস্তাদ ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে যেন ভাব জমাতে থাকে, তাদের কাছ থেকে এ ব্যবসার কৌশল শেখার চেষ্টা করে এবং মাল ফুরিয়ে গেলে কোথায় শস্তায় পাওয়া যায় তার সন্ধান জেনে নেয়। তা ছাড়া তারা নিজের টাকায় কিনে বেচে না কমিশনে কাজ করে তাও যেন জানতে চেষ্টা করে। তারপর সমস্ত জানা হয়ে গেলে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

এক সপ্তাহ পরে এই নকল ফেরিওয়ালা আমার কাছে এলো এবং জানাল, একজন ফেরিওয়ালা দয়ারাম ঘোষ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। লোকটি ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর কাজ করে। তার দোকান চিৎপুর রোডে, যদিও তার বাসস্থান অন্যত্র। দয়ারাম তার সঙ্গে অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে আলাপ করে বুঝতে চেষ্টা করেছে এই নতুন লোকটি নির্ভরযোগ্য কি না। কথায় কথায় নকল ফেরিওয়ালা তাকে জানাল যে সে কলকাতার লোক নয়, পশ্চিমা লোক, কলকাতা শহরে ব্যবসা করে টাকা করা যায় শুনে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য এখানে এসেছে। কিন্তু এখানে এসে দেখে শহর ফেরিওয়ালায় ছেয়ে গেছে। তাই সে ভাবছে কিছু

জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে পারলে দেশে ফিরে গিয়েই ব্যবসা করবে। এ কথা শুনে দয়ারাম ঘোষ তাকে বলল, 'ঠিক তোমার মতন একজন লোকই আমার দরকার। তোমাকে আমি মাল যোগান দেব এবং এমন শর্তে দেব যাতে তোমার বেশ ভাল মুনাফা থাকে।'

নকল ফেরিওয়ালা তো আনন্দে লাফাতে লাগল। বলল, আজ রাত্রেই আমি মল্লিকঘাটে একশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাব। তার ভাগ্য ফিরেছে এতদিনে। দয়ারাম তাকে জানাল যা সে দেবে সে মাল তার বাড়িতে আছে কাল তার নমুনা এনে দেখাবে।

দয়ারামের সঙ্গে এই ডিটেকটিভের যখন কথা চলছিল, সেইসময় একটা পিওন সেখানে এলো। ডিটেকটিভ তাকে টি ই টমসন অ্যাণ্ড কোঃ-র পিওন বলে চিনতে পারল। সে একটি কাগজের প্যাকেট এনে দয়ারামের হাতে দিল। দয়ারাম, সেটি খুলে ভিতরের জিনিসগুলি পরীক্ষা করে দেখল: এক ডজন ইলেকট্রোপ্লেট করা কাঁটা চামচে। দয়ারাম পিওনকে একখানা চিঠি দিল, ডিটেকটিভ দেখতে পেল খামের উপর বাংলায় টি ই টমসনের একজন সরকারের নাম লেখা। সে ওখানকার ডেসপ্যাচিং সরকার। পিওন চলে গেলে ডিটেকটিভ জিজ্ঞাসা করল দয়ারাম ইলেকট্রোপ্লেট করা কাঁটা চামচেও বিক্রি করে কি না। তা যদি হয় তবে সেও ঐ জিনিস কিছু কিনবে। দয়ারাম তখন তাকে বলল, সোজাসুজি বেচে না। এগুলি একটি রাসায়নিকের দ্রবণে ডুবিয়ে এর থেকে কিছু রূপা তুলে ফেলা হয়, তাতে মনে হয় ঠিক যেন এগুলো এদেশে তৈরি। যেটুকু রূপা এভাবে পাওয়া গেল তা আমার বাড়তি লাভ।

তারপর ডিটেকটিভ তাকে অনুরোধ করে ইংরেজী ছাপসুদ্ধ ঐ এক ডজন কাঁটা চামচে কিনে নিল। তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। দয়ারাম ধরা পড়ে গেল। যারা তাকে যোগান দিচ্ছিল তারাও দণ্ডভোগ করল।

মায়ের প্রাণ ॥ বাস্তব জীবনের একটি রোমান্স

ভিকটোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী ঘোষিত হলে ভারতের সর্বত্র আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জুবিলি উপলক্ষেও (১৮৮৭) এইরকম উৎসব হয়। এই দুই ঘটনা উপলক্ষে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আন্দামানের নির্বাসন থেকে

কয়েক হাজার নরনারী এবং শিশু জাহাজ বোঝাই হয়ে আসতে লাগল কলকাতায়। যারা কলকাতায় এলো তারা কলকাতার বাবুঘাটে আমার হেফাজতে আলিপুরের কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। এই সব বাড়িগুলি পরে অল্পবয়স্ক অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের আবাসরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আন্দামানের নির্বাসন থেকে আনা অপরাধীদের এইখানে এনে তাদের নামধাম ইত্যাদি পরিচয়ের তালিকা তৈরির জন্য সাময়িকভাবে রাখা হল। তারপর তাদের নিজ নিজ দেশে পাঠানো হবে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনের ভিড় জমে গেল সংশোধনাগারের বিপরীত দিকে। তারা সব মুক্ত মানুষদের দেখতে এসেছে, অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। একটি লোক তার ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে এসেছে। সে এসেছে তার নির্বাসিতা স্ত্রীকে এবং মেয়েটি এসেছে তার মাকে অভ্যর্থনা জানাতে। স্ত্রীলোকটি যাবজ্জীবনের দশ বছর কাটাবার পর মুক্তি পেয়েছে সম্রাজ্ঞীর উৎসব উপলক্ষে। স্ত্রীলোকটিকে যখন দ্বীপান্তরে পাঠানো হয় তখন তার মেয়ের বয়স ছিল মাত্র ছয় মাস। তারপর থেকে সে আন্দামানে বসে তার স্বামী ও মেয়ের কোনো খবরই এই দশ বছর পায় নি। পরদিন সকালবেলা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লোকটি তার মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে মুক্ত বন্দীদের বাড়ির প্রবেশ দ্বারের যতটা কাছে সম্ভব ততটা কাছে এসে দাঁড়াল। এমন ভিড় যে কোথাও স্থিরভাবে থাকা যায় না। সেই ভিড় দুর্ভেদ্য। তবু লোকটি আশা করে আছে স্ত্রীকে দেখবে। কিন্তু মেয়েটিকে সঙ্গে রাখা গেল না, সে ভিড়ের চাপে সবার ঠেলা খেতে খেতে এদিকে-ওদিকে সরে যেতে লাগল, এবং ভয়ে কাঁদতে লাগল। একটি স্ত্রীলোকের কানে সেই কান্নার আওয়াজ গিয়ে পৌঁছল। সে তখন ঐ বাড়ির ভিতরের আঙিনায় তার দুটি সন্তান ও স্বামীর সঙ্গে বসে অপেক্ষা করছিল। বাইরের কান্নার আওয়াজ কানে যেতেই স্ত্রীলোকটি একলাফে উঠে পড়ল এবং প্রহরীর বাধা অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে এলো সেই ক্রন্দনরতা মেয়েটির কাছে। কেউ তাকে ঠেকাতে পারল না। ভিড় ভেদ করে সে ছুটে এলো এবং এসেই মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সে তখন যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। সে ঐ মেয়েটিকে সজোরে বুকে চেপে তার মুখে ক্রমাগত চুমো খেতো লাগল। তখনও পর্যন্ত সে ঐ মেয়ের বাপকে দেখে নি। কিন্তু দেখামাত্র দুজনে-

দুজনকে চিনতে পারায় আরও এক নতুন দৃশ্য অভিনীত হল। সে যে কি তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তা বলতে গেলে সে মহিমময় দৃশ্যটিকে নষ্ট করা হবে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে রইল, ছাড়ল না, তাদের মনের আবেগ বর্ণনা করব কোন্ ভাষায় ?

এদিকে আন্দামানী স্বামীটি এ-দৃশ্য দেখে প্রায় ক্ষেপে গেল। সে এই স্ত্রীলোকটিকে সেখানে বিয়ে করে যাবজ্জীবন নির্বাসনের মেয়াদ শেষ করবে এই ছিল আশা। ইতিমধ্যে দুটি সন্তানও হয়েছে তার। হঠাৎ তার এই সুখের জীবনে বাদ সাধল ভিকটোরিয়ার উৎসব। সে যে এখন তার বিবাহিত স্ত্রীকে হারাতে চলেছে। স্ত্রীলোকটি তার প্রথম স্বামীকে আর ছাড়বে না। তাকে ভয় দেখানো হল, অনুরোধ জানানো হল, তবু না। আমাকেই এসে আবেদন জানাল তার আন্দামানের স্বামী। স্ত্রী আইনত কার ? কারণ আমি তখন ঐসব সদ্য মুক্তি পাওয়া আসামীদের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। আমারই হেপাজতে তারা আছে। অতএব আমি যা করব তাই হবে। কিন্তু আন্দামানী স্বামী যখন শুনল আমার বিচার তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তখন সে চিৎকার করে উঠল। ঐ স্ত্রীর আগের স্বামীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, 'আমার স্ত্রী ঐ লোকটার হবে কি করে ? আন্দামানে আমার সৎ আচরণের জন্য সরকার বাহাদুর কি পুরস্কার হিসাবে আমার স্ত্রীকে দেয় নি। তারপর খালাস হয়ে এমন কি অপরাধ করলাম যাতে আমি আমার বিবাহিত স্ত্রীকে হারাব ? আমার আন্দামানের সদাচরণ, খালাস পেয়েই নষ্ট হয়ে যাবে ? আমার সরকারের দেওয়া পুরস্কার এখন আর আমার থাকবে না ? আমি স্বয়ং মহারানীর কাছে দরখাস্ত পাঠাব। তিনি আমাদের খালাস দিয়েছেন। তিনি আমার স্ত্রীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।'

আমি যতই যুক্তি দিয়ে বোঝাই, সে কিছুতে বোঝে না। যত বলি প্রথম স্বামীর দাবীই আগে, তা ছাড়া স্ত্রীও তার কাছেই যেতে চায়, কিন্তু সে অবুঝ ! আমার কোনো যুক্তি সে মানবে না, এবং তার ধারণা স্ত্রীর মতিগতি কোন্ দিকে তার বিচার করার আমার কোনো অধিকারই নেই। তাই সে আবার বলল, সরকার বাহাদুর কি তাকে আমার হাতে তুলে দেয় নি ? আমার সদাচরণের জন্য আমি তাকে পেয়েছি। আমি তাকে খেতে পরতে দিয়েছি, তার জন্য গয়না গড়িয়ে দিয়েছি, তার বেশি আর সে কি চায় ?

আমি এইখানে বাধা দিয়ে বললাম, স্ত্রীলোকের খাওয়া পরাই কি সব ?

সে কি শুধু শাড়ি গয়না, আর খাওয়ায় সুখী হয়? সে ভালবাসতে চায় এবং ভালবাসা পেতে চায়। লোকটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কি! আমি তাকে ভালবাসি না? আর তারও কি স্বামী সন্তান নেই যাদের সে ভালবাসতে পারে?' আমি বললাম, 'দেখতে তো পাচ্ছি সে তার আগের স্বামী আর মেয়েকে তোমার আর তোমার সন্তানদের চেয়ে বেশি ভালবাসে।'

লোকটা মাথা নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করল এটা একটা কাজের কথাই নয়। লোকটা প্রাচ্য দেশের মনোভাব ঠিকই প্রকাশ করেছে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে ভালবাসার কথা অবান্তর। লোকটি হতাশভাবে তার সন্তানদের সঙ্গে মাটিতে বসে রইল, চোখ দুটি তার দুহাতে ঢাকা।

এরপর হল আর এক সমস্যা। স্ত্রীলোকটি তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলেও, তার দ্বিতীয় স্বামী ও কন্যার সঙ্গে সে যখন চলে যাচ্ছিল, তখন ফেলে যাওয়া সন্তানদের করুণ কান্না তাকে বাধা দিল। সে একটু থামল। সে এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর সে ছুটে গিয়ে তাদের কোলে তুলে নিয়ে চলে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই সন্তানদের পিতা তাদের উপর তার অধিকার দাবী করল। সে বলল, তা হবে না, এরা আমার কাছে থাকবে। স্ত্রীলোকটি তখন আমার কাছে তার আর্ত আবেদন পেশ করল। বলল, এরা আমার সঙ্গে থাকবে, আপনি এর ব্যবস্থা করে দিন! তার উচ্ছ্বাস কিছু প্রশমিত হলে আমি তাকে বললাম, তার সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে। হয় সে তার আন্দামানী স্বামীর কাছে ফিরে যাবে, আর না হয়, তার আগের স্বামীর সঙ্গে যাবে। প্রথমটাতে সে ঐ স্বামীর সন্তানদের সঙ্গে বাস করতে পারবে, আর দ্বিতীয়টাতে সে তার আগের মেয়ের সঙ্গে বাস করতে পারবে।

স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় প্রস্তাবটিই মেনে নিল।

কৌতূহলবশত আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, তুমি কান্না শুনে বুঝতে পেরেছিলে কি করে যে তোমার দশ বছরের ফেলে আসা মেয়েটিই কাঁদছে?'

স্ত্রীলোকটি বলল, 'ওমা! সে কি কথা? মা তার সন্তানের গলা চিনতে পারবে না? তবে আর মা হয়েছি কেন?'